উজান-গঙ্গা

গোপাল হালদার

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫৭, শ্রাবণ

ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কালি-গঙ্গা প্রেস, ৪৬।১, বেচু চ্যাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে কে, কে, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও আশু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রচ্ছদপট চিত্রিত।

মায়ের শ্রীচরণে

নিবেদন

এ গ্রন্থের ঘটনাকাল মোটামুটি ভাবে ১৯২৭ থেকে ১৯৩০; এবং রচনাকাল ১৯৩৪-৩৫। দেরীতে প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক কথা এখন অনাবশ্যক মনে হয়েছে। পূর্বেকার লেখার অনেক তাই কাটছাঁট করতে হয়েছে। বাঙালী ভদ্রশ্রেণীর পতনের পরিচ্ছেদ আমি কয়েকটি প্রবীণ মানুষের চোখে দেখতে চেষ্টা করেছি—প্রথম 'ভাঙনে', (১৯৪৭), তারপর 'স্রোতের দীপে,' (১৯১০)—আর এখন এই শেষখণ্ডে—'উজান-গঙ্গায়'। সেই প্রবীণদের কথা এবার সমাপ্ত হল—অবশ্য উজান-গঙ্গার সামনে। বিষয়ের একটা ধারাবাহিকতা তাতে আছে; এ গ্রন্থ স্বতন্ত্র পড়বার সময়ে পাঠক বাধা না পেলেও এ কথা স্মরণ রাখবেন।

২৩শে জুলাই, ১৯৫০ লেখক

“কালোহংসি”

১

আশ্চর্য হইলেন না এখন আর জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী—নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তাঁহাদের মধুখালির গৃহ, বাস-ভবন, পিছনকার নারিকেল বাগান, ঝোপ-ঝাড়, আর সামনেকার 'অচিনতলার' ছায়া-শ্যাম প্রশস্ত আঙিনা—প্রকাণ্ড সেই নাম-না-জানা গাছ দুইটা পর্যন্ত।

কয় বৎসর পূর্বেও যখন নদীর ভাঙনে 'গোলাপ-কুঠী' ভাঙিয়া পড়িতেছিল তখন প্রৌঢ় জ্ঞান চৌধুরীর নিকট তাহা বড় অদ্ভুত মনে হইতেছিল:—কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া নদী শেষে গ্রাস করিতে শুরু করিল লাক্রানি সাহেবের অত আদরের 'গোলাপ কুঠী!'—একটি একটি করিয়া গোলাপের চারা আনাইয়াছিল সে ফ্রান্স্ হইতে। তখনো জ্ঞান চৌধুরী ভাবিতে পারেন নাই এই কয় বছরের মধ্যে সেই নদীর ক্ষুধায় তাঁহাদের এই 'অচিন্তলার' বাসগৃহও নিষ্কৃতি পাইবে না। কিন্তু এখন আর আশ্চর্য হইলেন না জ্ঞানশঙ্কর—'নীলকুঠী' জলে তলাইয়া গিয়াছে, 'লালকুঠী' ভাঙিতে লাগিল—নতুন নির্মিত সেই কুঠীটার বয়স পঁচিশ বৎসরও হয় নাই। আসিয়া গিয়াছে নদী দেখিতে দেখিতে চোখের উপর দিয়া। প্রথম 'নিমক মহালের' পাড়ায় মাঠ ভাঙিতে লাগিল। 'পদ্মকুঠীর' ঝিলের পদ্মবন শুকাইয়া গেল। শুষ্ক ঝিলের পঙ্কের উপর ছড়াইয়া পড়িল সেই লবণাক্ত ঘোলা জল। এই ভাঙনের পালা যেন

জ্ঞানশঙ্করের সহিয়া গিয়াছে। কোথা দিয়া ইহার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক অনিবার্যতা ও গভীরতর ন্যায়নীতিরও আভাস দেখিতেছিলেন জ্ঞানশঙ্কর। হয়ত ইহা বিধাতারই একটা ন্যায় বিচারের রূপ। অনেক লোককে নিপীড়ন করিয়া আপন সৌভাগ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল লাফ্রানি। গোলাপের বাগিচা তাহার যত সুন্দর হউক, অত অন্যায়ের একটা বিচারও আছে বিধাতার দরবারে। জন কোম্পানির 'নবাবদের' অবিচার-অত্যাচার মধুখালির মানুষের স্মৃতিতেও আর বিশেষ বাঁচিয়া নাই, কিন্তু বিধাতার খাতায় তাহার হিসাব তো মুছিয়া ফেলিবার নয়। তাই মুছিয়া যায় সেই জন কোম্পানীর নবাবদের নীলকুঠী ও নিমক মহাল।—তবু অদ্ভুত এই বিচার! সেই নবাবদের ক্ষতি হইল না, তাহারা ত রাজত্বই করিয়া গেল; ক্ষতি হইল বরং এ কালের অনেক সাধারণ শহরবাসী দরিদ্র মধ্যবিত্তের, আরও অনেক প্রতিবেশী দরিদ্র জনসাধারণের। গেল 'অচিন্‌তলার' চৌধুরী ভবনও। অদ্ভুতই নিঃসন্দেহ,—জ্ঞান চৌধুরী তাহা মানেন,—ইহাই কালের বিচার; পরিমিত বুদ্ধি ও পরিমিত কালের হিসাবে এই বিচার বুঝিবার উপায় নাই।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের উপর, এখানে এই শহরে চৌধুরীরা জীবিকা সংস্থানে আসিয়াছিলেন—উদ্যোগী পুরুষ সেই পিতৃব্য অগ্রজরা, তাঁহাদের এই বাসভবন একটু একটু করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।—প্রথম দিকে উহা ছিল বিদেশে জীবিকার্জনের উপযোগী সাময়িক 'বাসা'। ক্রমে জীবিকার দায়ে বসবাস এখানে স্থায়ী হইতে থাকে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই 'অচিন্‌তলার' প্রথম যেদিন নামিলেন জ্ঞানশঙ্কর—সকালবেলা চোখ মেলিয়া গাছ দুইটাকে মনে হইয়াছিল কোন্ অতীতের সাক্ষী;—অজর অক্ষয় একটা সুস্থির ঐতিহ্যের বাহন—সবই তখন ছিল সুস্থির। জ্ঞানশঙ্কর এই বাসস্থলীতে এই ছায়াতলে বাস দিনে দিনে সেদিনের এণ্ট্রান্‌স্ ছাড়াইয়া কলেজের দিকে

অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর এক একটা আশ্চর্য দেশ তাঁহার যৌবনের ভাবনা-কুশল মনের নিকট খুলিয়া গিয়াছে এক একটি নূতন গ্রন্থের পাতা হইতে! এই ছায়া-কম্পিত অচিনতলার এক একটি দিনের অম্লান স্পর্শের মধ্য দিয়া উন্মীলিত হইয়াছে তাঁহার যৌবনের স্বপ্নকল্পনা। তারপর আসিল তাঁহারও জীবিকার্জনের দিন ;—শেষ হইল অগ্রজ বিভূতিভূষণের স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছল সংসার-যাত্রা। আরম্ভ হইল তাঁহার কাল—দ্বন্দ্ব-কোলাহল বাধিয়া গেল দিকে দিকে, দেশে দেশে! তবু এইখানে, এই অচিনতলায় উকিল জ্ঞান চৌধুরীর বৈঠকখানায় কত অপরাহ্নে সন্ধ্যায় তাঁহার বন্ধুরা সকলে একত্র হইয়াছেন। প্রতিদিন গল্প জমিত, আড্ডা জমিত, আইনের তর্ক হইত, রাজনীতির ঝড় উঠিত। দেশ-দেশান্তরের কত তথ্য আর কত তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন তাঁহারা। সেক্‌স্‌পীয়র হইতে রবীন্দ্রনাথ, বার্ক শেরিডন হইতে সুরেন্দ্রনাথ গান্ধী—কিছুই কি বাদ যাইত?—সমস্তই ছিল তাঁহাদের গল্পের বিষয়। মুখে মুখে ফুটিত সেক্‌স্‌পীয়র ও বার্ক শেরিডন। সেই রেবতী বিনোদ নাই; সুবোধ সবজজ্‌ হইয়া পেনসেন লইবে; শরৎ এখন বাতে ভোগে। তাঁহাদের পরে এই আসরে আসিয়া ক্রমে একত্র হইয়াছিল কুমুদ আর নীলাম্বর,—বারে তাঁহাদের জুনিয়াররা। আসিয়াছিল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অমর ও তাহার বন্ধু মনোজ; আর শেষে কংগ্রেসের কর্মী হেমন্ত, বিজয় ও তাঁহার পুত্র অশোক পর্যন্ত। আজ তাহারাই বা কোথায়? অমর বিদেশে অধ্যাপনা করে। খ্রীষ্টান মেয়ে শান্তাকে বিবাহ করিলে সে আর এই গৃহে এই সংসারে ফিরিবে না।—তবু জ্ঞানশঙ্কর তাহার সেই বিবাহ প্রস্তাবে এবার শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়াছেন। প্রসন্ন মনেই সম্মতি দিয়াছেন,—দিবেন না কেন? আপত্তি কি? বিশেষতঃ যখন সত্যই কাদম্বিনীও তাঁহার পুত্রের মুখ চাহিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত

ছিলেন। কিন্তু জ্ঞান জানেন, এই সমাজে আর অমরের স্থান হইবে না। খ্রীষ্টান মেয়ে শান্তা তাহার আপনার ঘর, আপনার সংসার আপনার নিয়মে বাঁধিবে ; সেখানে পিতা বা পিতৃব্যদের প্রবেশ নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত। তাহাতেই বা নূতনত্ব কি ?—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেশ্বর অতুলের সংসারেই কি আর কাদম্বিনী হৈমবতীর প্রবেশ সম্ভব ? অশোকের নিকটই কি আর এই গৃহ, এই সমাজ, এই তাঁহাদের জীবন-ধর্মের কোনো মূল্য আছে ? সে কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালনা করিবে, মনে করিবে সমাজ সভ্যতা সবই একটা শোষণের ছলনা। কল-কারখানায় সে ধর্মঘট বাধাইবে, এখানে আসিয়া বারাহীপুরের প্রজাদের ক্ষেপাইয়া যাইবে ; আর তর্ক করিবে—শুধু ইউরোপই ব্যাধিগ্রস্ত নয়, ভারতবর্ষেও সেই ছায়া নামিয়াছে—এ স্পেক্‌টার ইজ্‌ হন্টিং বারাহীপুরের রাজাদের, আর এই দেশের ভদ্রশ্রেণীকে—তাহার পিতা জ্ঞানশঙ্করকেও।

বারাহীপুরের ম্যানেজার নায়েবদের সত্য সত্যই যেন দানোয় পাইয়াছে—এই প্রজাবিদ্রোহের দানোয়। জ্ঞানশঙ্কর জমিদারদের বাঁধা উকিল। ইহা জানা কথাই ছিল যে, জমিদারদের একটা বাড়ি তিনি ভাড়া পাইবেন—তাঁহার ‘অচিনতলার’ বাসগৃহ যখন নদীগর্ভে চলিয়াছে। জ্ঞানশঙ্কর ওকালতি ছাড়িয়া যাইবেন না—গেলে না হয় ঢাকায় কিংবা চিত্রিসারে তাঁহার নিজ গৃহে গিয়া আরাম করিতেন। অথবা একেবারে যাইতেন তাঁহার বাল্যের পরিচিত আর চির জীবনের স্বপ্ন বারাণসীতে। সেই সৌভাগ্য তাঁহার হইল কই ? মধুখালিতে তাই তিনি থাকিবেন, অতএব একটা ভাড়াটে বাড়িও তিনি বারাহীপুরের ম্যানেজারবাবুদের নিকট হইতে নিশ্চয়ই এই সময় পাইবেন। এইসব ত জানা কথা। কিন্তু এখন শেষ মুহূর্তে জ্ঞান দেখিলেন ম্যানেজরবাবু বাড়িটা নানা টালবাহনা করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। বুঝিতে দেরী

হইল না—ভাঙা শহরে বাড়ির অভাবে প্রচুর সেলামি প্রভৃতি ইহাঁরা আত্মসাৎ করেন। জ্ঞানের নিকট তাহা চাহিতে পারেন না, তাই তাঁহাকে বাড়ি দিতে ইহাঁদের এই ওজর আপত্তি। জ্ঞান বিস্মিত হইলেন। বিপন্নও হইয়াছিলেন। জানিতেন প্রজা বিদ্রোহের ব্যাপারে অশোক বিজড়িত, আর প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় জ্ঞান জমিদার পক্ষে দাঁড়াইতে চাহেন নাই,—তিনি দেওয়ানী মামলা করেন, ফৌজদারী মামলায় তাঁহাকে এই বয়সে টানা কেন? তিনি বুঝিতেছিলেন, ম্যানেজার নায়েবেরা কলিকাতায়ও রাজাবাহাদুরের কান ভারী করিয়াছে। বড় রাজা জ্ঞানকে বিশেষ জানিতেন, কিন্তু তিনি এখন জমিদারী দেখেন না—কোনো কালেই দেখিতেন না। কলিকাতার 'বাবুদের' শেষ বংশধর তিনি—গান বাজনা পারিষদ বাগানবাড়ি, সব ছিল। ছোট রাজা জমিদারীর ভার লইয়াছেন—বড় রাজার একমাত্র পৌত্র তিনি। তিনি ইংরেজি কেতার লোক, শিকার তাঁহার নেশা। বাঙালীবাবু ও পারিষদরা কাছে ঘেঁসিতে পায় না, সাহেব সুবাদের সঙ্গেই তাঁহার আদর আপ্যায়ন। ইতিপূর্বেই জমিদারীর বাজে খরচ কমাইবার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। মন্দিরে মসজিদে পুরুষানুক্রমে তাঁহারা বৃত্তি দেন, টোলে মাদ্রাসায় সাহায্য দেন। তদুপরি জমিদারীর ইস্কুলে কলেজেও বড় রাজা তাঁহার আমলে দরাজ হাতেই দান করিয়াছেন। মদ ও মেয়ে মানুষের খরচটা কম হইলে হয় ত তিনি আরও অনেক কিছুই করিতে পারিতেন; —অন্তত সম্পত্তিটার ঋণ বাড়িত না। কিন্তু রাজাদের সেই সব খরচ কমিতেছে না। 'বাবুয়ানার' দিন গেলেও খরচ রহিয়াছে, এমন কি বাড়িতেছে। উহার উপর জুটিয়াছে ছোট রাজার শিকারের খরচ, সাহেবিয়ানার খরচ,—ডিনার ড্যান্স্ পিক্চার্স—আউটিং-রেসিং প্রভৃতি

এ্যারিষ্টোক্র্যাসির আধুনিককালের যুগ-সম্মত খরচ। তাই ছোট রাজা কয় বৎসর হইতে জরিপের সুযোগে জমিদারীর আয় বাড়াইতেছেন। তাহারই ফলে ম্যানেজার নায়েব গোমস্তার তাড়নায় শুয়োচকের মহালে প্রজা বিদ্রোহ ঘটিতেছিল। এবার দাঙ্গাও হইয়াছে, এখন মামলা চলিবে। ছোট রাজা আরও তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবার তিনি 'বাজে খরচ' কমাইবেনই। হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইতেছে; তাই মুসলমান প্রজাদের মসজিদে মাদ্রাসার বৃত্তি বন্ধ হইল প্রথম। তারপর শুয়োচকের হিন্দু-মুসলমান সকলের সব বৃত্তি কাটা গেল; পাঠশালার পণ্ডিত মোহনদাস প্রজাদের পক্ষে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছিল—অথচ রাজাদের বৃত্তিও সে পাইত। এদিকে জমিদার সভার প্রস্তাব মত হুকুম আসিল—প্রজাদের কবুলিয়তে লেখাপড়া করিয়া দিতে হইবে. জমিতে কখনো গোবধ হইবে না, জমিদারের হাটে বাজারে গোমাংস বিক্রয়ও চলিবে না। সাম্প্রদায়িকতার রেশারেশি সহরে ধোঁয়াইতেছিল; এখন গ্রামে ছড়াইতে শুরু করিল—অশোকেরা বলিল প্রজাদের মধ্যে ভাঙন ধরাইবার জন্যই জমিদারদের এই কৌশল। সত্যই মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হইল।

বিজয় কংগ্রেস আগলাইয়া থাকে, এই নূতন গোলমাল সামলাইবার পথ সে দেখিতে পায় না। সে চাহে—জ্ঞানশঙ্কর রাজাদের বলিয়া কহিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জানেন এই ব্যাপারে তাঁহার কথায় রাজাদের কর্ণপাত করিবার সম্ভাবনা এখন কম। যুক্তি ও লেখাপড়া ঠিক করিয়া বিজয়কে তিনি বলিলেন:—কলিকাতায় গিয়ে বড় রাজার সঙ্গে দেখা করো—ছোটরাজাকেও বলবে। কিন্তু আসল মানুষ বড় রাজা। তিনি কথাটা বুঝবেন। দেখা সহজে পাবে না, না হয় গানের ওস্তাদ বা সভাপণ্ডিতদের কারো শরণ নিয়ো।

এমনি সময়ে ভাড়াটে বাড়িটাও জ্ঞান ভাড়া পাইতেছেন না,

দেখিলেন। অথচ বাগান ছাড়াইয়া নদী বাসগৃহের দুয়ারে। কখন সে গৃহই নদী গর্ভে প্রায় ভাঙিয়া পড়িবে। বিজয়কে জ্ঞান তার করিলেন, পত্র দিলেন। আর সর্ব শেষে মহালের আর ম্যানেজারদের সর্ব অব্যবস্থার সংবাদ লিখিয়া নিজে রেজিষ্ট্রি করিয়া তাহা পাঠাইলেন বড় রাজা ও ছোট রাজাকে—একবার তাঁহারা নিজেরা আসিয়া মহাল দেখিযা যান।

বেশি আশা করিতে তিনি সাহস করিতেছিলেন না—বড় রাজা আজীবনের বিলাস-ব্যসন অমিতাচারের শেষে এখন নাকি ধর্মকর্ম লইয়া বিশেষ মজিয়াছেন; বিষয়কর্মে মন দিতে চাহেন না। শুধু ওস্তাদি খেয়াল গান ও অপরাহ্নে পণ্ডিতদের শাস্ত্রচর্চাটুকুই বজায় রাখিয়াছেন। বিজয় লিখিয়াছিল তাঁহার দেখা পাওয়া দুঃসাধ্য। ছোট রাজা কার্ড ছাড়া দেখা করেন না,—তাহার সময় আরও কম—তিনি সাহেবি মেজাজের মানুষ। কি হইবে এই অবস্থায়? সমাজে একদিন ইঁহারাই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়, অভিজাত। আজ কি ইঁহাদেব সেই দান ধ্যান, ধর্ম বোধ, ন্যায় বোধ কিছুই নাই? থাকিলে কতটুকু তাহার অবশিষ্ট আছে?

জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় বারাহীপুরের ম্যানেজাববাবু তার পাইলেন: জ্ঞান বাবুকে একটা ভাড়াটে বাড়ি খালি করিয়া দাও। জ্ঞানও এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন।

এবার ম্যানেজার বাবু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

বাড়ির সম্মুখে তখনো অচিন গাঁছ দুইটা নিস্পন্দ, নির্বিকার চিত্তে দাঁড়াইয়া আছে—অপেক্ষমাণ।

এ দুটোকে কাটালেন না? অনেক কাঠ হত যে,—বলিলেন ম্যানেজারবাবু। যেন এই জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

জ্ঞান চৌধুরী তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেনঃ ঠিক করেছিলাম কাটাব। তারপর, কাঠুরেরা এল। কেমন তারা নিজেরাও দুঃখ করতে লাগল—এমন গাছ, এতদিন পরে কাটতে হবে। আমার আর তখন মন সরল না। এখানে এসে আমি নেমেছিলাম—সে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, এই অচিনতলায়। সেদিনকার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল—দাদা বসতেন এদের ছায়ায়। তাঁর বন্ধুরা বসতেন, গল্প করতেন—তখনকার দিনের গল্প—ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয় সরকারের, অথবা সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের কথা।...তাইতে মন সরল না। বাড়ির ওঁরাও আপত্তি করলেন—অচিনা গাছ? ওঁরা বলেন, 'গাছও দেবতা। যান তিনি যেতে চান, মা গঙ্গা নিন। কিন্তু ওঁর গায়ে হাত তুলে কাজ নেই।'

ম্যানেজারবাবু আজ সহজেই জ্ঞানের সঙ্গে একমত হইলেন। তারপর কথাচ্ছলে জানাইলেনঃ এবার তা হলে এ বাড়িতে দেরী করছেন কেন? পাইক বরকন্দাজদের বলছি—আপনার জিনিসপত্র আমাদের ওবাড়িতে নিতে শুরু করুক।

বাসা বদল শুরু হইল।

বিজয়ের নিকট সম্পূর্ণ কাহিনীটা শুনিতেছিলেন জ্ঞান চৌধুরী—ভাঙা বাসস্থলীতে বসিয়া। হাত কাঁপে এখন বড় রাজার; মদ্য পান না করিলে সহি করিতে পারেন না। তবু শম্ভু বাচস্পতি যখন বলিলেন,—এটা অধর্ম কিন্তু, মহারাজ; দান প্রত্যাহার করা যায় না। তিনি ডাকালেন ছোটরাজাকেই।—বিজয় আর দেখে নাই। বড় রাজা তাহাদের বিদায় দিলেন। দশজনের সম্মুখে ছোট রাজাকে তিরস্কার করিবেন এত অথর্ব বা ছোট লোক তিনি নন। অভিজাত আত্মবিস্মৃত হইবে কেন?

সেই অচিনতলার গাছ দুইটা তখন কাঁপিতেছে—ভাঙিয়া পড়িবে কি? না, একবারে ভূমিসাৎ হইবে?—মা গঙ্গা লইবেন তাহাদের, তাহাই ভালো।

হৈমবতী দেখিলেন জ্ঞান চৌধুরী প্রসন্নমুখে অন্দরে আসিতেছেন। এত শীঘ্র আজ কাজ-কর্ম চুকিয়া গেল? কি ব্যাপার! হাতে কি? চিঠি যে।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিলেন: কাজ হয়ে গেল? চিঠি কার?

তার জন্যই তো এলাম বলতে—কাজ শেষ হয়নি। কার চিঠি বলো তো?

আজকাল জ্ঞান চৌধুরী আবার পুর্বেকার মত স্বচ্ছন্দ ও কৌতুকপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। ভালো কথাই;—সেই রক্তের চাপটা না হইলে বাড়িয়া যাইবে। অত দিনের বাসগৃহ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাও সহজে তাই তিনি মানিয়া লইয়াছেন।

কার চিঠি আমি জানব কোত্থেকে?—তেমনি স্বচ্ছন্দ সহাস্য উত্তর হৈমবতীরও মুখে আপনা হইতে জোগায়।

বেশ, ছাখো—

হৈমবতী দেখিবার চেষ্টা করেন। বলেন: চোখে চশমা না থাকলে লেখা দেখতে পারি নাকি? তুমিই পড়োনা, শুনি।

মুচকি হাসিয়া জ্ঞানশঙ্কর পড়িতে শুরু করিলেন। ইংরেজি। হৈমবতীও হাসিয়া পত্রখানা হাতে ঢাকিয়া দাঁড়াইলেন।

রাখো তোমার রঙ্গ। বাঙলায় বলো—কার চিঠি, কে লিখেছে।

পারলে না তো? তোমার মেয়ে অমি' থাকলে এখনি বুঝিয়ে দিত তোমায়।

অমি'র বাপ আছে কেন? বুঝিয়ে দিতে পারে না?

অমি'র বাপ? ওল্ড ফুল্—বুড়ো, ভীমরতি হয়েছে তার।

একশ'বার। নইলে কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে বক্ বক্ করে। চিঠিটার কথা বল্‌তেও ভুলে গিয়েছে।

অনুশোচনার ভান করিয়া জ্ঞানশঙ্কর বলেন: অপরাধ হয়েছে। শুনুন তবে ছোটকর্ত্রী—

বহুদিন পূর্বেকার এই সম্বোধন—'ছোট বউ,' 'ছোট,'—আর বাড়ির অন্যদের 'ছোটকর্ত্রী'। পূর্ব শতাব্দীর পার হইতে একটি স্মৃতি-সৌরভ যেন এই শতাব্দীতে আসিয়া পৌঁছিল আবার। হৈমবতী আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন: শোনো লিখেছে সত্যপ্রসাদ চৌধুরী—রাজীবদা'র ছেলে সত্য,—ব্যারিষ্টার। রাজারা এ দাঙ্গার মামলায় গোড়া থেকে ব্যারিষ্টার পাঠাচ্ছেন—প্রজারা যাতে ভয় পায়। মিষ্টার বোস পরে আসবেন—ছোট রাজা এখনি আসছেন। এর পরে হয়ত ধার কর্জের জন্য রিসিভার নিযুক্ত হবে—যা শুনছি। কিন্তু এখন সত্য আসছে মামলা বুঝে যেতে ও এ্যাডভাইস্ দিতে তাদের সিনিয়র ব্যারিষ্টার মিষ্টার বোসকে। বিলাত ফেরতা ব্যারিষ্টার সত্য, ওঠাই কোথা তাকে বলো তো? জমীদারদের গেষ্ট হাউস্ অবশ্য আছে। কিন্তু সত্য কি উঠবে সেখানে?

হৈমবতী কহিলেন, কেন? এ বাড়িতে সে উঠবে না; অমত হবে?

বরং বোধ হয় উঠতেই সে চায়—আমাদের নইলে লিখবে কেন? অবশ্য অরুণের থেকে পুরীতে শুনেছে পুরনো বাড়ি নদীতে ভেঙে যাচ্ছে। রাজারাও বলেছেন—আমরা আছি ভাড়াটে বাড়িতে।—জিজ্ঞাসু হৈমকে

জ্ঞান বুঝাইয়া বলিলেন, অরুণের কথা অনেক লিখেছে সত্য। অরুণের বুদ্ধি দেখো—পুরীতে যে সত্যর সঙ্গে দেখা হয়েছে তা একবারও বলে নি। অথচ অরুণ যে ক্লাবে খেলে তার একজন মুরুব্বি হল সত্য। ক্লাবের ক্যাপটেনকে ওরা ফুটবলের সীজনের আগে কয়েকমাসের জন্য শরীর সারাতে পাঠায় পুরীতে। বাড়ি ভাড়া করা ছিল, অরুণ সেই ক্যাপটেনের সঙ্গে যায়। সেখানে সত্যও যায় ছুটিতে। অরুণকে পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে ফেলল পরিচয়। লিখেছে—চমৎকার ছেলে কিন্তু সে! সত্যর নাকি মনে পড়ে গেল তার এ বয়সের কথা—যখন সে বিলেতে ছিল, প্রাণপণে চাইছিল ইংরেজের বাচ্চাদের খেলায় হারিয়ে তাদের ব্লু নেবে। সে তা পারে নি। কিন্তু, তার মনে হয়েছে—তাদের চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ির যুদ্ধ লড়াইর খ্যাতি; সেই নাম, রাখবে অরুণ—যদি ক্লাবের কাপ্‌টেনের কথা ঠিক হয়।—

চোখে একটু পলক ফেলিয়া হাসিয়া জ্ঞান বলিলেন,—আর যদি ইতিমধ্যে পা না ভাঙে, হাত না যায়, দাঁত না খোয়ায়, চোখ না হারায়—

চিরকালই খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে জ্ঞান চৌধুরীর এই বক্তব্য। কিন্তু বোঝা গেল আজ সে বক্তব্যে অবজ্ঞা নাই, বরং আছে একটু সকৌতুক গর্ব।

হৈমবতীর মন সৌভাগ্যে গৌরবে যেন নুইয়া পড়িতে চাহিল। চোখ ছাপাইয়া, দেহ ছাপাইয়া পড়িতে লাগিল তাঁহার মনের কথা। কিন্তু মুখে হৈম কথা কহিতে জানেন না, বলিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন, ছ্যাখো। অমরও কিন্তু তাই বল্‌ত—বল্‌ত, 'আপনারা ভাবছেন অরুণ কেন অশোক হবে না; সে কেন রাজেন সেনের ছেলে নাকুর মত হল না।'

অমরের কথা জ্ঞান জানেন : অরুণের উপর তাঁহারাই বরাবর অন্যায় করিয়াছেন। হৈম বলিবেন—'ওকেই তো বেশি খাইয়েছি।' জ্ঞান বলিবেন, 'ওকেই তো টাকা পাঠিয়েছি বেশি।' কিন্তু যাহাকে তাঁহারা স্নেহ করিয়াছেন সম্মান করেন নাই, যাহাকে আদর করিয়াছেন, বিশ্বাস করেন নাই—সে তো তাঁহাদের বিরুদ্ধেই জানিয়া না-জানিয়া ক্ষোভ পোষণ করিবে—ইহাই ব্যাহত ব্যক্তিত্বের নিয়ম, অ্যাড্‌লারের 'ইন্‌ফিরিয়রিটি কন্‌প্লেক্সের' মূলতত্ত্ব।

কি মনে পড়িল জ্ঞানশঙ্করের। তিনি বলিলেন, অমরের ত সবটাতেই 'পার্সোনালিটির' দোহাই—ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী। ছাখো না—

অন্য একখানা পত্র খুলিলেন জ্ঞানশঙ্কর। বলিলেন, পড়তে পারবে? পারবে না তো? সে কিন্তু তোমাকেও চিঠিটা লিখেছে—ইংরেজি হরফে লিখেছে, 'শ্রীচরণেষু'; তারপর 'কাকীমা' আর আমার নাম—

হৈম বলিল, ইংরেজি হরফে? অমর লিখেছে?

শোনোই না; 'শ্রীচরণেষু,' তারপর ইংরেজিতে, বাঙলা করে বল্‌ছি,—

'আমার চিঠি পেয়ে খুব বিব্রত হবেন। কিন্তু তার পূর্বেই আপনারা আমাকে নিয়ে অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করেছেন—অমরের কাছ থেকে তা শুনেছি। সে না বল্‌লেও তা আমি বুঝ্‌তাম। শেষে আপনার শেষের কথাও চিঠি শুন্‌লাম। তারপর অমর তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছে; বল্‌লে, সে সব কথা।

বুঝ্‌লাম, সত্যই আপনাদের অভিপ্রায়—আমরা বিবাহ করি।

তার মা, তার কাকা, কাকী মা একজন বিদেশীয়া অজ্ঞাত কুলশীলা খ্রীষ্টান মেয়েকে তাঁদের পুত্রবধূ রূপে গৃহে নিতে পারবেন, এরূপ দাবী

করলে আমিও আপনাদের উপর অন্যায় করবো, অমরও আপনাদের উপর অন্যায় করবে।

তবু আপনাদের মর্যাদা ও আমার মর্যাদা দুয়েরই আর একটি দাবী আছে। অন্তত আপনাদের তিনজনারই স্বচক্ষে দেখা দরকার,—কে আপনাদের পরিবারের বধূ হবে, হয়ত বা হবে আপনাদের ভবিষ্যদ্বংশধর-দের মা।

আমার সে দাবী আপনারা নিশ্চয় পূর্ণ করবেন। যদি আদেশ করেন—আমি আপনাদের পূজার ছুটির সময়ে আপনাদের পৈতৃক ভবনে যেতে পারি দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে;—তাতে হয়ত আপনাদের সামাজিক দুর্ভোগ বাড়বে। নইলে আসতে পারি আপনার গৃহেও মধুখালিতে;—ও রকম মফস্বল শহরে তাতেই কি কম অসুবিধা হবে আপনাদের? আর যদি আমাকে অধিকার দেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করব—আপনারা এখানে আসুন বারাণসীতে। সম্পূর্ণ আপনাদের মতানুযায়ী বাসের ব্যবস্থা করব, তীর্থ দেখাও হবে আপনাদের। আমাদের নিবেদন এইটাই।

বারাণসীর বাঙালীদের থেকে ভাঙা বাংলায় দু এক কথা বলতে শিখেছি। হয়ত আরও শিখব—মা ও কাকীমাকে দু এক কথা বুঝাতে পারব। তবে বাঙলা লেখা, বাঙলা পড়া এখনো শক্ত, সাধ্যাতীত। আমার 'প্রণাম' আপনাদের জানাচ্ছি। মাকে ইংরেজিতে আর ভিন্ন পত্র লিখলাম না। কে তাঁকে তা গ্রামে পড়ে দেবে? আর ফলে নানা কথায় এখনি তাঁকে লোকে বিব্রত করবে। আপনিই আমার পত্রের মর্ম তাঁদের জানাবেন।

বিস্ময়ে ও অভাবনীয় একটা প্রসন্নতায় হৈমবতী তাকাইয়া রহিলেন মুখ তুলিয়া। এই সেই খ্রীষ্টান মেয়েটির চিঠি! হৈম যেন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। কই, ইহার মধ্যে তো হৈম কোন অভিসন্ধি-পরায়ণা শিক্ষয়িত্রীর কিংবা কোনো চিত্ত-বিভ্রম-কুশলা বিলাসিনীর চিহ্ন দেখিলেন না। অথচ একটা খ্রীষ্টান মেয়েই ধাত্রী হিসাবে এই গৃহে আসিয়া কেমন করিয়া তাঁহার প্রথমা কন্যা সরযূর সংসারে অকারণে ঝড় তুলিয়া তাহা তছনছ করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী ভাবিয়া লইয়াছিলেন—ইহাই বুঝি খ্রীষ্টান মেয়েদের ধারা—উহারা মর্যাদাহীন, প্রেমহীন, শ্রদ্ধাহীন। অথচ একটা স্থির মর্যাদা ও শোভনতাই এই চিঠির সুরে রহিয়াছে, হৈমবতী তাহা বেশ চিনিতে পারিলেন।

জ্ঞান সস্মিত মুখে বলিলেন, শুনলে? কি করবে?

হৈম একটু চমকিত হইয়া বলিল, 'নতুনদিদিকে' এ কথা লেখো—তিনিই ঠিক করুন।

জ্ঞান ভাবিয়া বলিলেন, পুজোর বাড়িতে শান্তাকে যেতে বলি কি করে? আর এ বাড়িতে তেমন ভিন্ন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কোথায়? ভাড়াটে বাড়িতে এসেছি—এখন জায়গায় কুলোবে কি করে?—ছুটিতে ছেলেরাও যদি আসে।

হৈম হাসিল, বলিল, অর্থাৎ কাশীই যেতে চাও।—বল্লেই হয় তা। সে-ই কবে ছিলে কাশী—পঞ্চাশ বছর আগে। তবু ভুলতে পার না কাশী।

কাশী ভুল্লে আর থাকবে কি আমাদের? শেষ শরণ তো বিশ্বেশ্বর—একটু পরিহাস জ্ঞানের কণ্ঠে। কিন্তু হৈম জানেন—সম্পূর্ণ পরিহাসও নয় জ্ঞানের পক্ষে—উহাই তাঁহার অন্তরের চরম কামনা। উহার

জন্যই তো সংসারের এই দিনগুলির এই পরম প্রস্তুতি—দশজনকে লইয়া এত প্রাণপণে সাধনার আয়োজন।

কে বলিল দিন-কাল পরিবর্তিত হইয়াছে?

জমিদারদের তরফ হইতে ব্যারিষ্টার সাহেবদের সাহেবিয়ানার পাকা আয়োজন করা হইয়াছে। বাবুর্চি, বেয়ারা, খানসামা মোতায়েন। বিলিতী রান্না চলিতেছে; বিচিত্র খানা সাজানো। মিষ্টার সত্য প্রসাদ চৌধুরীর তাহাতে লোভও নাই, আপত্তিও নাই। জ্ঞানশঙ্করের বাড়ি আসিয়া একটু ঝাল-ঝোল খাইবার জন্য সে ব্যস্ত। ভালো পিঠা সে কতকাল খাইতে পায় নাই—তাহার মায়ের মৃত্যুর পরে আর তেমন পিঠা সে খায় নাই। কেক্, পুডিং?—এদেশে তাহা কি তৈয়ারী করিবে আমাদের মেয়েরা? ভালোই করিবে; কিন্তু তবু ইতালি, ফ্রান্সের তুলনায় তাহা হইবে মামুলি জিনিস। সেইরূপ শত চেষ্টা করিলেও ইতালি পারিবে নাকি ভীমনাগের মত সন্দেশ তৈয়ারী করিতে? কিংবা মানিকতলার 'কড়া-পাকের' মত জিনিস? অথবা, বাগবাজারের নবীনের মত রসগোল্লা? তবে, ওসব মিষ্টি কলিকাতায়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়;—কিনিতে পাওয়া যায়, বাড়িতেও তৈয়ারী হয়। কিন্তু সত্যকারের মাছের রান্না, আর ক্ষীর নারিকেলের নানা রকমের পিঠা-পায়স—তাহা এই বাঙালদেশের মেয়েরা ছাড়া আর কে জানে? সত্য চৌধুরী তাই এইবার মুখটা বদলাইয়া যাইবে কাকীমার রান্না খাইয়া।

হৈমবতী দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—সরল, আলাপী মানুষ, ইনি ব্যারিষ্টারই বা কি, সাহেবই বা কোথায়? ইঁহার অপেক্ষা অমর অশোকও ত বেশি বিলাতী-ভাবাপন্ন। আত্মীয় পরিজনের

কত খবরে সত্যর আগ্রহ—কোথায় কে আছে, কি করিতেছে? মেয়েরা কোথায়, কাহার ছেলে-পিলে কি? চৌধুরী গোষ্ঠীর জন্য এই মমতা ত অমর অশোকেরও নাই সকলের সংবাদ লইতে লইতে সত্য বলে: অরুণ ক আমাকে বলে কোথায় তার বাড়ি, কার ছেলে? আমাকে বলে—তারা মধুখালির লোক। পরে জিজ্ঞাসা করতে করতে শুনলাম—জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী তার বাবা! তবে রে!—চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ির ছেলে তুমি! আর তোমার এ পরিচয়টা দিতে আপত্তি? তখনই শুনলাম অমরের কথা, অশোকের কথাও; ভারী নাকি বিদ্বান তারা। হবেই ত—চৌধুরী গোষ্ঠী যাবে কোথায়? কি বিদ্যায়, কি সাহসে। কিন্তু ওরা কলকাতায় থাকে, আসে যায়, একটু পরিচয়ও রাখে না আমাদের সঙ্গে। আর ভাবুন ত আপনার কথা! সেদিনে আপনাকে দেখতাম বাবার সঙ্গে দেখা করতেন প্রায় সপ্তাহে সপ্তাহে। কত গল্প জুড়ে দিতেন বাবা আপনাকে পেলে। মা বল্‌তেন, 'একবার চিত্রিসারের বাড়িতে নিয়ে চলো না আমাদের, জ্ঞান?'—মা তো জন্মেও দেখেন নি সেই শ্বশুরের ভিটা।

গৃহত্যাগী, ধর্মত্যাগী, সমাজত্যাগী রাজীব চৌধুরীর সেই প্রাণভরা মমতা চিত্রিসারের চৌধুরী গৃহের জন্য—জ্ঞানশঙ্করের মনে পড়িয়া যায়। তেমন মমতা পোষণ করে কি আর সেই গৃহের জন্য, একালেব কেহ—অমর বা অশোক? সত্য বলিতেছে,—অশোককে লিখবেন দেখা করতে আমার সঙ্গে। আ অমরকে বলবেন যখন কলকাতায় আসে যেন দেখা করে একবার। বিনু নেই; না হলে অরুণের খোঁজ সে-ই আনত।

কি করে সত্যর ছেলে মেয়েরা? জ্ঞান জানিলেন—ভানু ব্যারিষ্টারি পড়িতে গিয়াছিল। ব্যারিষ্টার হইয়াছিল, কিন্তু ভানু 'বিজনেসে' গিয়াছে, এক্‌স্‌পোর্ট—ইম্‌পোর্টে। বিজনেস্ ছাড়া কোনো জাতি

বড় হইতে পারে না!—এই কথা অবশ্য স্বদেশী যুগ হইতেই তাঁহারা বুঝিয়াছেন। কিন্তু কার্যত কিছুই তাঁহারা করিলেন না। বোম্বাইওয়ালারা ততক্ষণ নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আর আমরা বাঙালীরা সাহেব ও মাড়োয়াড়ীর হাতে তুলিয়া দিয়াছি কলিকাতা। যুদ্ধের পরে এতগুলি কোম্পানি হইয়াছিল, সব এখন যাইতেছে। জুট ও হেসিয়ানের একটী বড় সাহেব কোম্পানির সঙ্গেই এখন ভানু তাই সংযুক্ত। কিন্তু চামড়ার কারবারেও সে যাইতে চায়। এখানে ত কাঁচা চামড়ার একটা সংগ্রহ কেন্দ্র। তাহা ছাড়া এই ত বারাহীপুরের জমিদাররা—যদি খাশের জমি ইহাঁরা বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করেন তবে এদেশে কি না হইতে পারে? প্ল্যানটা ছোট রাজার মাথায় আসিয়াছিল; তিনি তাই বিলাত যাইতে চাহেন, কিন্তু বড় রাজা থাকিতে তাহা হইবে না। সত্যর ছোট ছেলে বিনু এখন বিলাত যাইতেছে। ছোট রাজার ইচ্ছা—বিনু এগ্রিকালচার ও এনিমেল্ হাজব্যাণ্ড্রি শিখিয়া আসুক। সত্যর ইচ্ছা বিনু টেক্স্টাইল ইঞ্জিনীয়ার হয়। এখন বিনুর যাহা মত তাহাই সে করুক। ছোট রাজা এখানে আসিয়াছিলেন সেই কথাটাই বুঝিতে;—কেন এত গোলমাল জমিদারীতে,—তাহাও দেখিতে চাহেন।

কিন্তু সত্যই গোলমালটা কি?—তাহা সত্যও বুঝিতে পারে না। প্রজাদের আপত্তি কিসে? এই সব দাঙ্গা ফ্যাসাদের পরামর্শ উহাদের মাথায় জোগায় কে? মোহন দাস নামে একটা লোকের কথা শুনিয়াছে সত্য চৌধুরীও।

সত্য বলে আবার: রাজাদের কাছে কে লাগিয়েছে—আপনার ছেলে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়। অশোকের কথাই বলেছে বোধ হয়। কলকাতার কি একটা দলের লোক সে। দলটার নাম পেজেন্ট্স্

এণ্ড ওয়ার্কস্ পার্টি, না, ওয়াকার্স এণ্ড পেজেণ্ট্স্ পার্টি। যা'ই হোক্, আমি বলি তাতে হয়েছে কি? নয় ওরা সোস্যালিজম্ চায়; সে মন্দ কথা কি? আমি কেয়ার হার্ডির সঙ্গে ঘুরেছি,—ও সব বলসেভিক-টলসেভিক বলে আমকে ঠকানো যাবে না। মুটে মজুরকে আপনারা একটা শক্তি বলেই মনে করেন না। কিন্তু ভাবুন ত, কত বড় শক্তি ওরা। ওদের অরগেনাইজ করতে পারলে এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াতে কতক্ষণ লাগে? আমি তাই রাজাদের উল্টো বলেছি, 'দেখুন, বুঝে-শুনে এসব দলকে ঘাঁটাবেন। বিলাতে এখন ম্যাকডোনাল্‌ড্ মন্ত্রী।—প্রজাদের সঙ্গেও বুঝে শুঝে এখন কাজ করা দরকার।'

সত্যর মনে কোনো বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী জানিতে পারিলে অশোকের কথা জমিদারদের কানে তুলিয়া জ্ঞানের বিরুদ্ধে লাগাইবার মত লোকের অভাব হয় নাই। সত্য ততক্ষণ বলিতেছে: তবে জমিদারদের বিরুদ্ধে এখন লেগে অশোকেরা ভুল করেছে। ইংরেজ রয়েছে দেশে। আর চাষীদের শত্রুও ইংরেজই; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে বরং বাঙলা দেশের চাষীকে গবর্ণমেন্ট লুঠ করতে পারেনি। কৃষকের আসল শত্রু বরং মহাজনরা।

জ্ঞান চৌধুরী কিন্তু ইহাও মানেন না। মহাজনরা না থাকিলে গ্রামের চাষী তাঁতী কারিগর—ইহারা ধার কর্জ পাইত কোথায়? সমবায় নীতি যদি প্রচলিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা না হইলে এই দেশী ক্রেডিট্ সিষ্টেম আমাদের সমাজের নিজস্ব সৃষ্টি। অবশ্য ব্যাংকিং, ইন্‌সিওরেন্স এই সব না গড়িয়া উঠিলে কোনো জাতির উন্নতি হয় না। জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: কিন্তু দেখলে তো বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংকের কাণ্ড। একটা জাতীয় অধঃপতনের প্রমাণ ত তা। ওটা যায়নি ত শুধু, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মফঃস্বলের ছোটখাটো লোন-আফিস, ব্যাংক

গুলোকেও প্রায় পথে বসিয়ে গিয়েছে। এর পরে লোকে যৌথ কারবারে ভরসা রাখবে কি করে?

কিন্তু বিজনেস্ ছাড়া আর পথ কই? শিক্ষিত-শ্রেণী খাবে কি করে?

জ্ঞান চৌধুরীও তাহা ভাল করিয়াই জানেন,—ভদ্রলোকের আজ জীবিকার কোন পথ আর নাই। ব্যবসাপত্রে তাঁহার আপত্তি ছিল না কোনো দিন—তাঁহার দাদা বিভূতিশঙ্কর ঠিকাদারী করিয়াই এই পরিবারের নূতন ভাগ্য পত্তন করিয়া যান। তবে তিনি ঠিক ব্যবসায়ী প্রকৃতির ছিলেন না। তাহা হইয়াছে সুরেশ্বর—পাটের কারবারে সে বড় লোক হইয়াছে। এখন তাহার মাথায় কাপড়ের কল; চা বাগানেও চোখ পড়িয়াছে। সত্য শুনিয়া উৎসাহিত বোধ করে। অবশ্য জ্ঞান তাহাকে বলিলেন না—কিন্তু ভদ্রলোক নাই আর সুরেশ্বর। ভদ্রলোকের ছেলে 'ব্যবসায়ী' হইয়াছে, খোয়াইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান।

একমত হইয়া যান সত্য ও জ্ঞান চৌধুরী—ব্যবসা ছাড়া বাঙালী ভদ্রলোকের পথ নাই; ব্যাংকিং যৌথ কারবার আর সমবায় ভাণ্ডার চাই। জমিদারদের চাই নূতন করিয়া জমিদারী অরগেনাইজ করা—যেমন বরাহীপুরের ছোট রাজা এখন চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের দয়ামায়া থাকিবে বৈ কি? না হইলে জমিদার কি? মন্দির মসজিদে ইস্কুলে কলেজে, দানে ক্রিয়া কর্মে তাঁহারা বৃত্তি দিতেন, দিবেন। এ দেশের 'ন্যাচারল লিডার' হইতে পারেন তাঁহারাই—লেখাপড়া শিখিলে। এখন জমিদারদের দরকার ফারমিংএ হাত দেওয়া, বিজনেস্ স্কেলে কৃষি ও পশুপালন করা। যেমন, নারিকেলের নানা ব্যবসা হইতে পারে এই অঞ্চলে। চামড়ার কারবারও হইতে পারে—আপত্তি করিতেন নাকি ইহাতে জ্ঞান?

না, তাঁহার নিজের আপত্তি নাই। তবে হিন্দু ভদ্রলোক এই কাজে যাইতে চাহিবে না। কুসংস্কার?—ঠিক। কিন্তু সংস্কারটা

একেবারে 'কু'ও নয়। গোরু মারিয়া জুতা দান বা ধর্মশালা স্থাপন নাই বা করিল ভদ্রসন্তানেরা? একেবারে মারোয়াড়ীর মত ব্যবসায়ী নাই বা হইল বাঙালী? অবশ্য ট্যানারি করিতে পারে,—তাহাতে জ্ঞানের আপত্তি নাই। মুচি বা মজুর রাখিয়া কাজ করানো, সে এক কথা; আর কাঁচা চামড়ার রপ্তানি কারবারে লাগিয়া যাওয়া, আর এক কথা। বরং ছোট রাজাকে সত্য যেন বলে—চামড়ার ব্যবসায়ে রাজারা যেন হাত না দেন;—অনেক দেবত্র, মন্দিরের মালিক তাঁহারা। প্রজারা এইরূপ ভালো মনে করিবে না।

আবার সত্য জিজ্ঞাসা করিল: আপাতত, এই দাঙ্গা ফ্যাসাদ মিটানোর কি ব্যবস্থা করা যায়?—ব্যবসায়ের আলোচনায় এই কথাটা সেপ্রায় ভুলিয়া যাইতেছিল। মহালটায় প্রজাবিদ্রোহ হয়েছে; বলে কর্মচারীরা।

জ্ঞান বলিলেন: প্রজাবিদ্রোহ মিথ্যা নয়। ওরাই নানা অত্যাচার করেছে প্রজাদের ওপর। নইলে এদেশের প্রজা জমিদারদের জানে পিতৃতুল্য। আর জমিটার উপর সত্যই প্রজাদের দাবী আছে।

জ্ঞান ভুলিতে পারেন নাই—জমিদারদের উকিল হিসাবে তিনিই প্রজাদের সে দাবী অগ্রাহ্য করাইয়া দেন,—উহাই নালিশ অশোকেরও।

সত্য বলিল: কিন্তু করা যায় কি? মামলা-মোকর্দ্দমা আছে, তা চলছে, চলবে। আমি বলেছি ছোট রাজাকে—তা করছেন করুন, কিন্তু ফারমিং করতে হলে শুধু এভাবে চলবে না। কিন্তু পথ কই?

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: যদি ওঁরা কথা শোনেন তা হলে একটা পথ করা যায়।

কি সেই পথ, জ্ঞান জানাইলেন।—মাতব্বর প্রজাদের রাজারা ডাকাইয়া পাঠান—প্রতিপক্ষের উকিলদের সঙ্গে না হয় জ্ঞান কথা

বলিবেন। অন্য দিকে বিজয় আছে, সে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ। প্রজারাও সকলে তাহাকে জানে, তাহাকে মানে। বাগড়া দিবে যাহারা—মোহন দাস, বা ওই অশোকের বন্ধুরা—তাহারাও বেশি কথা বলিতে পারিবে না বিজয়ের সম্মুখে। আর রাজাদেরও একটু দয়া ধর্ম দেখাইতে হইবে প্রজাদের উপর। বিশেষত মুসলমানদের উপর। তাহারা তেজীয়ান লোক, হিন্দু জমিদারের নায়েব গোমস্তারা উহাদেরই তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিত বেশি।

একটা বড় রকমের কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করিতে পারিত সত্য চৌধুরী। নিজে সে সেদিকে উদাসীন। কাজেই সার্থকতার ফলটা পাইল ছোট রাজাবাহাদুর আর ম্যানেজার বাবু। মোহনদাস আর মুনিম খাঁ আটিয়া উঠিতে পারিল না—বিজয়বাবু আর জ্ঞানবাবুর সঙ্গে। প্রজারা অনেক সহিয়াছে, সহজেই আপোষে রাজী হইল। মুনিম খাঁর সন্দেহ নাই—অশোক চৌধুরীই পিতা ও বন্ধুদের নামের আড়ালে কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, যে কৃষকদের অশোকও বিদ্রোহে উস্কাইয়া দিয়াছিল। না হইলে এতবার মুনিম লিখিল, অশোক তবু আসিল না কেন?—সে বলে, বাউরিয়ায় ধর্মঘট চলিতেছে।

প্রজারা বুঝিল—রাজা বাহাদুর দেবতা!

২

মনোজ আপত্তি করে না, কিন্তু সে মনে মনে অনুমোদনও করে না—বিজয়দের এই ফাঁকা রাজনীতিতে কেন জ্ঞান চৌধুরীকে বিজয় টানাটানি করে? সত্যই ত' কি আছে এই রাজনীতিতে? রাজনীতিই যদি সত্য হয়, তবে সত্য বরং অশোকদের রাজনীতি—তাহাতে তবু একটা নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা আছে। কিন্তু আসলে রাজনীতি জিনিসটাই সত্য নয়, তাহা মনোজীবন জানে। সীজারের প্রাপ্য সীজারের থাকুক,

খ্রীষ্টের এই কথার মধ্যে সত্য আছে। 'তেনাঁহং কিং কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্থাম্।'

বিজয় এসব সূক্ষ্ম তত্ত্ব মানিবে না, মানেও না। সে জ্ঞানকে আসিয়া ধরিয়াছিল, আপনাকে সভাপতি হতে হবে।

কিসের সভা?

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা।

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন আমি রাজনীতি বিশ বছর আগেই ছেড়েছি। কংগ্রেসের এ কালের রাজনীতিতে একদিনও যাইনি। এখন আর যাবার আগ্রহও নেই। আমাকে দিয়ে কি হবে?

আপনাকেই চাই। যথাসম্ভব ব্যাপারটা সার্বজনীন করতে হবে। আপনি কোনো দলে নেই। পদস্থ প্রবীণ বলতে আপনাকে পাই। এই শুয়োচকের প্রজাবিদ্রোহ মিটাতে আর কেউ পারত নইলে?

'প্রবীণ' বলিল বিজয়, এখনো বৃদ্ধ বলিতে বুঝি সঙ্কোচ বোধ করে; —কৌতুক বোধ করেন জ্ঞান। সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদও লাভ করেন। নিশ্চয়ই অশোকও স্বীকার করিবে—জ্ঞান চৌধুরী শুয়োচকের দরিদ্র প্রজাদের রক্ষা করিয়াছেন। হাজতে জেলে উহারা পচিতে ছিল, মামলা মোকদ্দমায় জেরবার হইতেছিল। জমিদারের সঙ্গে কলহ করিয়া বাঁচিতে পারিত নাকি প্রজারা? অশোক ত গোলমাল বাধাইয়াই ভাবিল—খুব হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজাদের মান রক্ষা করিয়াছেন বিজয় ও জ্ঞানই। না হইলে কি জমিদাররা এত সুবিধা ছাড়িয়া দিত প্রজাদের? মোহনদাস আর মুনিম খাঁ অবশ্য কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। আর ইহারাই নাকি অশোকদের দলের লোক;—এই সব গোঁয়ার ও গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক লইয়া কাজ চলে কখনো? অশোকই বা ইহাদের সহিত মিশে কি করিয়া? তবে অশোক বরাবরই ঐ সব

উগ্র ও মূর্খ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মিশে—সেই নন-কোঅপারেশনের সময় হইতে। এখন ত সে বল্‌শেভিকই। এ কালের রাজনীতিতে বুদ্ধি বিবেচনা, স্থিরতা ধীরতার কোনো মর্যাদা নাই। জ্ঞান চৌধুরী ইহাদের এই নীতি ও এই রুচি পরিপাক করিতে পারেন না।

জ্ঞানশঙ্কর বিজয়কে বলিলেন, বিজয় আমি উগ্রপন্থী ত নই-ই; এখন বোধহয় বরং নরমপন্থীই। না বুঝি কংগ্রেসের রাজনীতি, না বুঝি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। দ্যাখো, ভাগ্যক্রমে বার্কেনহেডের মত জবরদস্ত লোক এখন ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্। তাই কালা-আদমি-বর্জিত কমিশন বসাল—খোস্-দোরস্ত শাদা কমিশন। নইলে আমরা কি করতাম বলো ত? আমরা একমত হয়ে কি পাঁচজন ভারতবাসীকেও বেছে দিতে পারতাম? শাস্ত্রী-সাপ্রুদের নিলে তোমরা বলতে—"জোহুকুমের কমিশন।" তাঁদের বাদ দিলে আমরা বল্‌তাম—'মগজহীনদের কমিশন।' আবার ভাবো মুসলমানদের কথা। 'সব শেয়ালের এক রা';—কাজেই সব মুসলমান বল্‌বে, মুস্‌লিম প্রতিনিধির সংখ্যা হোক অর্ধেক, কিংবা অন্তত সাত আনি। কিন্তু তারপর? এদিকে গজনবী, ওদিকে ফজলুল হক; এদিকে মহম্মদ আলী আর ওদিকে মিষ্টার জিন্না:—এদের কাকে ছেড়ে কাকে নিতাম কমিশনে? এদের ছাড়াও আছে ফজলি হোসেন, মিঞা সাফি, মহম্মদ হেদায়েতুল্লা, উমর হায়াৎ খাঁরা। আর আমাদের মাদ্রাজের অব্রাহ্মণরা—তাদেরই বা বাদ দেওয়া যায় কি করে? কাউন্‌সিল ভাঙার দিনেও এরা ইংরাজের কাউনসিল টিকিয়ে রেখেছে। ফজলি হোসেন ত গান্ধীজীর খেলাফৎ-মার্কা হিন্দু-মুসলমান আঁতাৎই ভেঙে দিলে,—সারা দেশে মুসলমান হিন্দুর কলহ বাধালে। এসব দরকারী কাজ যারা এত যোগ্যতার সঙ্গে করে আসছে, তাদের ব্রিটিশ সরকার এ কমিশন

থেকে বাদ দিয়ে সেখানে কি বসাবে আমাদের মতিলাল কিংবা বিঠলভাইকে, ডাক্তার আনসারি কিংবা হাকিম আজমল খাঁকে? অতএব দেখছ, কমিশনটা শতখানেক লোকের হলে একরকম চলত। কিন্তু তোমরা যারা জাতীয়তাবাদী তারাই তাহলে তলিয়ে যেতে।

বিজয় বলিল, আপনিও কি অশোকের মত বল্‌বেন নাকি—এ সব উচ্চ শ্রেণীর আন্দোলনের দিন ফুরিয়েছে? কমিশন-টমিশন নয়, চাই জন সাধারণের নির্বাচিত কন্‌ষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্‌বলি।

জ্ঞান অবাক হন।—কন্‌ষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্‌বলি? তা' আবার কি? জানি না। আমার অত বিদ্যা-বুদ্ধি নেই যে ওসব বুঝি।

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেনঃ বুদ্ধি তো ছিল। অবশ্য আমাদের দেশী বিদ্যায় কুলোবে না। জানব কি করে এ আবার কোন্ দেবতা? জানতাম ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল কন্‌ষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্‌বলি দিয়ে—অবশ্য শেষ হল টেররে ও নেপোলিয়নের ডিক্টেটরশিপে। কন্‌ষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্‌বলি ত তা হলে অশোকদের চাই ই; নইলে বিপ্লব হবে কি করে? বিলিতী প্যাটার্ণে কার্পেট বুনে না আমাদের মেয়েরা? এও অশোকদের তাঃ—বিলাতী প্যাটার্ণে বিপ্লব বুনে তুলবে তারা এ দেশে।

বিজয় বলিল, যাই হোক, এখন এই সাইমন কমিশন বয়কট্ করতে হবে। তার জন্যই প্রতিবাদ সভা করব প্রথম। সকল দলকে একত্র করতে পারব এবার। আর আপনি ত তাই চান। এ কাজে আপনার অমত করা চলবে না।

অমত করা চলিল না। কিন্তু জ্ঞান ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিলেন আর এসব হৈ চৈএর কাজে তিনি যাইবেন না। তিনি দীক্ষা লইয়াছেন, একটু ধর্ম-চিন্তা ও ধর্মালোচনা করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে,

যতটা পারেন বরং ধর্মকর্মের সঙ্গে উপার্জন করিবেন; সঞ্চয় কিছু করা চাইতো। তাঁহার বয়স বাড়িতেছে, পশার কমিতেছে, নানাস্থানে উপার্জিত অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছেলেরা কেহ কিছু করিবে তাহা মনে হয় না। অন্তত তাঁহার জীবিতকালে যে তিনি ইহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইবেন, ইহা আশা করা শক্ত। অশোক এইরূপই খামখেয়ালি ভাবে রাজনীতি ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিবে। অরুণ বি-এ পড়িতেছে; কিন্তু সে কোনো বিষয়ই বুঝিতে চাহে না, তাহার দায়িত্ব-বোধ নাই। ছোট মেয়ে অমি' কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, বড় হইতেছে; তাহার বিবাহের কথাও ভাবিতে হয়; আর হৈম'র ভবিষ্যৎও না ভাবিলে চলে নাকি?

কিন্তু তবু জ্ঞান চৌধুরী কাজ ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন না। কলেজ ইস্কুল, সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি তো আছেই; আর হিন্দু-রক্ষাসভাও ছাড়ে না। বিজয়ও কোনো একটা সার্বজনীন কিছু করিতে হইলেই জ্ঞান চৌধুরীকে আসিয়া ধরিবে,—কাকাবাবু, রাজী হোন্। কারণ, মান্যগণ্য লোকদের মধ্যে জ্ঞানের মত লোক কোথায়?

জ্ঞানকেও রাজী হইতে হয়। মনোজ পসন্দ করে না: কিন্তু হইবেন না কেন? এই সব সম্মান জনক কাজ তাঁহার বয়স ও তাঁহার মর্য্যাদার দক্ষিণা—সমাজের দশজনের দেওয়া দান। রাজার দেওয়া খেতাব নয়, রাজকীয় বড় খেলাতও নয়; সাধারণের দেওয়া সাধারণ সম্মান—কাজের দায়িত্ব। ইহা এড়াইবার উপায় নাই, এড়াইবেনই বা কেন তিনি? পরিশ্রম অবশ্য আছে। কিন্তু পরিশ্রম অপেক্ষা পরিতৃপ্তিও কম নয়। তাই মনে মনে একটু গর্বও বোধ করেন জ্ঞান চৌধুরী—আর নিজেকে বৃদ্ধ ভাবিয়া ব্যথিত অবসন্ন, বোধ করেন না।

কিন্তু জ্ঞানের এইসব পরিশ্রমের কাজ হৈমবও মনঃপূত হয় না। মনোজকে হৈম বলেন,—তোমাদের সঙ্গে বসে গল্প করেন বরাবর, তাই ভালো। আবার সভা-সমিতি কেন? বাধুক আবার এসব নিয়ে কোনো গোলমাল—তখন সবাই বলবে 'উনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে গেলেন, মুসলমানদের পক্ষ নিলেন।' অমি' পর্যন্ত তা শুনে ক্ষ্যাপামি করে।

মনোজ বলিল: আর তা করবে না। এবার কেমন ভালো মেয়ে হয়ে গিয়েছে, দেখেছেন তো। ওঁর সঙ্গে বসে সেকস্‌পীয়র পড়ছিলেন অমিতা।

হৈম হাসিলেন, বলিলেন: ছাই হয়েছে। পড়াশুনার ঝোঁক ছিল কমলার, দেখেছ ত। অমি'র সে সব নেই। আসুক সে ফিরে, দেখবে—তেমনি লাঠী-ডেগার সেতার-এস্রাজ নিয়ে পাড়া মাতিয়ে ফিরবে। শোনো নাই ইন্দি' অমি' দুবোনে সেই সাইমনের বিরুদ্ধে ইস্কুলে ধর্মঘট করেছে, হোষ্টেল থেকে ওদের তাড়িয়ে দেবার কথা হয়েছে। কীসব নিয়ে মেতেছে ওরা কলকাতায়—যখন যে পাগলামী মাথায় চাপে।

মনোজও দেখিয়াছে—কমলার লেখাপড়ায় আগ্রহ ছিল। সে সাহিত্য ভালোবাসিত; রস-গ্রহণ করিতে পারিত। অমিতার সেদিকে এখনো ঝোঁক নাই। সেক্‌স্‌পীয়ব অমিতা বুঝিত না নিশ্চয়ই; বুঝিলে বুঝিত কমলা; কিন্তু সে শ্বশুরালয়েই গৃহকর্মে মগ্ন!

সেক্‌স্‌পীয়র জ্ঞান চৌধুরীদেরই নেশা,—পুরাতন নেশা। মনোজ বা অমরও সেক্‌সপীয়রকে ভালোবাসে। কিন্তু এমন করিয়া তাঁহার নামে মাতিয়া উঠে না। তাঁহার অপেক্ষা অনেক ছোটদরেব কবিও মনোজ অমরের নিকট বেশি আপনার মনে হয়।—জ্ঞান চৌধুরী তাহা মানিবেন না। মনোজ বুঝাইতে চাহে—কীট্‌স বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ,

গ্যয়েট কিংবা ব্রাউনিং, ইয়েটস্ বা রবীন্দ্রনাথের কথা নয়। মহারথীদের কথা সে ছাড়িয়া দিল। এইত ডনের কবিতা মনোজ্ঞের ভালো লাগে। আর এই যে নূতন কবি যাহার কবিতার বই অমরকে বিলাত হইতে পাঠাইয়াছিলেন শাস্তা—টি-এস্ এলিয়ট,—তাঁহার কাব্যকলায় বিমুগ্ধ হয় অমর। মনোজও স্বীকার করে, ইহাঁর বক্তব্য যেন তাহাদেরই নিজস্ব কথা—যুগের কথা, 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড' এযুগ।

কিন্তু সেকৃস্পীয়র?—জ্ঞান চৌধুরী কহিবেন—তাঁহার বক্তব্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি যুগের কথা, প্রত্যেকটি মানুষের কথা।

কি পড়ছেন? টেমপেষ্ট?—জিজ্ঞাসা করিয়াছিল জ্ঞানকে মনোজ।

হাঁ, সলজ্জভাবে উত্তর দেন জ্ঞান।—বইটা নামানো ছিল সেই বাড়ি বদলের সময় থেকে। তোলা হয় নি। একবার পাতা উল্টে দেখছিলাম আবার। প্রোস্পেরো বিদায় নিচ্ছে—লণ্ডনের কর্মক্ষেত্র থেকে যেন জীবন-যুদ্ধের শেষে প্রশান্ত-চিত্তে বিদায় নিচ্ছেন সেকৃস্পীয়র। পৃথিবী তাঁর চক্ষে ওয়েষ্টল্যাণ্ড নয়—কর্মক্ষেত্র, তাই ধর্মক্ষেত্রও।

উঠিয়া পড়ে এই ভাবে সেকৃস্পীয়রের কথা।—মানব-জীবনের দ্বন্দ্ব-বিয়োগের মধ্য দিয়া অবশেষে জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাইয়াছেন কবি টেম্পেষ্টে। সকল দ্বন্দ্ব বৈচিত্রের মধ্য দিয়া পৌছিয়াছেন একটা ঐক্য চেতনায়;—জীবন যেন মহাঐকতান।

মনোজ কিন্তু সেকৃস্পীয়রের সম্বন্ধেও অতটা স্বীকার করিবে না—জীবন ও জগৎ তিনি দেখিয়াছেন তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু—

মন বুদ্ধি পর্যন্ত তাঁর এলেকা। আত্মার গহন তলে সেকৃস্পীয়র নামতে পারেন নি। তমসা পরস্তাৎ যে সত্য তা তাঁর অগোচর, অবান্তর তাঁর পক্ষে।

জ্ঞান জানেন—মনোজীবনের এই অন্য এক ঝোঁক অধ্যাত্ম তত্ত্বের দিকে। অশোক বলিবে—আফিমের নেশা। কিন্তু তাহা নয়।

সাংসারিক বুদ্ধি মনোজের বিশেষ নাই, নিজের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি তাহার দৃষ্টি পূর্বেও ছিল না। সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের ছেলে, দারিদ্র্যকে কোনদিন একটা বড় অপমান বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই। এখন কিন্তু বুঝিতে পারিতেছে দারিদ্র্যও একটা দুর্ভাগ্য। তাই আসলে বিনা চিকিৎসায় তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। অবশ্য ডাক্তারি ঔষধ সে খাইত না—আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি মত আপনার ধর্ম ও আচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাণ দিয়াছে। এই বিশ্বাসের সত্যটুকু তখন কম সান্ত্বনা দেয় নাই মনোজকে। কিন্তু অমর অশোক তাহা ক্রমশ ফুটা করিয়া দিয়াছে;—অন্ধসংস্কারের মূল্য কি? মাষ্টারের দারিদ্র্যকে এই ভাবে ঢাকা দিয়াই বা লাভ কি? ইহাদেরও কথায় যে সত্য আছে মনোজ তাহা তখনো ভুলিতে পারে নাই। জ্ঞানও কি পারিয়াছে? তাই কি মনোজ আর বিবাহ করিতে চাহে না? বলে, দুইটি শিশু আছে; তাহাদের ঠিক মত লালন-পালন হয়, এমন অবস্থা কোথায়? মনোজের মুখে জ্ঞান চৌধুরী এই যুক্তিটা নতুন শুনিয়াছিলেন, মনেও রাখিয়াছেন। কিন্তু মুখে বলিয়াছেন, ব্যবস্থা ত করতে হবে।

ব্যবস্থা এক রকম হইয়াছিল। শ্বাশুড়ী আসিয়া ভার লইয়াছেন একটি শিশুর; আর-একটিকে নিঃসন্তানা বিধবা শ্যালী পালন করেন। কিন্তু তাঁহারা ভার লইলেও আর্থিক দায়িত্ব অন্তত মনোজের ছিল।

কিন্তু শ্বাশুড়ীর মাথায় আরএকটা বুদ্ধিও ছিল। মনোজের সংসার আগলাইয়া তিনি শহরে কতদিন থাকিবেন? বিশেষত, ঘরে তাঁহার একটি নবম কিংবা দশম বর্ষীয়া কন্যাও রহিয়াছে। অর্থাৎ মনোজ তাহাকে বিবাহ করুক্—দুই দিনেই সে বড় হইবে, মনোজের সংসারের ভার লইতে পারিবে। তিনি হৈমবতীকেই মুরুব্বি ধরিয়াছিলেন—মনোজ তাঁহার কথা

ফেলিতে পারিবে না! শ্যামলা সেই মেয়েটিকে স্ত্রী থাকিতে মনোজ আপনার স্নেহের পাত্রী রূপে দেখিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ তাহাকে আপনার গৃহিণীরূপে দেখিতে হইবে শুনিয়া মনোজের মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। প্রস্তাবটা হৈমবতীর নিকট শুনিয়া অশোকও ফোঁড়ন দিয়াছিল,—'বরং বিধবা শ্যালীকেই মনোজ বিবাহ করুক, সর্ব রকমে তাহাই শোভন হইবে।' কিন্তু শাশুড়ীর কথাটা হৈম একেবারে মন্দ মনে করে না।

'সত্যই ত, সংসারধর্ম তুমি করবে না কেন?—শ্বাশুড়ীর হইয়া হৈমবতী জিজ্ঞাসা করেন। মনোজ শান্তভাবে যুক্তি দেখায়। হৈমবতী তাহা মানেন না: 'হাঁ, মাষ্টারি করে কেউ আর বিয়ে করে না নাকি?' আর, 'তেরোতে আর তিরিশে তফাৎটা কি?—তেরো না হয়, এগারোই এখন মেয়ের বয়স। কিন্তু মেয়েদের বয়স ত দুদিনে বাড়ে।' তা ছাড়া, 'মেয়েটি তোমার আপন শ্যালী।' 'তোমার ত অমরের মত বিদুষী বউ চাই না, সংসার চল্‌লেই হোল।'

সংসার চলিলেই হইল—সত্য কি? গোল বাধিয়া যায় মনোজের।—তাহা ছাড়া সেদিনও বিলাতে শ্যালিকা বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ, হার্ডির টেস্ অব দি ডুরবারভিল্ লইয়া তাঁহার পরেওঝড় উঠিয়াছিল। আমাদের সমাজে অবশ্য উহা বরাবরই প্রশস্ত;—কিন্তু আমাদের সমাজে পুরুষের পক্ষে সবই প্রশস্ত। কিন্তু আজ যদি জীবিতা থাকিত তাহার স্ত্রী—কি মনে করিত সে এই প্রস্তাব শুনিলে? হয় ত বিশেষ কিছু মনে করিত না, অন্তত মুখে কিছু প্রকাশ করিত না; সবই মানিয়া লয়, যেমন মানিয়া লইয়াছে এমন বুদ্ধিমতী কমলা—সংসার চলিলেই হইল। কিন্তু সেই নিতান্ত বালিকা মেয়ে—যাহাকে মনোজ প্রায় আপনার কন্যা সমতুল্যাই জানিয়া সেদিনও নানা রকমে ক্ষেপাইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কাঁদাইয়াছে হাসাইয়াছে—তাহাকে

করিতে হইবে আপনার অঙ্কশায়িনী? মনোজের মন বিদ্রোহ করে।—অমন সংসার চলিলে তাহার হইবে না।'

কিন্তু সেই বালিকা ত আর বালিকা নাই! তাহার দিকে মনোজও যে আগেকার মত সেই স্বচ্ছন্দ সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইতে পারিল না। না, কেমন একটা নতুন ঔৎসুক্য মনোজকেও পাইয়া বসিতে চাহে। উহার বালিকা মনে ও বালিকা দেহেও কি তবে একটা নূতনতর অনুভূতি ফুটিয়া উঠিতেছে? নিজের মধ্যে একটা গ্লানি ও লজ্জা অনুভব করিয়া মনোজ হৈমকে বলিয়াছিল: 'এ অন্যায় কথা। ওকে মেয়ের মত দেখতাম আমি। আপনি আর এ কথা তুল্‌বেন না।' আত্মীয়দের সঙ্গে মনোজ ইহা লইয়া চটাচটি করিল। অপর কোথাও বিবাহ করিবার কথাও কানে তোলে নাই। কিন্তু নিজেও স্বস্তি পায় নাই।

তারপর বিবাহ হইয়া গেল সেই শ্যালীর। বিশেষ সুপাত্রেও পড়িল না। এবার মনোজ যেন নিজেকেই মনে করিল অপরাধী। আবার সেই স্নেহার্থিনী মেয়েটিকে আপনারই অগোচরে আপনার বাসনার লক্ষ্যস্থানীয়া হইতে দেখিয়া নিজেকে আরও জর্জরিত করিতে লাগিল এক অপরাধ বোধে।

হৈম এই সমস্ত না জানিলেও জ্ঞান দেখিয়াছিলেন—দশজনের সঙ্গে, বিজয়ের সঙ্গে কথায় কথায় মনোজের সহজেই এখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বড় বেশি আত্ম-জিজ্ঞাসায় উন্মুখ মনোজ। সব দেখে ওয়েষ্টল্যাণ্ড; রস পাইতেছে না। সংসার অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার দিকে তাই ঝোঁক বরং সংসারের দশটা কাজেই তাহার আগ্রহ জন্মানো প্রয়োজন। তাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন আর্থিক সচ্ছলতা ও সমাজে প্রতিষ্ঠা। উঠিয়া পড়িয়া জ্ঞান চৌধুরী লাগিলেন কলেজের একটা অধ্যাপক পদে মনোজকে নিযুক্ত করিতে। সব ঠিক ছিল—কিন্তু বাধ সাধিল

বারাহীপুরের ম্যানেজার বাবু ও তাঁহার দলবল, কুমুদ পর্যন্ত।—প্রজাবিদ্রোহ হইতে জ্ঞানের উপর ম্যানেজারবাবুরা রুষ্ট ছিলেন। কুমুদের আক্রোশ অবশ্য পুরাতন ;—এই মনোজকেই তাঁহার কলেজের বন্ধু জজসাহেব মিষ্টার দত্ত পাব্লিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী করিয়াছিলেন, কুমুদকে করেন নাই। অবশ্য দুই বৎসরের মধ্যেই কুমুদ সেই পদ কাড়িয়া লইয়াছে।—কলেজ কতৃপক্ষ এখন স্থির করিল, মনোজ একটা থার্ডক্লাশ এম্-এ, ছিটগ্রস্ত ; কলেজে পড়াইবে কি ?

জ্ঞান বুঝিতেছেন, বাহিরের এই সব অপমানে ও অন্তরের আত্মগ্লানিতে মনোজ এখন সান্ত্বনা খুঁজিতে শুরু করিয়াছে এইরূপ বিষয়-বিমুখ অধ্যাত্মবাদে। কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়রকেও সে খর্ব করিতে চায়, জ্ঞান ইহা সহিবেন কিরূপে ?

জ্ঞান বলিলেন, ঋষির রাজ্য আর কবির রাজ্য এক নয়,—যত্র বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তা'ই হল ঋষির রাজ্য। কথা ও মন সেই অতীন্দ্রিয় লোকের ভাষা নয়—অনুভূতিই সে লোকের প্রমাণ ও মন্ত্রে উহার প্রকাশ। কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়র সাম্রাজ্য করেছেন মন ও বাক্য নিয়ে। তাঁর সেই রাজ্য থেকে যতটুকু অন্য জগতের আভাস পাওয়া যায় তা সেক্‌স্‌পীয়র অপূর্ব রূপেই দিয়েছেন। ধরো—

We are such stuff
As dreams are made on ; and our little life
Is rounded with a sleep.

সেদিনের আবৃত্তি-কুশল শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞান চৌধুরী। আসিয়া পড়িতেছে তাঁহার মনে ভিড় করিয়া সেক্‌স্‌পীয়রের কত অমর বাণী। মনোজ জানে স্মৃতিশক্তির এই অনুশীলন ও এমন করিয়া সেকস্‌পীয়রে তন্ময়তা এই বৃদ্ধদের পরে এই দেশে লোপ পাইয়া গিয়াছে ;—মনোজদের

অমরদের দিনেই তাহা আর ছিল না। তখন রবীন্দ্রনাথের যুগ ইংরেজি শিক্ষিত ছাত্র সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে !—আজ তাহাও বুঝি নাই, আসিয়া যাইতেছে নজরুলের যুগ, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের যুগ ;—ওয়েষ্টল্যাণ্ড-ও নয়, বিজয়দের 'পথের দাবীর' বিক্ষোভ। কিন্তু মনোজ এই বিক্ষোভে কোনো গভীর সত্য দেখে না, উহা একটা বিকৃত জাতীয়তাবাদ। সেক্‌স্‌পীয়রও আসলে গভীরতম সত্যের নাগাল পান নাই। তাই জ্ঞান চৌধুরীর আবৃত্তি-করা সেকস্‌পীয়রের বাণীতে বিমুগ্ধ হইলেও মনোজ সেই কথা ভুলিবে না। 'এহো বাহ্য।'

সে বলিল,—তবু মনে হয় কোথায় যেন একটা মহাসত্য সেক্‌স্‌পীয়র ধরতে পারেন নি। কর্মময় জগতের বৈচিত্র্য ও জয়পরাজয় নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। মন ও কর্মের সংগ্রাম ও সংহতি, এই তাঁর বিষয় বস্তু। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বল্‌বেন ভাইটাল প্লেন ও মেন্‌টাল্ প্লেন—তা'ই তাঁর আসল সুর। বিজ্ঞানময়, আনন্দময় লোক পর্য্যন্ত সেক্‌স্‌পীয়র পৌছেন নি।

জ্ঞান চৌধুরী এই সত্য বরং মানিতে পারেন। না মানিয়া উপায় নাই; ইহা ভারতবর্ষের ঋষিবাণী। কিন্তু কবি আর ঋষি ত এক নয়। কতকাংশে তাঁহাদের মিল আছে বটে, তবু কবির রাজ্য এই জগৎ ও জীবন; আর ঋষির রাজ্য দিব্যলোক, দিব্য জীবন।

এত পার্থক্য টেনেই বা লাভ কি ?—মনোজ বলিল,—সত্যকে অখণ্ডরূপে পাওয়াটাই হল আসল কথা। কাব্যের মধ্য দিয়ে তার একটা বড় রকমের অনুভূতি লাভ করা যায়, তা ঠিক। অমর হয় ত বলবেন—অনুভূতিটা আসলে রসের, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যেরই, সত্য ও শিবের না হতেও পারে। কিন্তু যা'ই হোক, সে রসানুভূতির, এ কবি-ধর্মের মধ্যে একটা বড় জিনিস নেই—যাকে বলা যায় 'ফিলিং অব দি হোলি'। উপনিষদের

কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু বাইবেলেও যেমন এক একটি বাণী লাভ করি সেক্‌স্‌পীয়রের কোনোখানে কি তার রেশ মিলে ?—

And one cried unto another, and said ; Holy, holy is the Lord of Hosts, the whole earth is full of glory.···

And they rest not day and night, saying Holy, holy. holy, Lord God almighty, which was, and is, and is to come.

জ্ঞান শঙ্কর একটু নীরব রহিলেন। একদিন তিনিও মনে করিতেন—ইহা একটা পরম অনুভূতি। তাই তো দীক্ষা ও গুরু মন্ত্রকে তিনি মূল্যবান্ মনে করেন। কিন্তু এই সব উক্তির পিছনে কি শুচিতার, পবিত্রতার, অতিসচেতন ইন্দ্রিয় সংযমের কষ্টাশ্রিত প্রচেষ্টা নাই ? এই ফিলিং অব দি হোলি, পবিত্রতা-বোধের এক দিকে নাই কি এই বাইবেলের ও আমাদের অনেক শাস্ত্রকারের উক্ত সেই কথাটা—পাপোহং পাপসম্ভবোহং—সেন্‌স্ অর সিন্ ? আর তাহারই প্রতিক্রিয়াতেই ত শুদ্ধং অপাপবিদ্ধংএর জন্য অতিমাত্রার আকুতি। অমর কি মিথ্যা বলে যে, 'শৃঙ্গার শতক' আর 'বৈরাগ্যশতক'—এক বৃন্তেরই দুই ফুল। আর, সে বৃন্তে ফোটে না জীবনের ফুল, ফলে না জীবনের ফল।

জ্ঞান বলিলেন, না মনোজ। এই 'সেন্‌স্ অব হোলি' আর 'সেন্‌স্ অব সিন্' এ দুইটি খ্রীষ্টান ধর্মের মূলতত্ত্ব। আমাদের শাস্ত্রেও তাকে গুরুত্ব যথেষ্ট দিয়েছে। কিন্তু আমরা তাতে আরও গুরুত্ব দিতে শিখেছি একালে ইংরেজি প'ড়ে, বিশেষ করে আবার ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে। আমাদের ঋষিরাও এই 'ফিলিং অব দি হোলিতে' পৌছতেন, কিন্তু এমন পাপের বিভীষিকা তুমি বেদে উপনিষদে তন্ত্রে পুরাণে পাবে না! একটা সুস্থ প্রাণধর্মের মধ্য দিয়ে তাঁরা ধাপে ধাপে গিয়ে পৌছুতেন বিজ্ঞানময়, আনন্দময় সত্তায়।—'সেনস অব সিনের' বাড়াবাড়ি তাতে নেই।

তিনি জানিয়া বুঝিয়াই কথাগুলি বলিলেন। এক দিকে একটা অকারণ অপরাধ-বোধ অন্য দিকে অতিরিক্ত অধ্যাত্মবাদ, খেয়ালে, নানা চিন্তায় মনোজ নিজেকে ক্রমশই পীড়িত করিতে শুরু করিয়াছে। তাই জ্ঞান আবার বলিলেন,—না, মনোজ সাংসারিক মানুষ আমরা, আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা নিয়ে আমাদের জীবন। বৈষ্ণব হই, শাক্ত হই, মোটামুটি সংসার করি। ভালো মন্দে মিলে আমাদের একটা জীবন-যাত্রা গড়ে উঠেছে; সেই ইথস্ তুচ্ছ জিনিস নয়। তাতে মোটামুটি একটা ধর্মবোধ আছে, ন্যায়বোধ আছে, আছে একটা সংযম বা ডিসিপ্লিনও। 'মাদার ইণ্ডিয়ার' লেখিকা হয়ত তা মানবে না, কিন্তু তুমি আমি তো জানি—আমাদের ইতর সাধারণের মনও আসলে ইতর নয়—

বলিতে বলিতে জ্ঞানের মনে পড়িল, বলিলেন,—দেখলাম তো সেদিনও বারাহীপুরের হিন্দু মুসলমান চাষীদের।—একটা সহজ ধর্মবোধ ওদের আছে। মুসলমানরা গোঁড়া মুসলমান; কিন্তু তাই বলে এদেশের সমাজ-সভ্যতার মূল-কথাটা তারাও মানে। আর নমঃশূদ্র, যোগী প্রভৃতিদের ত কথাই নেই। কীর্তন ওদের মধ্যে লেগেই আছে। এই সহজ ভগবদ্-বিশ্বাস, সরলতা, সহনশীলতা,—নিষ্ঠা, ভক্তি,—এ ছাড়া কি চাই আবার সংসারে, Pure religion breathing household laws ?

কথাটা যে মোড় ঘুরিয়াছে তাহাতে মনোজ বাঁচিল। তবু সে বলিল: পিওর নয়, বরং ক্রুড্; শুদ্ধ নয়, স্থূল।

স্থূল বলো কেন? দার্শনিক তত্ত্ব নেই বলে? তাতে হয়েছে কি?

Thou shalt love thy Lord the God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind.

This is the first and great commandment অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস—প্রথম কথা।

And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself.

অর্থাৎ আত্মবৎ মন্যতে জগৎ—শুধু প্রতিবেশী নয়।

On these two commandments hang all the laws and propthets.

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌॥

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রায় এ সত্য যেমন সহজভাবে প্রকাশিত হয় তেমন আর কোথায় হয়? সরল বিশ্বাস, অহিংসা, সহনশীলতা, সাধারণ সংযম—এ যেমন আমাদের 'ছোট জাতের' মধ্যে পাবে তেমন বোধ হয় ভদ্রলোকের মধ্যেও পাবে না। আর আমাদের এই ধর্ম বা জীবন-কলাকেই ভাঙতে লেগেছিল ইউরোপের দৈত্যরা। প্রথম দিকে সাহেবিয়ানার ভূতে পেয়েছিল আমাদের শিক্ষিতদের। এখন সে দানোয় পাচ্ছে অশোকের মত মানুষদের; মদন দাস, মুনিম খাঁর মত অশিক্ষিত 'গণ' তাই দেখা দিচ্ছে।

কথাটার মোড় একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে, আসিয়াছে এমন একটা স্থলে যেখানে মনোজ নিজের কথা, চক্ষু, মনোভাব প্রভৃতিকে উৎকণ্ঠিত ভাবে পাহারা না দিয়াও কথা বলিতে পারে। স্পষ্ট কণ্ঠেই বলিতে পারে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠেও বলিতে পারে। মনোজ স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল:

ওরা কিন্তু ওদের দিক থেকে মিথ্যা বলে না। মদন দাসকে ত আপনিও জানেন। সে বাজে লোক নয়। আর মুনিম খাঁর সঙ্গে আমারও কথা হয়েছিল—লোকটা জাহাজের লস্কর, দেশে-বিদেশে ঘুরেছে, বহু অভিজ্ঞতা আছে। তারপর,—স্পষ্ট কণ্ঠ মনোজের এবার একটু তীক্ষ্ণ হইল:—ওরা চাষ করে, পরিশ্রম করে, জমিদার কি কাজ করে? মালিক কি পয়দা করে? ভাবুন একবার তা হলে ওদের দিকটা।

জ্ঞান শঙ্কর একটু আশ্চর্য হইলেও বলিলেন: কিন্তু এই 'দিকটাই' যে মিথ্যা।

মনোজ মানিবে না। দিকটা মিথ্যা আমাদের কাছে—ওদের কাছে নয়। ওরা পরিশ্রম করে, খেতে পায় না। পুরুষানুক্রমে ওরা খাটে; অন্যেরা তা খায়। ওরা খাজনা জোগায়, ছোট রাজা রেস খেলে। ওরা মরে না খেয়ে, আর রাজার ম্যানেজার মরে অতি খেয়ে। আমরা বলব, 'ওরা সমাজের পা, আমরা মাথা।' সেই পুরনো গল্প—রোমের পেট্রিসিয়ানদের। সেই পুরনো গল্প 'পুরুষসুক্তের'। কিন্তু কে মাথা কে পা আজ এ সমাজে? ছোট রাজা, তার ম্যানেজার আর নায়েব গোমস্তারা মাথা?—যে মাথা গেঁজে উঠেছে বদ্‌খেয়ালে, বেণে বুদ্ধিতে। তার থেকে এই শক্ত, মজবুত, শির-তোলা, লোহার মত কঠিন হাত-পাগুলো কি ভালো নয়?—অন্তত আমাদের থেকে ত ভালোই, আমরা যারা মাথা বিকিয়ে দিয়েছি—ওই সব মূর্খ, গোবরে-ভরা মাথা, আলস্যে-গেজানো জমিদার মহাজন দালাল বেণেদের কাছে।

মৃদু কণ্ঠ কেন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহা মনোজের বুঝিবার সময় নাই—কতখানি সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে তাহার এই বিক্ষোভ, কতখানিই বা আপনার দ্বন্দ্ব-গ্রস্ত জীবনের জন্য এই অস্বস্তি, তাহা সে অন্য মুহূর্তে হয়ত বিশ্লেষণ করিতে পারিত। কিন্তু এ মুহূর্তে সে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল না। পড়িবে কেন? মনোজের ধারণা—একটা নিছক তথ্য ও ঘটনা বিষয়েই সে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিতেছে, ব্যাপারটায় ত সে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কথাগুলির সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিছুই নাই।

জ্ঞান চৌধুরী চমকিত হইলেন—তাকাইয়া রহিলেন মনোজের মুখের দিকে। কেমন একটা উগ্র আহত উত্তেজনা মনোজের চক্ষে—যে মানুষ

সেক্‌স্‌পীয়র লইয়া কথা বলিতেছিল, বাইবেল আওড়াইতেছিল, অধ্যাত্ম তত্ত্ব ছাড়া কোন সত্য মানে না, সে মানুষই যেন নয় মনোজ্ঞ!

ধীরে ধীরে জ্ঞান বলিলেন: আমরা মিথ্যাচার করছি, কিন্তু তাই বলে সমাজ ত মিথ্যা ব্যবস্থা করেনি। আমাদের সমাজ বিধানে বরাবর একটা প্রকাণ্ড ভারসাম্য ছিল—হাতের মগজের পায়ের মুখের। এই ভারসাম্যটাই আসল সাম্য, যেখানে সকলের জন্যই ব্যবস্থা হল 'আস্তেয়'—মা গৃধঃ, কস্যচিদ্ধনম্।

সঙ্গে সঙ্গে মনোজ্ঞ আবার ফিরিয়া গেল আপনার চিন্তায়: আসল কথা এইটাই। কিন্তু অশোক মানবে না, মুনিম খাঁ বুঝবে না। ওরা ভাবে সংসারে বড়রা যখন মিথ্যার বেসাতি খুলেছে, আমরা তখন তা লণ্ডভণ্ড করে দিই না কেন। তবেই সব সত্য হয়ে যাবে। ওরা জড়ের স্তরে আবদ্ধ আছে। এ দিকে অধ্যাত্ম-সাধনায় দিব্য-জন্মের যুগ আসছে!—সেখান থেকে আসবে নতুন মানুষ, মহামানব। আপনি শ্রীঅরবিন্দ পড়লেন ত?

মনোজ্ঞ নূতন আলোক দেখিতে পাইয়াছে শ্রীঅরবিন্দে। আর্থার এভেলিনংএর তন্ত্র ও ব্যাখ্যা তাহার নিকট নূতন ঠেকে নাই। সে শাক্ত পণ্ডিত বংশের ছেলে, জানিত তন্ত্র শুধু মিথ্যাচার নয়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে আরও একটা রুচিকর অধ্যাত্ম পথ না পাইলে সে স্বস্তি বোধ করিত না। সেই জন্যই বাইবেলও তাহাকে মুগ্ধ করিত আর মুগ্ধ করিত উপনিষদ। সেই উপনিষদের বাণী ও তন্ত্রের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিয়াছেন কি শ্রীঅরবিন্দ? সমস্ত ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় সাধন-পদ্ধতির আভ্যন্তরীণ ঐক্যসূত্রই তিনি পুনরাবিষ্কার করিয়াছেন কি? জ্ঞানশঙ্করও বিশ্বাস করেন, পারিলে তিনিই তাহা পারিবেন। অরবিন্দ তাঁহার নিকট এখনো স্বদেশী দিনের গুরু। স্বদেশী আন্দোলন একালের

রাজনীতি নয়, একালের রাজনীতিজ্ঞও নন অরবিন্দ। সেই রাজনীতি ছিল সাধনা, বিদ্বানের ও সাধকের একটা প্রস্থান। তিলক অরবিন্দ ছিলেন উহার নেতা। অন্য দিকেও বিদ্যার বিচক্ষণতার অভাব ছিল না—সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজ শাহ মেটা। সেই স্বদেশীর গুরু অরবিন্দ এখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহৎ ব্রত তাঁহার নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু এই একান্ত সাধনা ও পণ্ডিচেরীতে বসিয়া থাকা, জ্ঞান চৌধুরীদের পরিতৃপ্ত করে না। রাজনীতি হইতে এই ভাবে বিদায় লইয়াই বা কেন তিনি চলিয়া গেলেন? মনোজ বলিবে—আসলে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন নাই; আর এ রাজনীতিও রাজনীতি নয়।

স্ত্রী বিয়োগের পর মনোজ সংসারে আর সুনিশ্চিত আকর্ষণ পায় নাই। এই করণেই কেমন সে বিক্ষুব্ধ,—অমর বলে নিউরোটিক। কিন্তু সে কি বুঝিবে সংসার-ধর্মের? আর, এমন জ্ঞান-স্পৃহা ও চারিত্রিক সততা আর কাহার আছে এই শহরে? তবু মনোজের জিজ্ঞাসা অস্থির, আধ্যাত্মিক পিপাসা অপরিণত। শ্রীঅরবিন্দ তাহার পিপাসু মনকে আকর্ষণ করিতেছে—আকর্ষণ করিবার মতই যে শ্রীঅরবিন্দের বিদ্যা ও সাধনা। তাঁহার গীতার উপর প্রবন্ধাবলী পড়িতে পড়িতে জ্ঞান চৌধুরীরও এই সব মনে পড়িয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়াছে তিলকের গীতারহস্য।

সানন্দ পরিহাসে তিনি মনোজকে তাই বলিলেন: পড়লাম এসেস্ অন দি গীতা। অপূর্ব জিনিস। কিন্তু কি জানো? বাঙালীর গীতা—যোগশাস্ত্র। তুলনা করো তিলকের গীতা—সে হচ্ছে বর্গীর গীতা, কর্মযোগ শাস্ত্র,—ধর্ম রাজ্য স্থাপন করো, যুদ্ধ করো, সমাজ-পালন করো। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য তা' এই ভালো পথ—যতটুকু পারি করি সংসারের কর্তব্য, তারপর করি সমাজের কাজ। নিষ্কাম হলেই ভালো, কারণ নইলে সংসার মনে হবে 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড';

সংসারের কাউকে দিয়ে তোমারও আশা মিটবে না, সমাজেও দশজনে তোমার ক্রটীই ধরবে—কেউ বলবে মুসলমানের খোশামুদে, কেউ বলবে মডারেট—লিবারল্ , কেউ বলবে 'বুর্জোয়া' ; জমিদারের দালাল—

বলিয়া হাসিতে লাগিলেন জ্ঞান চৌধুরী ! মনোজও এবার হাসিল। আবার বলিলেন জ্ঞান চৌধুরী—

We are such stuff
As dreams are made on.

৩

পূজার পরে কাদম্বিনী কাশী যাইবেন, হয়ত জ্ঞান ও হৈমবতীও সঙ্গে থাকিবেন, আর অশোক ত থাকিবেই;—সে না হইলে শান্তার পরিচয় করাইবে কে ? প্রাচীনকালে রাজাদের ভাটেরা হয়ত এমনি কন্যার গুণগান করিত। একালে কাজটা ভাবী দেবরদের উপরই পড়িয়াছে। হয়ত পূজার সময় বা একটু পরে বারাণসীতেই অমর ও শান্তার বিবাহ সুসম্পন্ন হইবে। জ্ঞান চৌধুরীও উপস্থিত থাকিবেন। যতটুকু স্বীকার করিবার ততটুকু তিনি স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন না কেন ? অসামাজিক বটে এই বিবাহ, কিন্তু অন্যায় বা অসংগত ত নয়। বরং অনেক সামাজিক বিবাহের অপেক্ষা ইহাতে ন্যায় ও সততার মর্যাদা বেশিই রক্ষিত হইবে। হাঁ, কাজকর্মের বাধা না থাকিলে জ্ঞান চৌধুরী নিজেও উপস্থিত থাকিবেন বিবাহে ; শান্তাকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু তৎপূর্বে ওলট-পালট ঘটিয়া গেল। পূজার পূর্বেই হঠাৎ খবর আসিল—অশোক রাজদ্রোহ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রচারের অভিযোগে

গ্রেফ্তার হইয়াছে। অবশ্য এবার সঙ্গে সঙ্গে জামিন পাইয়াছে, তাহার বন্ধুরা চেষ্টা করিয়া সে ব্যবস্থা করিয়াছে। তাই হৈমবতী তত অস্থির হইলেন না। অশোক বাড়িতে চলিয়া আসুক, তাহা হইলেই হৈম এখন নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী বুঝিলেন এবার অশোকের রাজদণ্ড অনিবার্য্য। তাঁহার ত জানাই ছিল যে, পরাধীন দেশে কেহ জর্ণ্যালিষ্ট হইতে পারে না; রাজরোষে তাহাকে পড়িতেই হইবে। কিন্তু হৈমবতীর নিকট হইতে কথাটা যতদূর সম্ভব গোপন রাখিতে হইবে, দুর্ভাবনা নিজের মনেই জ্ঞানশঙ্করকে বহন করিতে হইবে। আইনের পরামর্শ তবু চাই। শরৎ এখন আর এই সব আলোচনায় থাকিতে চাহেন না। তাঁহার বয়স হইয়াছে, আর অশোকের সম্বন্ধে কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? অশোক অরুণ কেহই তাহাদের পিতার বা পিতৃবন্ধুদের কথা শোনে না কোনো কালে। কুমুদ এখন যতটুকু সময় পায় সন্ধ্যায় বারাহীপুরের ম্যানেজারের কুঠিতেই আড্ডা দেয়, ব্রিজ খেলে। মনোজকে, বিজয়কে তাহার ভালো লাগে না; তাই জ্ঞানবাবুর বৈঠকখানায় সে আর সন্ধ্যায় এখন আসে না। নিজেই সে এখন যথেষ্ট সিনিয়র উকিল। জ্ঞানের পরামর্শ আলোচনার প্রধান সঙ্গী এখন তাই বিজয়, মনোজ। কিন্তু আইনের গোলমালের তাহারাই বা জানে কি? বিজয় ও মনোজের সঙ্গে তিনি অন্য কথা বলেন—কি করা যায় অশোকের পত্রিকার ব্যবস্থা? জ্ঞানশঙ্কর নিজেই তারপর আইনের বই খুলিয়া বসেন, আর অশোকের লেখা সেই আপত্তিকর প্রবন্ধগুলি পুনঃপুনঃ পড়িতে থাকেন।

'সাইমন, ফিরিয়া যাও,'—সেই সাইমনকে কলিকাতা আগমনের দিনে অশোকেরা নাকি কৃষ্ণ-পতাকা আর মজুর মিছিল লইয়া বিলক্ষণ-ভাবে অপদস্থ করিয়াছে;—জানাইয়াছে বিজয়। আর একটি প্রবন্ধ

'শাসনের স্বরূপ' :—আর এক দফা 'সংস্কারের' আশায় বুক বাঁধিয়াছিল দেশের নেতারা, কিন্তু কমিশনে ঠাঁই না পাইয়া বুক চাপড়াইতেছে তাহারা। তাহাতে জনগনের কি যায় আসে ? অশোক বুঝাইতে চাহে—'সংস্কার' জিনিসটাই একটা চক্রান্ত। শোষিত মানুষ মাথা খাড়া করিয়া যখন দাঁড়াইতে চাহে, শোষণার্থে প্রতিষ্ঠিত শাসন আপন শোষণকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই তখন শাসনযন্ত্রের এক-আধটুকু পরিবর্তন করিয়া লয়—শোষণ তাহাতে পাকা হয়। জনশক্তির বিরুদ্ধে ইহাও শাসক-যন্ত্রীদের একটা ছলনা। ভারতবর্ষের সত্যকার মুক্তি যাহারা চায় তাহারা লক্ষ্য রাখিবে—এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে। "শ্রমিক ভারত, কিসান ভারত, যুবক ভারত—বিপ্লবী ভারত—বুঝিয়া রাখো—সাগর পার হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া স্বাধীনতা আসিবে না। মুক্তি ফুটিবে দেশের জনশক্তির জাগরণে দেশের শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামে, পৃথিবীব শোষিত-শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে।"

প্রত্যেকটি পংক্তি জ্ঞান বিচার করিয়া পড়েন—আবার সমুদায় প্রবন্ধটাও সমগ্রভাবে বিচার করেন—বিশেষ একটা কথা বা বাক্যের অর্থ ধরিয়াও বিচার করা আইন সংগত নয়, এই মর্মের উক্তি বহু রায়ে রহিয়াছে। পেনাল কোড হইতে আবার ১২৪ ক ধারা পড়েন, তাহার উপর নানা বিচার ব্যাখা দেখেন। ১৮৯৬এর 'সম্রাট বনাম তিলক' এখন আর গ্রাহ্য নয়। কী কাণ্ডই করিয়াছিল তখন শাদা চামড়ার বিচারক!—গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 'ডিসএফেক্‌শান্'এর অর্থ,—গবর্ণমেণ্টের জন্য 'এফেক্‌সানের অভাব।' ইংরেজ হইয়াও ইংরেজি কথার এমন কদর্থ কি করিয়া করিয়াছিল সেই জজ ? না, সত্য কথাই বলে অশোক—'আইন ও আইনের ব্যাখ্যান জজেরা করে শাসকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।' বিচার কি তবে প্রহসন ? না, জ্ঞান চৌধুরী তাহা বলিবেন

না। ব্রিটিশ আইন এই সত্য স্বীকার করে—আইনের চক্ষে ছোট বড় নাই। কিন্তু আবার তিনি মানেন—রাজদ্রোহের বিচার ত প্রহসনই, বিশেষত রাজা যেখানে বিদেশী, আর প্রজা চাহে স্বরাজ।—ভারতবর্ষে তাই রাজদ্রোহের বিচার প্রহসন ছাড়া আর কি? কিন্তু অশোকই বা কি? শুধু স্বরাজ নয়, অশোক একেবারে 'স্বাধীনতা' চায়! 'আর বিপ্লবী ভারত' কথাটাও বড়ই রাজদ্রোহাত্মক। আর 'সংগ্রাম'—ট্রি জন্!

প্রবন্ধগুলি দেখিয়া জ্ঞান হতাশ হন—অশোকের কি একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, কলমে যাহা আসে লিখিবে? কলমে ধার আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে,—ইহাই কি যথেষ্ট? পূর্বাপর ভাবিতে হইবে না? জ্ঞান চৌধুরী আবার নানা মামলা দেখিতে বসেন, অশোককে আসিতে লেখেন, বুঝিতে চাহেন অবস্থা কিরূপ। লেখেন—আসিবার পূর্বে যেন মামলার কাগজপত্র সে দিয়া আসে মিষ্টার সত্য চৌধুরীকে। তাহাকে জ্ঞান মামলা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লিখিতেছে। শুনিয়া হৈমবতী আশ্বস্ত বোধ করেন। ব্যারিষ্টার মামলা চালাইবে,—সত্য চৌধুরী চালাইবে, যে এতটা আপনার লোক,—তাহা হইলে বিপদ নাই। কিন্তু অশোক চলিয়া আসুক এখানে।

দিন পনের পরে মামলার প্রথম দিন অশোক তাই আসিল না। এদিকে সত্য চৌধুরীও পত্রের উত্তর দিল—অশোক দেখা করিয়া গিয়াছে। এখন লম্বা রকমের একটা তারিখ লইবে সত্য, একেবারে পূজার পরে মামলা হইবে। ততদিনে সেও প্রস্তুত হইতে পারিবে। মামলার জন্য জ্ঞান চৌধুরীর ভাবনার কারণ নাই—'এই মামলাকে আমি নিজের ছাড়া অন্যের বলে ত ভাবতে পারি না। একে ত রাজদ্রোহের মামলা—অবশ্য তার সঙ্গে শ্রেণী-সংঘর্ষের অভিযোগও আছে; তার উপরে অশোকের লেখা—আর লেখাটা আপনি পড়েছেন? চমৎকার

লেখা। আমার গর্ববোধ হল—পড়ে শোনালাম বারের বন্ধুদের,—চৌধুরী গোষ্ঠীর রক্ত যাবে কোথায়? তার ছত্রে-ছত্রে চৌধুরী তেজের প্রমাণ।' তার পর আবার অন্য কথাঃ—ছেলে বিনু বিলাত চলিয়া গিয়াছে, মেয়ে মিলি বাগ্‌দত্তা, ভাবী জামাই রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টার, কিছুকাল পরে বিবাহ হইবে, ইত্যাদি। শেষে আর একদফা আশ্বাস—কিছু ভাবনা নাই মামলার জন্য।

হৈম বলিলঃ তা হলে ভয় নেই। নিজে ব্যারিষ্টার মানুষ; না বুঝে কি আর তিনি লিখেছেন! কি বলো?

জ্ঞান চৌধুরী তাঁহাকে নিরাশ করিতে চাহিলেন না, বলিলেন, তা বৈ কি। কাগজ-পত্র পড়েছে।

আবার কিছুক্ষণ পরে হৈম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ মামলা তা হলে কবে হবে?

এ তারিখে হবে না। হয়ত পুজোর পরে উঠ্‌বে।

তা হলে আমাদের এখন সেখানে যাবার দরকার নেই?—

জ্ঞান বুঝিলেন—অশোক আসিতেছে না, আশঙ্কায় হৈম নিজেই কলিকাতা যাইবার কথা মনে মনে চিন্তা করিয়াছিল। জ্ঞান বলিলেনঃ না, এখন বরং অশোক এ তারিখের পরে আসুক। তারপর যখন মামলা উঠবে যেতে হয় যাবে—

তুমি যাবে না?—একটা ব্যাকুলতা ও মিনতি হৈম'র প্রশ্নে।

আমি? কাজ-কর্ম না থাকলে—দেখা যাবে তখন।

না, তোমার থাকতে হবে মোকদ্দমার সময়ে।

হৈমবতী শুনিবেন না। হাজার হউক্ অশোকের মামলা।

ফিরিয়া আসিয়া হৈম বলিলেনঃ মামলাটা এখানে হলেই ত ভালো হয়।

জ্ঞান চৌধুরী উত্তর দিলেন না। হৈম বলিল: কেন তা হয় না?

না, ওখানে কাগজ ছাপা হয়, ওখানেই মামলা হবে।

হৈম যুক্তি দেখাইলেন: অশোক যদি বলে সে মধুখালির মানুষ, তুমি যদি বলো—তুমি ওর কাগজের জন্য টাকা দাও—

জ্ঞান হাসিলেন, বলিলেন, তাতেও হয় না।

হৈম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কাগজ-পত্র দেখেছ তো?

দেখেছি।

কি মনে হয়?

ভালোই—মিথ্যা করিয়াই জ্ঞান বলিলেন। কিন্তু হৈমবতী তত আশ্বস্ত বোধ করিলেন না। অবশ্য সত্যও লিখিয়াছে—ভাবনা নাই; বিজয় বলে—ভয় নাই। মনোজও বলে,—কিছু হইবে না। কিন্তু কই, জ্ঞান চৌধুরী ত তেমন জোর করিয়া কিছু বলিলেন না! আর জ্ঞান অপেক্ষা উহারা আইনের বেশি জানে নাকি?

মাসখানেক পরে অশোক আসিল। তাহার পরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রের কি ব্যবস্থা হইবে, মামলায় অবস্থাই বা কি, তাহা জানিবার জন্য জ্ঞানশঙ্কর ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অশোক সে আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই গ্রামে বাহির হইয়া গেল। বিজয় শুনিল—সম্ভবত শুয়োচকের দিকেই গিয়াছে।

মুনিম খাঁ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, অশোককে বলিল:—তোমার ত এখানে আসবার কোনো দরকার ছিল না। এলে কেন?

অশোক বুঝাইয়া বলিতে গেল:—তোমরা আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছ। কেন নালিশ করেছ, তা জানতে হবে না?

তা ত সেই রিপোর্টেই আছে। তাতেই বলেছি—এখানে তোমার আসা চলবে না। তারপরেও কেন এলে ?

অশোক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল! এমন ভাবে কেহ তাহাকে এই মধুখালিতে প্রশ্ন করিতে পারে, ইহা যেন সে ভাবিতে পারে নাই। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল: এই কৃষকদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, এদের সংগ্রামে যোগ দিয়েছি—

মুনিম খাঁ কথা শেষ করিতে দিল না। বলিল: বস্, থামো, যথেষ্ট হয়েছে। তোমরা জমিদার ম্যানেজার উকিলের ছেলেরা এদেরকে 'সংগঠন' 'সংগ্রাম' শেখাতে এসো না।

অশোক বিমূঢ় হইয়া গেল। নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল: খাঁ, তুমি বাড়ি এসেছ ছ'মাসও হয়নি। জাহাজে জাহাজে ঘুরেছ, এদের তুমি কতটুকু চেনো? তার চেয়ে অনেক বেশি চিনি আমি—সেই নন-কো-অপারেশনের দিন থেকে কাজ করেছি এখানে।

হাঁ, কংগ্রেসের দালালি করেছ। আর তাতেই তোমার বাবা, তোমার বন্ধুরা মিলে কৃষকদের প্রতি দাগাবাজি করতে পারল।

দাগাবাজি!—অশোক এবার বিক্ষুব্ধ হইল।—খাঁ, কার সম্বন্ধে কথা বলছ জানো?

জানি দুশমনের সম্বন্ধে। শ্রেণী-শত্রুর সম্বন্ধে।

অশোক কি বলিবে ভাবিয়া পাই না। কোথা দিয়া একটা তীব্র অপমান তাহাকে দগ্ধ করিতেছে—যেন এই মুহূর্তে মুনিম খাঁর উপর ঝাঁপাইয়া না পড়িলে তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে ধিক্কার দিবে,—কাপুরুষ! কাপুরুষ তুমি অশোক! কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার বুদ্ধি ও মতবাদ আবার সায় দিয়া বলিতেছে—'শ্রেণীশত্রু!' হাঁ, সত্য কথা। সত্য কথা—ইহাও অশোক।—অশোক আত্মসম্বরণ করিয়া এই বিচার সম্পূর্ণ

করিতে চাহে। তাই সে আত্মবিচার শেষ করিতে চাহিল, শেষ করিতে পারিল না। শেষে বলিল : আমিও এসেছি বুঝতে—কলকাতা থেকেই পাঠিয়েছে আমাকে,—প্রজারা কৃষকেরা কি বলে ?

কি আবার বলবে ?—বলে, রাজা ও ম্যানেজার বাঁচিয়েছে তাদের—যেমন তোমরা বাবুরা শিখিয়েছে ! কিন্তু যাও এবার কলকাতার বাবুদের বলো,—তোমরা বাবুদের ছেলেরা সরে পড়ো—মজদুরের পার্টি তোমাদের জন্য নয়।

'মজদুর নেতা' ছাড়া 'বাবু নেতার' নির্দেশ মুনিম খাঁ মানিবে না।

অশোক শহরে ফিরিয়া আসিল। 'দুশমন' ও 'দাগাবাজ'—ইহাই কি তাহার পিতা, তাহার জীবন-দৃষ্টির প্রথম পরিচায়ক ও বিজয় দা,'—তাহার স্বদেশীর পথ প্রদর্শক তাহার চক্ষে ?

বিজয় কি বলিতেই অশোক ক্ষেপিয়া উঠিল : তোমরা 'বাঁচিয়েছ' প্রজাদের ? বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তোমরা তাদের প্রতি। নইলে কি হত ? জেলে যেত, কষ্ট পেত ? তা কি এখনো পাচ্ছে না ? কিন্তু ওরা মাথা তুলে লড়াই করতে শিখছিল,—তা তোমরা চাপা দিয়েছ।

সেই মদন দাসটা বলেছে বুঝি ? কিন্তু রাজাদের পাঠশালার বৃত্তিটা বেশ নিচ্ছে ত ?

নেবে না কেন ? সেটা কি ঘুষ ? সে তো প্রজাদেরই টাকা। প্রজারা জোর করে ছিনিয়ে নিতে যাতে পারে তারই বরং চেষ্টা করুক।

বিজয় জানে অশোকের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। না হইলে এমন ভাবে তাহারা তখন অশোকদের মুখরক্ষা করিল, আর অশোক কি না বলে—তাহারাই বিশ্বাসঘাতক !

কাগজের কথা, মামলার কথাও জ্ঞানশঙ্করের সহিত অশোক বেশি আলোচনা করিতে চাহে না। মামলায় যাহা হয় দেখা যাইবে। বিচার

ত আসলে চিরদিনই প্রহসন। অশোক যেন কিসের জন্য চিন্তাগ্রস্ত। জ্ঞান বলেন, তোমার যে শাস্তিই হবে তা মনে করছ কেন?

অশোক বলিল: ধরে নিই হবে, না হলে ত ক্ষতি নেই। জ্ঞান চৌধুরী আইনের যুক্তি দেখাইয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু অশোক বুঝি শুনিতেছে না? জ্ঞান কেমন চিন্তিত দৃষ্টিতে অশোকের মুখে তাকাইয়া রহিলেন। হঠাৎ অশোকের তাহা চক্ষে পড়িল। এবার সে হাসিয়া বলিল; লেখা দু'টি আমার। আমি কি আর জানি না—আমি কি প্রচার করতে চেয়েছি?—তা রাজদ্রোহই।

না, অশোক মুক্তির আশা করে না। কিন্তু এত নিস্তব্ধ কেন সে? দণ্ডের সম্ভাবনা নয়। এইবার তাহাকে এত ভাবাইতেছে তবে কি কাগজে? কিন্তু উহার জন্যও অশোক পিতার সাহায্য গ্রহণ করিবে না? জ্ঞানশঙ্কর আহত হন। আবার, ব্যথিত হন—সেই অশোকের মুখের হাসি এবার গেল কোথায়?

হৈমবতী বলিলেন: কাগজ না চললে তুমি টাকা নাওনা কেন—আমি দোব।

অশোক বলিল: আমার টিউশনি আছে তা দিয়েই ওসব খরচ চলে যায়।

টিউশনি?—তাতে দরকার কি তোমার?

হাসিল এবার অশোক:—আমার দরকার টাকা,—আর যাকে পড়াই তার দরকার পাশ করা।

হৈমবতী বলিল,—কাকে পড়াও?

তুমি চিনবে না। সে ছাত্রী।

কে সেই ছাত্রী? কিন্তু হৈমবতী নীরবে অপেক্ষা করিলেন—অশোক

কি বলিবে না সে পড়ায় কাহাকে? কে সে? অশোক বলিল না। সে তবে কি গোপন করিল কথাটা? কেন?—

অশোক চলিয়া গেল। সাপ্তাহিক কাগজ, তাহা প্রকাশ করিতে হইবে যে।

পিতামাতা, ভগ্নী, বন্ধু;—'দুশমন্,' 'শ্রেণীশত্রু':—ইতিহাস-ব্যাপী শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে কে কোথায়, সে নিজেই বা কোথায়, অশোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

অশোকের মামলা আরম্ভ হইল বড় দিনের শেষে—একেবারে জানুয়ারী মাসে। বড় দিনেই জ্ঞান চৌধুরী ও হৈমবতী কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন—শান্তা অমরও দুই চারি দিন পরে দেখা করিতে আসিবে। অশোকেরই হোটেলের ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছে; অশোক সেখানে বাবা মাকে লইয়া গেল।

হৈমবতী বলিলেন: তা হয় নাকি? আগে মায়ের বাড়ি যাব কালীঘাটে। হৈমবতী আহার করিতে চাহিলেন না, অশোক পীড়াপীড়ি করিলে কি হইবে—ব্রাহ্মণে রেঁধেছে গঙ্গাজলে, গঙ্গাতীরে?

হৈমবতী কলিকাতায় আসিয়াছেন। তীর্থস্থানে আসিয়া দেবতা দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করা চলে না। পথেও তিনি সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইয়াছেন। স্নান করিয়া এখন প্রথম গরদ পরিয়া পূজা করিতে বসিলেন। কিন্তু কিছু খাইতে তিনি পারিবেন না—কাল কালীঘাটে পূজা দিবার পূর্বে কি করিয়া আহার করিবেন?

তোমরা ত মানো না। আর না মেনে দেখছ ত, ভালোও হয় না।—তিনি অশোককে বলেন।

অশোক বুঝায়ঃ তুমি তো মানো—কালী মানো, ঘেঁটু মানো, ওলা মানো, শীতলা মানো। তুমি যখন এত মানো তখন তোমার মানাতেও কি আমি পার পাব না? ম্যাজিস্ট্রেট লোকটারও সুবুদ্ধি হবে না?—বলবে না, 'ঠিকই হয়েছে। লেখা ছুটোয় মিথ্যা কথা বলেনি অশোক চৌধুরী। অতএব মা কালীর নির্দেশ মত আমি অশোক চৌধুরীকে মুক্তি দিলাম।' না, আমাকে মশানে চড়িয়ে একবার স্তব করিয়ে নিতে হবে চণ্ডামায়ের? তা হলে আর তুমি কি করবে উপবাস করে?

সে-ই অশোক! আবার পূর্ব্বের মত হাস্য কৌতুক করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হৈম আশ্বস্ত বোধ করিলেন, কিন্তু হৈমবতী রাগও করিলেন। এখনো অশোকের পরিহাস কমিল না। জ্ঞান চৌধুরী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হইলেন। অশোক পৃথিবীর বিচারেই সব কিছু দেখে। না হইলে হৈমর এই সরল ভক্তিটুকু তাহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না কি?

অনেক পীড়াপীড়িতে হৈমবতী ডাবের জল ও ফলমূল গ্রহণ করিলেন। জ্ঞান নিজে অবশ্য আহার করিলেন—পথেও তিনি চা-টোষ্ট খাইয়াছেন; নিতান্তই এখন আর পথে প্রবাসে বাবুর্চির খানা খাইতে রুচি হয় না। না হইলে আহারে পানীয়ে অত বাছ-বিচার তিনি কোনো দিনই ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিতেন না, এখনো করেন না। তবে বয়স হইয়াছে। আর এখন কেমন রুচি হয় না বাবুর্চি খানসামার রান্নায়। উহারা অপরিচ্ছন্নও।

তবু সকালে উঠিয়া জ্ঞান চৌধুরী চলিলেন হৈমবতীর সঙ্গে কালীঘাটে। হৈম যখন পুজা দিবেন তখন স্বামী হইয়া তিনি সঙ্গে না থাকিলে ঠিক হইবে না। একবারে আদিগঙ্গায় স্নান করিয়া সন্ধ্যাপুজা শেষ করিয়াই তিনিও এক সঙ্গে বাড়ি ফিরিবেন।

অশোক অবাক হইল বুঝি?—দীক্ষা লইয়াছেন বাবা, ইহাই তাহার নিকট একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তারপরে এ কি কাণ্ড! বাবা চলিলেন একেবারে আদিগঙ্গায় গঙ্গাস্নানে আর কালীঘাটে পূজা দিতে! জ্ঞানশঙ্কর হাসিলেন—অশোকের এখনো অবাক হইবার বয়স আছে, অবাক্ হইবে। কিন্তু তিনি ত জানেন ইহাই স্বাভাবিক।

ট্যাক্‌সি। সেদিনের গাড়ী নয়, ঘোড়ার ট্রাম নয়,—মোটর।—ভাড়াও কি কম? পাঁচ টাকা। কি বলে উহারা?—কলিকাতায় জীবন-যাত্রা এই জন্যই এত ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। শুধু কি তাহাই? কত মানুষ, কত গাড়ী, কত পরিবর্ত্তন। আর একি, উড়িয়া চলিয়াছে গাড়ী। জ্ঞান চৌধুরী ভীত ভাবে বলেন, ওকে আস্তে চালাতে বলো, অশোক।

অশোক বলিলঃ ও ঠিক যাবে। ওরা জানে।—তবু একবার ড্রাইভারকে সে কি বলিল। মাথা নাড়িয়া ড্রাইভার জানাইল—ঠিক! তারপর হাতের চাকাটা আরও ঘুরাইয়া পূর্ব্বের মতই আপনার খুশিতে সে চালাইতে লাগিল। জ্ঞান চৌধুরী ভীত হইয়া উঠিতেছেন,—হৈম সঙ্গে; শেষটা কাটা-ছেঁড়া হইয়া হাঁসপাতালে মরিতে হইবে নাকি তাঁহাদের?

কলিকাতার এমন গতিমত্ত-রূপ জ্ঞানশঙ্কর পূর্ব্বে দেখেন নাই। তাঁহাদের কালেও কলিকাতা ছিল চলন্ত। কিন্তু পৃথিবীর চারি দিকেই যে একটা উদ্দাম ঘূর্ণী বাতাস উঠিয়াছে, তাহা যেন এক মুহূর্ত্তেই এই শহরে বুঝা যায়। কলিকাতাতে ঘূর্ণী লাগিয়াছে।

কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলায় পূজার ফুলের মালা, হাতে নৈবেদ্য ও প্রসাদ লইয়া জ্ঞানশঙ্কর ও হৈমবতী ফিরিয়া দেখিলেন অমিতা-

ইন্দিরা বসিয়া আছে। অরুণ পরীক্ষা নিকটে বলিয়া অতক্ষণ দেরী করিতে পারে নাই। কিন্তু বাবা মায়ের চেহারা দেখিয়া অমি' হাসিয়া খুন। একটু লজ্জাই বোধ করিল—ভাগ্যিস্, এই অবস্থায় স্কুলের বন্ধুরা কেহ তাহার পিতামাতাকে দেখিয়া ফেলে নাই। অমিতা লইয়া আসিতে চাহিয়াছিল তাহার বন্ধু সুপ্রভাকে। টানাটানি করিয়াছিল, প্রায় অভিমান করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেছিল—সুপ্রভা আসিল না বলিয়া। কিন্তু এখন অমি'র মনে হইল—সুপ্রভা আসিলে কি লজ্জার কথাই না হইত।

পরীক্ষা নয় ;—বড়দিনের উৎসব শেষ হয় নাই, অরুণের তাই অনেক কাজ। টেনিস টুর্ণামেণ্টের ফাইনাল আছে। তাহা ছাড়া—সিনেমা থিয়েটারের প্রোগ্রামগুলিও কম নয়। অমিতা ইন্দিরা কি কি থিয়েটার না দেখিলেই নয়, এবং কি কি ফিলম দেখিতেই হইবে, হৈমবতীকে তাহা বুঝাইতে ব্যস্ত। হৈম বলিলেন: আমি কি থিয়েটার দেখতে কলকাতায় এসেছি নাকি ?

অমিতা বলিল: তবে তুমি কি করতে এসেছ ?

হৈম রাগ করেন।—শোনো কথা। অশোকের নামে মামলা—

তাতে তুমি উকিল না ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট্ না মক্কেল ?—তোমার কি এত যে তা নিয়ে কথা ? ওসব তো বাবা বুঝবেন, দাদা দেখবেন।

অমিতা চিরদিনের মতই অবুঝ। মায়ের সাধ্য কি তাহার সহিত পারিবেন। জ্ঞানশঙ্কর দেখিয়া আমোদ বোধ করেন—এই অমিতাই আবার কেমন করিয়া সেবায় শাসনে তাহার পিতাকে একেবারে আগলাইয়া রাখে ; কেমন কৌতুহলে শোনে তাঁহার মুখে সেক্স্পীয়র পাঠ ; আর কেমন করিয়া আবার তাহার মাকে এখন ধরিয়া বসিয়াছে —কলিকাতায় আসিয়াছে হৈমবতী—থিয়েটর দেখিবেন না, ফিল্ম্ দেখিবেন না, যাদুঘর দেখিবেন না, চিড়িয়াখানা দেখিবেন না ?—কেবল

কি কালীঘাটেই পূজা দিবেন, আর গঙ্গা-স্নান করিবেন ? জ্ঞানও ভাবেন, সত্য কথাই ত বলে অমি'। হৈম'তো জীবনেও এই সব দেখেন নাই—তবে দেখেন নাই বলিয়া তিনি কোনো অংশে ক্ষুদ্র হইয়া যান নাই,—এই কথা অমি' এখনো বুঝিবে না, তাহাও জানেন জ্ঞান। কিন্তু দেখিবার সুযোগ যখন পাওয়া যাইতেছে তখন দেখিবেন না কেন ? জ্ঞানশঙ্কর নিজেও দেখিতে পারেন, দেখিয়া যাইবেন 'সীতা' 'কর্ণার্জুন' 'ষোড়শী,' দেখিবেন দুই একটা বায়স্কোপ—এই সময়ে নাকি ভালো ছবি থাকে। অমর আসুক,—সে এই সব ভালো জানে। জ্ঞানের উৎসাহ নাই, ঔৎসুক্যও মন্দীভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও সময় থাকিলে তিনি বুঝিতে চাহেন কিসে অমিতা অরুণ এত আনন্দ লাভ করে।

সত্যের সঙ্গে মামলার পরামর্শটা প্রথমেই করা প্রয়োজন। কিন্তু মামলার পরামর্শ কি সহজে হয় ? সত্য চৌধুরী ডাকিয়া আনে তাহার স্ত্রীকে। তাই ত সেই তন্বী বধূও এখন প্রায় প্রৌঢ়া ! সুশ্রী মুখ এখন আর তেমন উজ্জ্বল নাই, চুলও পাকিতেছে। মুখের হাসিতেও তেমন মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে না ; অথচ সত্যই মধুর হাস্যে সে অনুযোগ দিতেছে—তাঁহাদের গৃহে উঠিলেন না কেন জ্ঞান চৌধুরী ? কেন হৈমবতী শুদ্ধ এই বাড়িতে চলিয়া আসেন না ?— সত্য অন্য কোনো কথাই শুনিবে না। হৈমবতী ব্রাহ্মণের রান্না ছাড়া খাইবেন না ? বেশ ত, সত্যর আপন শাশুড়ী এ গৃহে রহিয়াছেন। তিনিও এখন নিরামিষ ছাড়াই খান না—গোপালের ভোগ না দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন না ; একেবারে আলাদা তাঁহার ব্যবস্থা। সত্যর ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত ছুঁইলে তিনি স্নান করেন।

জ্ঞান চৌধুরী শুনিয়া বিস্মিত হন। এক কালের কঠিন ব্রাহ্ম ছিলেন সত্যর শ্বশুর। শুধু পৈতাই ছিঁড়েন নাই, মুর্গী না খাইলেই

মনে করিতেন কুসংস্কার জমিয়া যাইতেছে। সেদিনে তাহার স্ত্রীও ছিলেন তেমনি উৎসাহিনী। আর আজ?—সেই আনন্দ মুখুজ্জের স্ত্রী শুধু নিরামিষই খান না, আপন দৌহিত্রদের স্পর্শেও তাঁহার আপত্তি। হাসি পাইবার মত কথাই। সম্ভবত ব্রাহ্মণের কন্যাও তিনি ছিলেন না, হয়ত বা ছিলেন বিধবাও—সেদিনে আনন্দ মুখুজ্জের মত সংস্কার-পাগল মানুষেরা যে কোনো বিষয়ে সমাজ-সংস্কার না করিতে পারিলে কিছুতেই স্বস্তি পাইতেন না। বিবাহটা তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ অপেক্ষাও ছিল সমাজসংস্কারের কার্যক্রমের একটা বিষয়। আর এখন সেই আনন্দ মুখুজ্জের স্ত্রী গোপালের ভোগ না দিয়া প্রসাদও গ্রহণ করেন না। জ্ঞানশঙ্কর হাসিতেছিলেন, সত্যও হাসিতেছিল। জ্ঞান বলিলেন: না, সত্য, অত ভয় নেই—মানুষের ছোঁয়ায় ওঁর আপত্তি নেই। মাছ মাংস খেতেও আপত্তি নেই; তবে মাংস ওঁরা খান না কোনোদিন।

বাঃ! তবে ত আরও ভালো কথা। নিয়ে আসুন! একবার অন্তত কাকীমার থেকে শিখে নিক এরা ইলিশ মাছ ভাতে আর পাতুড়িটা। আমরাও মুখটা বদলাই—

সঙ্গে সঙ্গে সত্য চৌধুরী গল্প জুড়িয়া দিল কেমন সে খাইয়াছে হৈমর রান্না মধুখালিতে। তবু নাকি মাছের আসল স্বাদ পাইতে হইলে যাইতে' হয় চিত্রিসারে। অবশ্য দিন কাল পরিবর্তিত হইতেছে। সেই দুধ-ঘি আর সেখানে পাওয়া যায় না; মানুষের মতিগতি পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু পদ্মার মাছ ত পরিবর্তিত হয় নাই; আর পরিবর্তিত হয় নাই সেখানকার মেয়েদের হাতের রান্না!

সত্য থামিতে চাহে না—যেন রাজীব চৌধুরী কথা বলিতেছেন।

মানুষই কি পরিবর্তিত হইয়াছে?—জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী একবারের মত নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন। কোথায়, রাজীব চৌধুরী পরিবর্তিত

হইয়াছিলেন কি চিত্রিসারের গৃহ ছাড়িবার পরে? পরিবর্তিত হইয়াছে কি সত্য চৌধুরী—চিত্রিসারের চৌধুরী ভদ্রাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো পরিচয়ই যাহার বিশেষ ঘটে নাই? সেই চৌধুরী গোষ্ঠীর এই প্রতিনিধির মধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছে চৌধুরীদের কোন্ প্রকৃতি, রীতি, প্রবৃত্তি, ধর্ম, ঐতিহ্য? তাহা হইলেও অমর বিবাহ করিয়াছে শান্তাকে; আর অশোক হইয়াছে বলসেভিক;— কিন্তু তাহাতে কি হইবে?

সত্য জিজ্ঞাসা করিল, অমর আস্‌বে নাকি শান্তাকে নিয়ে? খৃষ্টান ধর্মটা ভালোই, কিন্তু এই ইউরোপের লোকেরা খ্রীষ্টের ধর্মের নামে আমাদের উপর চাপায় গোলামি। নইলে কোনো ধর্মই কি মন্দ?

জ্ঞান চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন: অশোককে বোঝাও।

কেন? ওঃ, ওরা বিশ্বাস করে না নাকি ধর্মে?

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন: সেই পুরনো গল্প। পিতামহ ত্রিশ কোটী দেবতা কেটে একটিতে এনে ঠেকিয়েছিলেন। পৌত্র সেই একটিকেও নাকচ করেছে। তোমরা একটিতে ঠেকে গিয়েছ; অশোকের সে বালাইও নেই।

সত্য হাসিয়া বলিল: ঠিক নাকি অশোক? দুর, তা কি হয়? ভগবান নেই, এ একটা কথা হল?

তর্কের সুর নাই, ঝাঁঝ নাই, শুধু একটা সরল, অনাড়ম্বর বিশ্বাস।— অথচ মিষ্টার চৌধুরী বিলাত ফেরতা ব্যারিষ্টার। জ্ঞানশঙ্কর বিমুগ্ধ হইলেন তাহার কথার ধরণে। অশোক তখন হাসিতেছে। বলিল; ভগবান থাক্‌া চাই-ই, না? নেশা না হলে মানুষ বাঁচে না?

সত্য বলিল: তার মানে?

অশোক বলিল: ওই একই কথা। নেপোলিয়নও নাকি বল্‌তেন

সাধারণ মানুষের কথা,—'ওদের রুটি নেই, ঘর নেই, কিছু নেই। থাকে কি নিয়ে? আমরা ওদের দিয়েছি ভগবান।' ধর্ম এই আফিম—মানুষ ভুলে থাকতে পারে তা নিয়ে।

সত্য কিছুতেই ইহা মানিবে না। অশোক তর্ক করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্যের তর্কের ধারা স্বতন্ত্র: সায়েন্‌স,—ফিলজফি দিয়ে কি হবে? বুঝছি ভগবান আছেন, না থেকে পারেন না,—এর থেকে আবার বড় প্রমাণ কি? দেখছি বেঁচে আছি; এখন বায়োলজি পড়ে বুঝতে হবে নাকি সত্য-সত্যই বেঁচে আছি, না, মরেছি?

জ্ঞানের দুই চক্ষে খুশী ফুটিয়া উঠিল। চমৎকার! সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নোত্তর কোনো কিছু নাই। এমনি সহজ, এমন অকুণ্ঠিত চিত্তে এই সত্য বলিতেন বিভূতিশঙ্কর, বলিতেন রাজীব চৌধুরী,—আর বলিতেছে এখনো সত্য চৌধুরী।

আহার না করিয়া জ্ঞান ও অশোক ফিরিতে পারিলেন না। হৈমকে শুদ্ধ শীঘ্রই আসিবার প্রতিশ্রুতিও দিতে হইল; অমর শান্তাকেও লইয়া আসিবেন। কিন্তু একদিন তার পূর্বেই মামলার আলোচনাও করিতে হয়।

মামলার আলোচনায় কিন্তু আর সেই সত্য চৌধুরী স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে পারে না। পদে পদে অশোকই তাহাকে বাধা দেয়—সত্য যে সব যুক্তি দেয় তাহা সব ঠিক। কিন্তু তাহার লেখা দুইটি ত আর উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না; সত্য চৌধুরীও তাহা মানে। ম্যাজিষ্ট্রেট লেখা দেখিবে। অশোক বুঝায়:—আর তারাও কি এ সব বিশেষ দেখে? এসব সিডিশনের মামলা। ম্যাজিষ্ট্রেট জানে—শাস্তি দিতে হবে।

শেষে সত্য বলিল: তা ঠিক! তুমি তবে কি করতে চাও?

আমাব করবার কি আছে? আপনাদের চেষ্টা আপনারা করবেন। কিন্তু আমার বিবৃতিতে আমি নরম কথা বলতে পারব না।

সত্য বলিল: বিবৃতিটা আর তবে না দিলে। লেখাই ত রয়েছে। লেখাই যথেষ্ট।

অশোক মানিতে চাহে না। সত্য ও জ্ঞানশঙ্করও বুঝাইতে পারেন না—মামলায় উকিল ব্যারিষ্টারই তাহার মুখপাত্র; তাহার নিজের বলিবার কি আছে আবার?

অশোক বলিল: যদি তাঁরা সত্যই মুখপাত্র হন—আমার লেখার স্পিরিট অনুযায়ী মামলা চালান—

শেষ পর্যন্ত সত্য সস্মিতমুখে বলিল: বেশ, অশোক, তাহলে তৈরী হও। তাই হবে। জ্ঞানকে সে বলিল: নইলেও লাভ ছিল না। তার চেয়ে ওর মর্যাদা নিয়ে ও চলুক—এণ্ড লেট'স বি প্রাউড অব হিম। তবে ছাখো, অশোক, কাগজটা যেন উঠে না যায়। তাহলে কিন্তু তুমি হারলে। গবর্ণমেণ্ট্ই জিত্‌ল।

কথাটা ঠিক। অমরও আসিয়া পড়িয়াছে—কাগজের একটা ব্যবস্থা করা সেও মনে করে প্রয়োজন। অশোকের ব্যবস্থা তো মহামান্য সম্রাটই করিবেন—হয়ত বৎসর খানেকের মত। অশোকের বন্ধু হিরণ্ময় ও বিজনের সঙ্গে কাগজ সম্পর্কে তাই জ্ঞান ও অমরের পরামর্শ হয়।

হিরণ্ময়ের বিদ্যা প্রচুর, বুদ্ধি প্রখর, সাহিত্য রচনায়ও তাহার শক্তি আছে। কিন্তু তাহার সমস্ত বিনয় নম্রতার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ অস্থিরতা আছে;—এমন আর তাহা নূতন কি একালের যুবক চরিত্রে? জ্ঞান চৌধুরী ত সকলের মধ্যেই তাহা দেখিতেছেন—অশোকের, অরুণের, অমরের,—এমন কি মনোজের মধ্যে পর্যন্ত তাহার আঁচ লাগিতেছে। তবু ত এই অস্থিরতা হিরণ্ময়ের মধ্যে নাস্তিকতায়

পরিণত হয় নাই ;—অশোকের ত তাহাই হইয়াছে। হিরণ্ময় বরং অনেক দিকেই অশোকেব বিপরীত। সে অতীতকে অশ্রদ্ধা করে না, উল্টা বিশ্বাস করে। বর্তমানকেই,—বিশেষ করিয়া অশোকের আধুনিকতার উৎসাহকে,—সে বরং পরিহাস করে। পরিহাসটা তেমনি নির্মম তাহার নিজের প্রতিও। তাহার তীব্র বিচার-শক্তির নিকট কিছুই নিস্তার পায় না,—সে নিজেও না। কোন কাজ তাহাকে দিলে সে উহার পিছনে খাটিয়া দুই দিনে তাহাতে একটা অসামান্য দীপ্তি আনিয়া দিবে। কিন্তু তৃতীয় দিনে আর তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। চতুর্থ দিনেও যদি কেহ হিরণ্ময়ের খোঁজ করে, দেখিবে সে ইম্পীরিয়াল্ লাইব্রেরীতে আশ্রয় লইয়াছে, কিংবা মিউজিয়মে ডুবিয়া গিয়াছে অ্যান্থ্রোপালজি বা আর্কিয়োলজি লইয়া। বিরক্ত করিলে তখন সে নিজের গড়া সেই দুই দিনের কাজকে বুদ্ধির শাণিত শরাঘাতে শত ছিদ্র করিয়া ফেলিয়া দিবে। এমন মানুষের উপর কাগজের ভার দিয়া কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে? কিন্তু ভার চাপাইলে সে বেশি আপত্তি করিতেও পারে না। অশোকের কাগজটা উঠিয়া যায়, ইহা সে সহিবে না।

একা বিজনের উপর ভার দিতে গেলেও চলে না। সে অবশ্য কাজের মানুষ। বন্ধুগোষ্ঠীকে লইয়া একটি সিনেমার মাসিক পত্র চালায়। তাহার পিতা শিক্ষক ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম, ইচ্ছা করিয়াই শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাঁটি মানুষ ছিলেন বিপিনবিহারী কর। কর্তব্যপরায়ণ, নিয়ম-নিষ্ঠ ছিল তাঁহার জীবন—জ্ঞান তাঁহাকে জানিতেন। নয়-দশ বৎসর পূর্বেই তিনি মারা গিয়াছেন—ছেলেদের মোটামুটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম বড় চাকুরেরা অনেকেই ছিলেন সেদিন বিপিন করের ছাত্র। কিন্তু বিজনের সেই সুবিধা লাভ ঘটে নাই। তখন পিতা জীবিত নাই—

নিজের চেষ্টায় সে পড়িয়াছে ; অসহযোগে পড়া ছাড়িয়াছে ; তাহা লইয়া দাদাদের সঙ্গে কলহ করিয়াছে। এক বৎসর পরে ফিরিয়া আবার পড়া পুনরারম্ভ করিয়াছে, পাশ করিয়াছে, সংবাদপত্রে চাকরি সংগ্রহ করিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে এবং জীবিকাও অর্জন করিতেছে। ব্রাহ্ম পিতার সাহায্য পায় নাই, তবু তাঁহার সেই উৎসাহ উদ্যোগ চরিত্রগুণ আছে বৈকি বিজনের। কিন্তু তাই বলিয়া সে ব্রাহ্ম নাকি? বরং দাঙ্গার পর সে হিন্দুসভাওয়ালা। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা থাকুক, কেষ্ট বাবুরাও আর কয়জন? টাকা থাকিলে, পজিশ্যান থাকিলে তাঁহার বাবা কেন, সে-ই হইতে পারে ব্রাহ্মসমাজের কর্তা,—বাজি রাখিয়া বলিত বিজন। অথচ সেই টাকাটা সঞ্চয় করিবার মত মনোভাবও বিজনের বেশী দেখা যায় না। হাসি-গল্প সে ভালোবাসে, ভালেবাসে সাহিত্য সঙ্গীত ; রঙ্গ-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। দশজনকে লইয়া আড্ডা জমায়, নিজের প্রশংসা শুনিয়া সব ভুলিয়া যায়, নিজের লেখা শুনাইতে শুনাইতে নিজেই মাতিয়া উঠে। আর সত্যসত্যই লেখেও সে ভালো। তবে যাহা যখন পড়ে তাহাই লেখে—মৌলিকত্ব নাই ;—আর লেখার অপেক্ষাও লেখার বড়াই করিয়া খুশী হয়। বিজন হৈ-চৈ করে। দল বাঁধিয়া সিনেমায় থিয়েটারে যায়, রেষ্টুরেণ্ট গিয়া চা-ও চপে পকেট খালি করে ;—নিজের না থাকিলে অন্যের টাকাও তেমনি নিঃসংকোচে নিঃশেষ করে। তারপর পকেট খালি দেখিলে উদ্যমের সহিত কাজে লাগে, বুদ্ধি করিয়া পথ বাহির করে ; দুই-টাকার জায়গায় দুই শত টাকা পকেটে করিয়া বাড়ি ফিরে, উহার দুই দশ টাকা হয়ত আত্মীয় বন্ধুকে ধারও দিয়া দেয়। মোটামুটি কাজের মানুষ বিজন কর। মুস্কিল হইয়াছে দাঙ্গায় বাজার নামিয়া গিয়াছে। টাকার জন্য ছাপাখানার মালিকেরা বড় গোলমাল বাধায়। টাকা হাতে থাকিলে কি বিজন দেয় না

নাকি? মালিকেরা তাহা বোঝে না। তাঁহাদের মতে বিজনবাবু তাহাদের বিপদে ফেলেন।

কথা ঠিক হইল;—আপাতত তাহারাই কাগজের ভার লইবে। তবে একটা ছাপাখানা কিনিতে হইবে। জ্ঞান চৌধুরী ও অমর উহার জন্য অর্থ প্রেরণ করিবেন। বিজন হিরণ্ময় পারিলে ওয়ার্কিং পার্টনার হইবে। জ্ঞানের বড় সখ ছাপাখানার তাহা বিভূতিশঙ্করের ছিল, স্বদেশীর যুগে ছাড়িতে হয়।

—তোমরা ছাখো ছোট দেখে একটা ছাপাখানা।

অশোক আপত্তি করিতেছিল, তাহার নামে ছাপাখানা থাকিলে দুই দিনেই তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে।

জ্ঞান বলিলেন: সে আইনের প্যাঁচ। আমরা জানি—কি করতে হবে।

অমর বলিল: আর তোমারই বা শাস্তি হবে এমন কি কথা আছে?—আলিপুরে যদি একবার কেস্‌টা নিয়ে ফেলতে পারি—তা' হলে সেখানে দত্ত সাহেব এখন জেলা জজ।

অশোক হাসিয়া উঠিল। এটা সিডিশ্যান ও শ্রেণী বিরোধের মোকদ্দমা। দত্ত সাহেবই হোন্ আর যে-ই হোন্—শ্রেণী-শত্রু আমি তাঁদের।

অমরও ব্যঙ্গ করিয়া কহিল: ভারী ত তোর শ্রেণী—তা আবার শ্রেণী-শত্রু। তারপর শান্ত করিবার জন্য বলিল: তুই তো গান্ধীবাদী নোস। একবার চুপ করে থাকিস্, কোর্টে—মামলা মোকর্দ্দমা যা করবার উকিল ব্যারিষ্টারে করবে।

অশোক হাসিতে লাগিল।—কিন্তু আসামী আমি—উকিল-ব্যারিষ্টার নয়। আর আমার জবানবন্দী আমিই দোব—

এবার অমর সত্যই দুঃখিত হয়। দেখা যাক্, ইহার পরে প্রেস হইলে

যদি সত্যই অশোককে হিরণ্ময় বিজয়ের সঙ্গে সাহিত্য রচনায় ও সম্পাদনায় লাগানো যায়! তাহাই আশা জ্ঞানেরও। তাই প্রেসের উৎসাহ।

হৈমবতী বুঝিতে পারিলেন—অশোকের আবার শাস্তি হইবে। তবু অমর শান্তা যতদিন ছিল ততদিন এই কথা বুঝিবার মত তাঁহার অবকাশ হয় নাই। অমর বরাবরই সকলকে জমাইয়া লয়। কিন্তু শান্তা যে এমন মানুষকে আপনার করিয়া লইতে পারে, তাহা হৈম ভাবিতে পারেন নাই। পূজার শেষে তিনি দেখিয়াছিলেন—'নূতন দিদি' অমরের বিবাহান্তে পুত্রবধূ দেখিয়া বাড়ি ফিরিলেন—মনে হইল দেশভ্রমণ করিয়া, তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি ফিরিলেন, সত্যই কাদম্বিনীর চোখে মুখে অপূর্ব সফলতা লইয়া। হৈমবতী বুঝিয়াছেন—এতদিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র বিবাহ করিল; যাহাকেই বিবাহ করুক, কাদম্বিনী উল্লসিতা হইবেন বৈকি? গ্রামেরর লোকে হৈ-চৈ করিলেও তিনি আর ভীত হইবেন না। কিন্তু শান্তা আসিয়া যখন হৈমকে সম্ভাষণ করিল; 'কাকী মা,' প্রণাম করিল অনভ্যস্ত হস্তে একেবারে নীচু হইয়া, তখন হৈমবতী তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিলেন।

অশোক তখনি বলিল: সর্বনাশ, মা! এই সক্কাল বেলা—পুজোয় বসবেন সবে—দিলে ছুঁয়ে বউ দি'—

শান্তা ভালো বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সচকিত হইল। বাঙলা সে জানে না,—হৈমবতীকে বলিতেও পারে না তাহার অপরাধ হইয়াছে; বুঝিতেও পারে না অপরাধ হইল কিসে। তাহাকে জ্ঞানশঙ্কর আশ্বস্ত করিলেন—ও সব অশোকের দুষ্টামি। শান্তার চোখ অশোকের উপর কুপিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—সস্নেহ বন্ধুত্বের শাসনে।

কিন্তু আবার হৈমবতীর মুখের দিকে সে তাকাইল—ভয়ে, সংশয়ে, দ্বিধায়। কথা না বুঝিলেও হৈমবতী সেই দৃষ্টি বুঝিবেন না কেন? টানিয়া তিনি 'বউমাকে' কোলে লইলেন, তারপর শিরচুম্বন করিলেন, কপালে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন। তখনো কথা চলিয়াছে অশোকের অমরের মধ্যস্থতায়। শান্তা সুন্দরী, বয়স নেহাৎ কম হইবে না। হয়ত বা অমরের কাছাকাছি হইবে। পোষাকে পরিচ্ছদে সংযম-শালীনতা আছে। কিন্তু তবু বুঝা যায় সে বাঙালী মেয়ে নয়। বিশেষত, বাঙলা সে বলিতে পারে না। তাই হৈমবতী যেন তাহাকে কাছে পাইয়াও কাছে পাইতেছিলেন না।

কিন্তু একটু পরেই আসিল অরুণ, তারপর অমিতা ও ইন্দিরা। বউদি'র সঙ্গে তাহাদের পরিচয় পুরাতন,—আর দেখিতে না দেখিতে হৈমকে শুদ্ধ টানিয়া লইয়া তাহারা প্রোগ্রাম করিতে বসিল। টেনিস টুর্ণামেন্টের এখন মধ্যমাঙ্ক, অরুণ শান্তাকে তাহা দেখাইবেই। ভালো টেনিস খেলিতে জানেন বউ দি'। ক্রিকেটও চলিতেছে। কিন্তু বউদি'র বাঙলা নাটক না দেখিলেই বা চলিবে কেন? শান্তার প্রস্তাব—একদিন আউটিংএ যাওয়াও চাই—ডায়মণ্ড হারবারের দিকে।

জ্ঞানশঙ্কর ও অমর কতকটা বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ঘরের মধ্যে এই একটি মানুষকে ঘিরিয়াই যেন হৈমবতীর সংসার কেমন নূতন সার্থকতায় জীবন্ত হইয়া উঠে। অথচ ঘরটা কলিকাতার একটা হোটেলের খান দুই কামরা—হৈমবতীর বিবেচনায় 'পায়রার খোপ।' তবু ইহারই মধ্যে কেমন একটি আনন্দ ও আন্তরিকতার আবেষ্টনী সৃষ্ট হইয়া উঠিল—একটি মাত্র নূতন মানুষের সমাগমে। সমস্ত পরিবারের মধ্যস্থলে যেন শান্তা এই সহজ সম্পর্কের গ্রন্থিটি আপন হাতে জোগাইয়া দিল।...এমনি করিয়া জোগাইতেন তাহার শাশুড়ী মহেশ্বরী সেদিনে, জোগাইতেন তারপর

চিত্রিশারের চৌধুরী ভদ্রাসনে তাহার জা কাদম্বিনী, আর এমনি একটি কেন্দ্রের অভাবেই বুঝি এই পর্যায়ের চৌধুরী সন্তানেরা চারিদিকে বিস্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। অশোক অরুণ, অমিতা, ইন্দিরা,—কেহই পায় নাই কোনো একটি তাহাদের কালের, তাহাদের বয়সের, প্রয়োজনীয় আত্মীয়; স্বজন-সরস একটি প্রীতিকেন্দ্র।

শান্তা বাঙলা জানে না, কিন্তু হৈমর পার্শ্বে বসিয়া সেই সবকথা বুঝাইবে—বাঙলা নাটক হইতে বিলাতী চিত্র পর্য্যন্ত। সে-ই খুঁজিয়া বাহির করিল—অমরের বন্ধুদের, অশোকের বন্ধুদের। অমিতা ইন্দিরাকে লইয়া সে গিয়া ধরিয়া লইয়া আসিল মালিনীকে।

ওয়েল, মালা,—তোমার কথা এত শুনেছি। কাকী মা এসেছেন; আর তোমার দেখা নেই—

শান্ত স্বভাবা মালিনী বলিল: আমার কথা আপনি শুনেছেন?

নয় তো কার কথা বল্‌ছি?

কিন্তু কে বলবেন?—

চোখ দুষ্টুমিতে ভরিয়া উঠিয়াছে শান্তার।—আন্দাজ করো—

সংকুচিতা মালিনী বলে: অমি, 'ইন্দি'?—

হাসি চমকাইতেছে শান্তার চোখে: ওঃ, নো। আরো আগে!

জানি না, কে তবে। দাদা কি? অমর দা'?

শান্তা হাসিয়া বলিল: নিশ্চয়। কিন্তু আরও বলেছে কেউ,—

কে?

যে মুখে বলে না।

মালিনী চুপ করিয়া আছে। শান্তা বলিল:—অমরের মতো সে মানুষ মুখে বলে না; বলে মনে।—কিন্তু তুমি করছ কি?—মুখ ফুটে বলতে পার না, কিন্তু মনে ত জানো?

কেমন শঙ্কিতা ভীতা হইয়া পড়িল মালিনী। কি জানি —

শান্তা বলিল: এসো—নো দাইসেল্‌ফ্‌। বাকি টুকু তুমি না জানো, আমি জানি—বলিয়া রহস্যভরে হাসে শান্তা।

মালিনী বুঝিয়া উঠিতে পারে না—কি সে জানিবে? সে মাষ্টারি করিয়া খায়। গৃহে মা রহিয়াছেন, ছোট ভাই পড়িতেছে, পড়া শেষ হইলে ভাইকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দিনকাল ভয়ানক।

কিন্তু শান্তা যেন তাহার ভাবনাকে উড়াইয়া দেয়। তাহাকে টানিয়া লইয়া আসে চৌধুরী পরিবারের দশজনার কাছে। ইহা কি ঠিক? মালিনী ভাবিয়া পায় না। হৈমবতী রুষ্ট হইতেছেন না তো? অশোকের মামলা, কত দুশ্চিন্তা তাঁহার। অমিতা ইন্দিরা শান্তা না হয় হৈম'র উপর উৎপাত করিতে পারে। কিন্তু মালিনীকে শান্তা এত বার বার টানাটানি করিলে তাহা ভালো লাগিবে কি হৈমবতীর?

কিন্তু শান্তার উৎসাহে হৈমবতীও ভাবিবার অবসর পাইল না। মালিনীকে তাহার আগেও ভালো লাগিত। এখন যেন আরও আপনার মনে হইল। মালিনীই শান্তাকে হৈমবতীর কথা বুঝাইয়া বলে যতক্ষণ থাকে সে—অন্য সময় অশোক বুঝাইয়া দেয়। আবার কেহ না থাকিলে একাই হৈমবতীর নিকট বসিয়া থাকে মালিনী—শান্তা হয়ত তখন অমরের সঙ্গে গিয়াছে তাহাদের কোনো বন্ধু গৃহে,—কিম্বা বিলাতী নিমন্ত্রণে।

শান্তার সহজ বেশভূষার উপর তখন কোথা হইতে আসিয়া পড়ে বিলাতী পরিমার্জনা—মুখে পাউডারের শুভ্রতা, চোখে, ভ্রূতে ঘনকৃষ্ণতা, ঠোঁটে সামান্য রক্তিমাভা। উঁচ গোড়ালির জুতা আর সূক্ষ্ম রূপায়নের পরে বাহিরে আসিয়া সে হৈমবতীকে বলিবে:

কাকীমা, যাই—

যাবে ?—হৈমবতী চমকিয়া দেখিতেন—কে বলিবে—সে বউ! সহজ গামিনী, স্বাধীন-গতি নারী সে। অমর পশ্চাৎ হইতে বলিল :

দেখছেন কী ? একেবারে খ্রীষ্টানী।

হৈমবতী অপ্রতিভা হইতেন। বলিতেন : কিন্তু তোমাদের থেকে কম। তোমরা ত নাস্তিক।—তারপর হৈম বলিতেন, দাঁড়াও না। ছুটিয়া সিন্দুর লইয়া আসিয়া পরাইয়া দিতেন সিঁথায়।

শান্তা সলজ্জ স্মিত মুখে হাসিয়া প্রণাম করিত—যেন বাড়ির বধূটি—সেই চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ির বিভূতিশঙ্কর চৌধুরীর পুত্রবধূ। আবার, প্রণাম করিয়া হোটেলের সিঁড়ি দিয়া শান্তা গট্ গট্ করিয়া স্বচ্ছন্দে নামিয়া চলিয়া যাইত—কে বলিবে সে গৃহবধূটি!

না বউ নয়,—জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন,—বউ চাইতে তোমরাই, তোমাদের কাছে থাক্‌লে। কিন্তু শান্তা থাক্‌বে অমরের কাছে। অমরের ত বউ দিয়ে দরকার নেই। ওরা দু'জনায় লেখে পড়ে, গল্প করে, এক সঙ্গে চলে ফেরে; আত্মীয় বন্ধুদের সসম্মানে আতিথেয়তা জানায়,—তাই ওদের ধর্ম। এ কালের গৃহধর্ম। এতো আর কমলাদের বাড়ি নয়—সে রকম পুজো আর্চা, ব্রত, উপবাস নিয়ে এরা চলে না। এ ধর্ম যারা নেয় তাদের পক্ষে ত শান্তা আদর্শ স্ত্রী!

কথাটা বুঝিতে পারেন হৈমবতী। ভালো লাগিয়াছে তাঁহারও শান্তাকে—এই কয়দিনে যতটুকু ভালো লাগিবার।—এমনি স্ত্রীই দরকার ছিল অমরের। উহারা ত দেশে-গাঁয়ে থাকিবে না, আত্মীয় পরিজন লইয়া চলিবে না; সংসার-সমাজ দেখিবে না—থাকিবে বাহিরে-বাহিরে;—এমনি স্ত্রীই দরকার ছিল অমরের। হয়ত এইরূপ স্ত্রীই একালের ছেলেরা চায়। এমনি স্ত্রীই দরকার কি অশোকের জন্ত ?

সেও ত সমাজ সংসার করিবে মনে হয় না। কিন্তু এমনি স্ত্রীই কি? হৈম'র মন আর কথাটা ভুলিতে পারে না।

অমরকে সঙ্গে করিয়া একদিন হৈমর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া উপস্থিত একটি সুন্দরী মেয়ে। অমর বলিল—মিসেস্ মজুমদার। আর তাহার সঙ্গে তাহার পিসশ্বশুরের মেয়ে রেবা। কিন্তু মিসেস মজুমদার কি? এ যে সেই ললিতা—সেই জংলী মেয়েটা এখন এমন সুশ্রী ও বড় হইয়াছে!

হৈম শুনিল এই রেবাকেই অশোক পড়ায়।

বলেন নি বুঝি এ কথাটাও অশোকবাবু?—ললিতা সেই আগেকার মত কথা বলিয়া চলিয়াছে।—কোন্ কথাই বা বলেন তিনি?—হৈম আসিয়াছে, কাকাবাবু আসিয়াছেন এই কথাটাই কি অশোক রেবাকে বা ললিতাকে বলিয়াছে? রেবাকে এই পরশু ও অশোক পড়াইয়া আসিয়াছে। অমরের মুখে ললিতা সংবাদটা পূর্বদিন পাইয়াছিল। সেদিন ইচ্ছা করিয়াই রেবাদের বাড়িতে ললিতা অপেক্ষা করিয়াছে অশোকের জন্য। রেবা অশোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছে হৈমর কথা, কাকাবাবুর কথা। তবু কি অশোক বলে তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন? এমনিই অশোক। কিন্তু অমিতা ইন্দিরাই বা কেমন মেয়ে?—একটু খবর দিতে পারিল না ললিতা দিদিকে বা রেবা দিদিকে? এখানে হোটেলে উঠিলেন কেন হৈমবতী ও কাকাবাবু? চলুন তাঁহারা এখন ললিতার বাড়ি; কিছুই অসুবিধা হইবে না।

অনেক বদলাইলেও ললিতা তত বদলায় নাই। কথা বলিয়া চলিয়াছে। চাপল্য কমিয়াছে, কিন্তু বাক্যস্রোত তাহার কমে নাই। নিজের উৎসাহে

সে অপরের আপত্তি সম্মতি বুঝিয়া দেখিতে চাহে না। বুঝিতে চাহে না যে, জ্ঞান ত যাইতেই পারে না, হৈমও যাইতে পারে না। কেবলই জিদ করিবে। তাহার ছেলেমেয়েদের দেখিবেন না হৈমবতী ও জ্ঞান? ঘর দুয়ার দেখিবেন না? তারপর বলিবে—কবে মরিয়া গিয়াছেন ললিতার মা ও বাবা, তেমন আপনার জন বলিতে আর তাহার কে আছে?

একবারের মত হৈমর মন আর্দ্র হইল। না, সেই মেয়েটার বুদ্ধি শুদ্ধি হইয়াছে। সত্যই মেয়েটা একটু বেশি চটপটে, মিশুক স্বভাবের; একটু চঞ্চল প্রকৃতির হইলেও তাহার কুবুদ্ধি নাই, অশোভনতা নাই। বড় মানুষিও তাহার নাই। বড় মানুষি নাই তাহার ননদ রেবারও—অশোকের ছাত্রীর। জ্ঞান ও হৈমর নিকটে মেয়েটি কেমন সংকুচিত দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বেশি কথা বলিতে পারিল না, নম্রভাবে 'হাঁ' 'না' বলিয়াই কথার উত্তর শেষ করিল। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেমন করিয়া শান্তার সহিত গল্প করিতে পাইয়া জমিয়া গেল। সেও মিশুক প্রকৃতির, সেও বুদ্ধিমতী; দশজন শিক্ষিত মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে সমানে মানাইয়া চলিতে পারে।—এমনি মেয়েই বুঝি আজ-কালকার শিক্ষিত ছেলেদের উপযুক্ত সহধর্মিনী।

কিন্তু সংশয় বাড়িয়া যায় হৈমবতীর।

জোর করিয়া ললিতা তাঁহাকে একদিন আপনার গৃহে লইয়া গেল। তাহার স্বামী পুত্রদের দেখিলেন হৈমবতী, দেখিলেন রেবার মাতাকেও। কলিকাতার পদস্থ সম্পন্ন ঘরের লোক তাঁহারা—কথায় আলাপে গৃহ সজ্জায় মাপা, মার্জিত, পরিচ্ছন্নতা।

হোটেলে উঠেছেন আপনারা?—রেবার মাতা তাহা জানিতেন না। অশোকের মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাওয়া তাঁহারও প্রয়োজন। তাই ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া চমকিতা হইলেন।

হোটেলে তিনি কি করিয়া যাইবেন? তিনি কলিকাতার ডালিমতলার চাটুজ্জেদের গৃহিণী। রেবা যায়? হাঁ, উহারা কলেজে পড়ে,—যাইবে বৈ কি?

ললিতা বলিল: আত্মীয় বাড়িতে এঁরা উঠবেন না যে।

ওঃ! কে আত্মীয়? তাঁরা থাকেন কোথায়?

ললিতাই আবার জানাইয়া দিল: চৌধুরীরা আছেন—ব্যারিষ্টার, দক্ষিণ কলকাতায়। ওঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁরা—

রেবার মাতা রীতিমত সম্ভ্রম বোধ করিলেন।—ওঃ, তবে ত আপনার লোক আছেই এখানে। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন: চৌধুরী, কোথাকার চৌধুরী আপনারা?

চিত্রিসারের চৌধুরী।—হৈমবতী সগৌরবে বলিলেন।

চিত্রিসার!—সে কোথায়?

চিত্রিসার জানেন না?—হৈমবতী বিস্মিত বোধ করিলেন। চিত্রিসারের চৌধুরীদের জানেন না,—কে ইহাঁরা?

ওঃ! পূর্ববঙ্গে—

হৈমবতী গম্ভীর হন। তিনি বুঝিতে পারেন—তিনি ইঁহাদের চক্ষে স্বজাতীয়া নন, কলিকাতা-বাসিনী নন, মফঃস্বলবাসিনী।

কেন এই রেবাকে পড়ায় অশোক?—যে অশোক চিত্রিসারের চৌধুরী! কেন সে রেবাকে পড়ায়?

বরং ব্রাহ্মঘরের মেয়ে মালিনীকে ইহাদের অপেক্ষা নিকটতর মনে হয় হৈমর। মালিনী বোর্ডিংএ থাকে, ইস্কুলের শিক্ষকতা করে, এখনো এম-এ দিয়া উঠিতে পারে নাই, বি-টিও পড়িতে পারে নাই। ছোট ভাইএর

পড়া শেষ হইবে এইবার—তাহার পরে তাহার নিজের পড়া। ভাইটি মানুষ হউক আগে। কোথাও কাজে লাগুক।—হৈমর কাছে বসিয়া বসিয়া এই সব খুটিয়া খুঁটিয়া বলে মালিনী, হৈমর গৃহযাত্রার কথা শোনে। কমলা বুঝি রহিয়াছেন মধুখালিতে? আর কাদম্বিনীও। সরযূ ঢাকায়?—তাহার স্বামী সেখানে কাজ করেন, হয়ত কলিকাতায় আসিবেন কাজ লইয়া। কত বৎসর আগে মালিনী তাহাদের দেখিয়াছে, এখনো কিন্তু সকলের কথা মনে আছে। বুদ্ধি থাকিলেও কথায় মালিনীর চাঞ্চল্য নাই। কেমন শান্ত শ্রী। লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা, শ্রীও তেমনি। কষ্ট করিয়া নিজে পড়িয়াছে, ভাইকে পড়াইতেছে, পিতৃহীন মেয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতেছে। অথচ দেখিয়া মনে হয় না যে, তেমন কিছু করিবার মত শক্তি ও দৃঢ়তা তাহার মধ্যে আছে। মনে হয় না এমন মেয়ে—কিন্তু সত্যই ত, কি উদ্যম সহনশীলতার কাজই না সে করিয়াছে নীরবে। তাই বুঝি হাসিতে একটু মৃদু বেদনা আছে। মুখে মাধুর্য্যের মধ্যেও একটু ক্লান্তিরেখা আসিয়াছে। বয়স না হইলেও, উৎসাহ আগ্রহ সত্ত্বেও, গাম্ভীর্য আসিতেছে। কত আর বয়স মালিনীর? চব্বিশ।—তবে ত তাহার অশোকের অপেক্ষা অনেক ছোট, দুই তিন বৎসরের ছোট।

হৈমবতীর মন এই বয়সের তুলনাটা লইয়া কি একটা অনির্দেশ্য ভাবনা ভাবিতে থাকে।

তারপর হঠাৎ সব ভাঙিয়া যায়। ভাবিয়া লাভ কি? অশোক ত চলিয়াছে জেলে। হাঁ. হৈমবতী বুঝিতে পারেন এবার অশোকের কারাদণ্ডই হইবে। গুরুদেব স্বর্গে গিয়াছেন, আর কে অশোককে রক্ষা করিবে? জ্ঞানশঙ্কর কিছু না বলুন—হৈমকে ফাঁকি দিতে পারিবেন না।

হৈম আর কিছু ভাবিতে চাহেন না, দেখিতে চাহেন না। কলিকাতাও তাঁহার ভালো লাগে না। ললিতা গাড়ী লইয়া আসিয়া বলে—'চলুন আপনাকে দেখিয়ে আনি পরেশনাথের মন্দির।' হৈমর ভালো লাগে না। সে কি কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছে নাকি—জায়গা দেখিয়া বেড়াইবে? অশোকের কি হইবে তাহা ঠিক নাই, আর হৈম মন্দির দেখিয়া বেড়াইবে! কিন্তু ললিতাকে এড়ানোও সহজ সাধ্য নয়। জ্ঞানশঙ্করকে শুদ্ধ ধরিয়া লইয়া সে চলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখাইতে—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ। কত পড়িয়াছে ইহার কথা 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' হৈমবতী। তবু স্বচ্ছন্দ হয় না হৈম'র মন।

ফিরিয়া দেখেন—মালিনী বসিয়া আছে। তাহারই কেমন আত্মীয় বিজন, বিজনের স্ত্রী অমলা ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছে হৈম'র নিকট। মেয়েটিকে বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে—'বড় কাঁদে সে মাসীমা।'

হৈমবতীর হঠাৎ বুকের মধ্যে কান্না জমিয়া উঠিতে লাগিল। এমনি তাঁহার অশোকের বিবাহ দিয়াও তিনি ঘরে বউ আনিতে পারিতেন। এমনি তাঁহারও সেই দূর মফঃস্বলের গৃহাঙ্গণে একটি শিশু চঞ্চল চরণে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাঁহার মাথায় ঘোমটা টানিয়া ফেলিয়া দিত—বাঁধা চুল খুলিয়া ফেলিত, তাঁহার কোলে বসিয়া মুখ ধরিয়া টানিয়া বলিত—দিদা, হাম—

কিন্তু অশোক চলিল জেলে—কতদিনের জন্য কে জানে?

হৈমবতী বিজনের স্ত্রীকে না বলিয়া পারিলেন না: বউমা, যাবার আগে আবার এসো। তুমি ত আসছই, মালিনী? এসো, প্রতিদিন এসো।

কিন্তু কি লাভ? কি লাভ?—পূজায় বসিয়া হৈমবতীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল পড়িতে লাগিল। কি লাভ?

৪

হৈমবতী ফিরিয়া আসিলেন। আপীলে অশোকের শাস্তি কমিয়া দণ্ড এক বৎসর হয়, আর কমিল না। লেখা দুইটা খারাপ,—সাইমন কমিশন ত এমনি প্রায় বানচাল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রাগও তাই বেশি—অবশ্য নেতাদের তোষণও চলিতেছে। কিন্তু অশোকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ, শ্রেণী-বিরোধ দুই অভিযোগই প্রমাণিত হইয়াছে। কারাদণ্ডই হইল।

অশোক তাহার মায়ের নিকট কবে কত দিন থাকিত? এখনো হৈম মনে করিতে পারেন—অশোক কলিকাতাতেই আছে, আলিপুরের জেলে নাই।—এইধরণের কথা বিজয় বা মনোজ বলিতে পারে, কমলাও তাহা মায়ের নিকট পুনরাবৃত্তি করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া হৈমবতী মানিবেন কি করিয়া এইরূপ কথা? না; জ্ঞান চৌধুরীই কি মনে মনে তাহা মানিবেন?

জ্ঞানশঙ্কর কহাকেও কিছুই বলিলেন না।—হৈম'র কি ভালো লাগে না সংসারের কাজ? না লাগিল, কমলা এখানে এখন; সে-ই এই কয় দিন ঘর সংসার চালাইতেছিল, চালাইয়া যাইবে। ততক্ষণ প্রেসের টাকা সংগ্রহ ও সেই টাকা প্রেরণ করিয়া জ্ঞানশঙ্কর বিজন-হিরণ্ময়ের কাজ সহজ করিয়া দিয়াছেন। নূতন একটা ব্যাংকের কাজ লইয়া জামাতা নৃপেন কলিকাতা গিয়াছে,—সরযূ সঙ্গেই আছে,—নৃপেনও তাই ছাপাখানার ভার বিজনের সঙ্গে একযোগে কতকটা গ্রহণ করিতে পারে। যতদিন অশোক না আসে, এই ব্যবস্থাই ভালো; খানিকটা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন জ্ঞান চৌধুরী।

কমলা ছেলে ও শিশু কন্যা সঙ্গে করিয়া পিতৃগৃহে স্বাস্থ্যোন্নয়নের আশায় আসিয়াছিল। এবার এই কন্যাটি জন্মিবার কালে শ্বশুর গৃহে সে কষ্ট পাইয়াছে ;—এবার প্রসবকালে তাহাকে মায়ের নিকট পাঠাইতে শাশুড়ী স্বীকৃত হন নাই। ডাক্তার স্বামী জিতেন্দ্রনাথ বাড়িতেই ছিল। কিন্তু মেয়েটি জন্মিবার পর হইতেই কমলা অসুস্থ হইয়া পড়িল, নানা জটিলতা দেখা দিতে লাগিল, একটু একটু জ্বর লাগিয়াই আছে। শ্বশুরই বলিলেন, একবার অন্যত্র ঘুরিয়া আসুন বধূমাতা। কমলা কিন্তু বিশ্রামের জন্য পিতার নিকটে আসিয়া পড়িয়া গেল কাজের মধ্যেই—মা তখনো কলিকাতায়, পিতার ভার তাহারই উপর পড়িয়াছে। মা ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি এমনি অবসন্না যে সে ভার গ্রহণ করিতে চান না। কমলা তাহা বুঝিল,—সে বুদ্ধিমতী মেয়ে,—আর এ বাড়িতে কাজই বা কি? তাহার শ্বশুর গৃহের তুলনায় কিছুই নয়। সে নিজেই কি বসিয়া থাকিতে পারে? দুপুরে না হয় বই-পত্র পড়ে। সকালে-সন্ধ্যায় পিতার নিকট মাঝে-মাঝে বসিয়া গল্প কথাবার্তা শোনে—জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, মনোজ্ঞের। কিন্তু কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিলে ইহার পরে কি আর শ্বশুর গৃহে ফিরিয়া কষ্টের সীমা থাকিবে? মাকেও সে এক-আধটুকু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে। এই ত অমিতা ইন্দিরা দেখা করিয়াছে, অশোকের কুশল জানাইয়াছে। আর, অশোকের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্যে যতই সকলে কষ্ট পাউক, কমলা মনে মনে অশোকের জন্য গর্বও অনুভব করে। জিতেন্দ্রকেও সে বলিতে ছাড়ে নাই ;—'ক্ষ্যাপা বলো যা'ই বলো, দাদাকে মানুষ বলে স্বীকার করতেই হবে।' এখানেও সে তাহা বলে বাবাকে মাকে।

এইরূপ ক্ষ্যাপা দৃষ্টিভঙ্গি কমলারও ছিল, তাহা জ্ঞান চৌধুরীও জানেন। তবে আসলে তাহা অশোকের জন্যেই কমলার টান—ইহার বেশি নয়।

বইপত্র পড়িতে সে ভালোবাসিত, দেশের সংবাদ সেও যথেষ্ট পড়িত; স্বরাজ, স্বাধীনতা, প্রভৃতি কথা সেও পিতৃগৃহে সহজেই শিখিয়াছে। তারপব বিবাহ হইল, ঘর দুয়ার, শশুর শ্বাশুড়ী, ননদ,-জা শুদ্ধ সেই প্রকাণ্ড পুরাতন পরিবারে কমলা চিরন্তন ভারতবর্ষের মেয়ের মত অঙ্গীভূত হইয়া গেল। সেই প্রাচীন পরিবারে আপনার ছেলে-মেয়ে লইয়া সংসারের একটা সুস্থ সনাতন রূপও এখন সে ধরিতে পারিয়াছে। পড়াশুনার ঝোঁক, দেশের কাজের চিন্তা, তাই কমিয়া গিয়াছে। তবু এক-আধটুকু ক্ষ্যাপামি মাঝে মাঝে জাগে। তাই হৈমকে কমলা বলে, 'এক বৎসরের জেল কিছু নয়, মা। কেটে যাবে দেখতে-দেখতে। মনে করো দাদা কলকাতাতেই আছেন।'

কমলা এই কথাই আবার গুছাইয়া অশোককেও লেখে প্রবোধ দিবার জন্য। সুন্দর সে চিঠি, জ্ঞানও দেখিয়াছেন, দেখিয়া জ্ঞান হাসিয়াছেন। কিন্তু কমলার বাঙলা লেখা এখনো নিখুঁত। একটু মাজিলে-ঘষিলে সত্যই হয়ত সে লিখিতে পারিত, অশোকের অপেক্ষা খারাপ লিখিত না। বরং তাহার লেখায় স্বচ্ছতা আছে; অশোকের লেখার মত নানা আইডিয়ার ভিড় করিয়া সেখানে হুল্লোড় বাধাইয়া দেয় না। অবশ্য এখন কমলার চিঠিতে বর্ণাশুদ্ধি থাকে—অশোক জেল হইতেও পত্রে সে কথা মনে করাইয়া দিয়া উপহাস করে, কি অধোগতিই কমলার হইয়াছে—সেই 'সেকেলে' কবিরাজ বাড়িতে গিয়া। পূর্বে কি তাহারা কল্পনা করিতে পারিত—কমলার বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবে? ইংরেজি কমলা এখন ভুলিয়াই গিয়াছে। অথচ বিবাহের পূর্বে সে ইংরেজি জানিত, দুই-এক কথা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলিতে পারিত। শ্বশুর বাড়িতে এক সময়ে 'রঘুবংশ' পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কবিরাজ বাড়ির সে বধূ; ঠাকুর সেবা, গো-সেবা অতিথিসেবা লইয়াই সে ব্যস্ত, তাহার উপরে ছেলে মেয়েও

হইয়াছে। পড়িবে কখন? আবার নিজের শরীরটাও এখন খারাপ হইয়া পড়িতেছে।—এখানে আসিয়াও সে বিশ্রাম পায় নাই। কেমন ধীর শান্ত ও শ্রান্ত এখন কমলা। দেখিলে মনে হইবে বুঝি তাহার বুদ্ধিও নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু গল্প করিতে বসিলে জ্ঞানশঙ্কর দেখেন—সে বুদ্ধি এখনো একটুকুতেই ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠে। বিজয়কে ত অশোকের পক্ষ হইয়া সে হারাইয়া দেয়। মনোজকে অবশ্য সম্মান করে—বিদ্বান মানুষ। স্থির হইয়া শোনে মনোজের কথা, শান্ত সুন্দরভাবে মানিয়া লয় জ্ঞানের যুক্তি। কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না কমলার বুদ্ধি আছে, আর এ বুদ্ধি স্থির বুদ্ধি।

সুন্দর নিখুঁত ভাবেই কমলা জ্ঞানশঙ্করের পরিচর্যা করে। ঠাকুর চাকর আছে। কিন্তু পিতার অর্ধেক কাজ কমলা তথাপি নিজে না করিয়া ছাড়ে না। সকালের চা, বিকালের জলখাবার—সে-ই দেখিবে প্রতিদিন। এক আধটা বিশেষ জিনিসও না করিলেই নয়—সরপুরিয়া, পুডিং, সন্দেশ, কোনো একটা বিশেষ পিঠে,—এমনি-কিছু থাকিবেই, জ্ঞানশঙ্করও তাহা জানেন। আর তাহা শুধু জ্ঞানের একার মত' নয়। কমলা জানে—বিজয়দা,' মনোজদা'কে না পাইলে বাবার গল্প জমিবে না, খাদ্যের রস গ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে না। তাহা ছাড়া, কমলার ছেলেকে ডাকিয়া জ্ঞানশঙ্কর কোলে বসাইবেন, নিজে খাওয়াইবেন। কমলা রাগ করেঃ ওকে আর দিচ্ছেন কেন? ওতো সেই রান্নার সময় থেকেই সমানে খাচ্ছে।

জ্ঞানশঙ্কর হাসেন—কমলা বুঝে না ওরাই তো খাইবে। তাঁহার কি এখন আর খাইবার মত বয়স আছে?

কমলা তথাপি বুঝে না। ছেলেকে তিরস্কার করে—'রাক্ষস'।

জ্ঞানশঙ্কর অপমানিত শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলেন,—চলো

দাদু, চলো, আমরা বাইরের ঘরে যাই। এদের কাছে কি মানুষ টিক্‌তে পারে? ওরা আমাদের দেখতে পারে না।

কিন্তু চঞ্চল শিশু বাহিরের ঘরেও এক মিনিট স্থির থাকিতে পারে না। এ জিনিষ কি, ও জিনিস কি; ছবি দেখাও, গল্প বলো; পয়সা দাও;—বলিয়া জ্ঞানকে অস্থির করিতে থাকে। কমলা তাহাও জানে।—তাই অনতিবিলম্বে ফকিরকে পাঠাইয়া দিত—নিয়ে এসো খোকাকে। সত্যই কমলা এখন সুগৃহিণী হইয়াছে। অথচ এখনো সে জ্ঞান চৌধুরীর কাছে বসিয়া গল্প শুনিতে চাহে। আবার নূতন করিয়া বইপত্রও পড়িতেছে। মনোজকে ধরিয়াছে বই যোগাইতে। বইএর নেশা যাহার আছে সে বুঝি কাটিয়াও কাটে না অন্তত চৌধুরী বংশে।

হৈমবতী শান্ত হইতেছিলেন, জ্ঞান চৌধুরীও একটা স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। পরীক্ষা দিয়া অরুণ একবার মায়ের কাছে আসিল। পরীক্ষা দিয়া ইন্দিরাও আসিল, সে পরে যাইবে মায়ের নিকট চিত্রিসারে। অশোক যে জেলে, এই কথাটা তত তীব্র করিয়া অনুভব করিবার অবকাশ হৈমবতীরও বেশি রহিল না। বরং সে ফিরিয়া আসিতে আর কয়মাস বাকী আছে, এবার তাহাই হৈম গণনা করিতে আরম্ভ করিল।

প্রায় পাঁচ বৎসর পরে হীরেন্দ্র চক্রবর্তী হঠাৎ দেশে ফিরিয়া আসিল। কলিকাতায় কিছুদিন কাটাইয়া সপ্তাহখানেকের জন্য মধুখালিতে আসিবে। সুমন্ত্রদের লইয়া বিজয় মাতিয়া গিয়াছে, হীরেন্দ্রকে সাধারণের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা করিতে হইবে। জ্ঞানকে তাহাতে চাই।—হীরেন্দ্র তাঁহার বৈঠকখানারই পুরাতন সভ্য; রাজনীতির কত তর্ক করিত।

কোথায় ছিল হীরেন্দ্র এতদিন?

বিজয় নিম্নস্বরে সহাস্যে বলিল, সত্য কথাই ; রুশিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে-থেকে ফিরেছেন। তাজা মানুষ। নিজ চক্ষে দেখেছেন সেই অদ্ভুত দেশ ; শুধু বই পড়ে অশোকের মত মাতামাতি করেন নি।

দেশে থাকিলে হীরেন্দ্রকে এতদিন থাকিতে হইত মান্দালয়ে। তারপর সুভাষবাবুদের মত মুক্তি পাইত কয়েক মাস পূর্বে নানা অসুখবিসুখ লইয়া। কিন্তু হীরেন্দ্র চক্রবর্তী ফিরিয়াছে ফর্সা হইয়া, আরও সুস্থ ও সবল দেহে ; চোখে মুখে ঔজ্জ্বল্য, পরনে সাহেবি সুট্।

সুমন্ত্রের সঙ্গে হীরেন্দ্রের সম্বর্ধনায় অমিতা ইন্দিরাও মাতিল। কি করিবে তাহারা ? মেয়েদের পক্ষ হইতে গান, সম্বর্ধনা ? দূর! সে সব করুক অন্যেরা। সুমন্ত্র ভলেন্টিয়ারের ভার লইয়াছে। অমি' ইন্দি'ও ভলেন্টিয়ার ব্যতীত আর কি হইবে ? অমিতার কাণ্ড দেখিয়া সত্যই কমলার হাসি পায়। কিন্তু কমলার প্রতিই অমিতার উল্টা একটা অনুকম্পার ভাব—ব্যাচারী ছোটদি' ! দেশের জানেনই বা কি, বুঝিবেনই বা কি ?

কমলা জিজ্ঞাসা করে, বাবাকে বলেছ ?

তাঁকে আবার কি বলতে হবে ?

বাঃ ! তাঁর মতামত জানার দরকার নেই ?

ওঃ—অমিতার কাছে কথাটা যেন একটা হাস্যকর প্রস্তাব।

'ও' কি ?—জিজ্ঞাসা করে কমলা।

ওদের মতামত নিয়ে কাজ করতে হলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। ওঁরা জানেন ব্রত পূজা আর্চা, আইন-আদালত। এখন চাই সাহস, তেজ, বিদ্রোহ, বিপ্লব।—মুখস্ত করা কথার মত অমিতা বলিয়া গেল।

কমলা বুঝিতে পারে না। নাটকীয় ভঙ্গিতে অমিতা আবার তাহাকে শুনাইয়া বলে: বিপ্লব—বুঝেছ, বিপ্লব।

কমলা তবু জ্ঞানকে জানাইয়া রাখিল—অমি' ইন্দি' সম্বর্ধনা সভায় ভলেন্টিয়ারি করছে।

প্রথম জ্ঞানেরও বিস্ময় ঠেকিল। ভলেন্টিয়ার!—কথাটার সঙ্গে যে অনেক স্মৃতি জড়িত—স্বদেশী যুগ, 'এ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি।' অবশ্য অসহযোগে গান্ধীজী খদ্দরের টুপি ও তিন মাসের জেলওয়ালা হাজার হাজার ভলেন্টিয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি কথাটায় চমক লাগে জ্ঞান চৌধুরীর:—অমি' ভলেন্টিয়ারী করবে কি রকম?

অনুমান করিয়া কমলা বলিল: ষ্টেশনে যাবে—আপনাদের সঙ্গে, মেয়েদের তদ্বির করবে মেয়েদের সভায়,—যেমন গান্ধীজী এলে করেছিল সেবার মেয়েরা।

ওঃ—এবার হাসি পাইল জ্ঞানের।—সে দেখা যাবে—বিজয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে। কিন্তু এবার কি অমি' পড়াশুনা ছেড়ে দিল নাকি? এস্রাজ সেতার শেখাও শেষ হয়ে গেল?

না, অমিতা এবার জ্ঞানের নিকট বসিয়া সেক্সপীয়র শুনিতে আসে না। ইন্দিরাও এস্রাজ বাজাইতেছে না। বরং দেখা গেল সম্প্রতি বাঁশী ও গান লইয়া মাতিয়াছে অরুণ। সত্যই, সে বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছে। এই বিদ্যা যে এই বাড়িতে কাহারও ছিল তাহা কি জানিতেন জ্ঞান চৌধুরী? খেলা গান-বাজনায় তাঁহার আকর্ষণ যতটা তাহার অপেক্ষা অবিশ্বাস বেশি। আর পৃথিবীর যত অকর্মণ্যদের কাজ ত খেলা গান-বাজনা;—তার সব তাতেই কি সিদ্ধ হইবে অরুণ? সে পিতার নিকট হইতে পালাইয়া বেড়ায়। এত হৈ-চৈ শহরে, বাড়িতে; হীরেন্দ্র চক্রবর্তী আসিতেছে, সে কিন্তু তাহাতে উদাসীন। এ সব বাজে হৈ-চৈ তাহার

পছন্দ নয়। ফুটবলটা চলিতেছে। , ওদিকে টিপরাই বাঁশীটা একটা ওস্তাদের নিকটে শিখিবার ইচ্ছা। কে হীরেন্দ্র চক্রবর্তী? কি জানে সে এই সব জিনিসের? আর সুমন্ত্রদের ত অরুণ জানেই। নীরেট। যত স্বদেশী, যত বাহাদুরী অমি,' ইন্দিরার মত মেয়েদের কাছে। উহারা ভাবে দেশ স্বাধীন করিবে উহারা প্যারেড্ করিয়া।—না, —বিজয়কে অরুণ বলিল,—সে ভলেন্টিয়ারি করিতে পারিবে না। অত সকালে তাহার ওঠা সম্ভব নয়। বিকালে? বিকালে তাহার খেলা আছে।

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী সত্যই গাড়ী হইতে নামিল যেন নূতন মানুষ। ফর্সা রং, চুল পিছনে উল্‌টাইয়া দেওয়া, ভালো সুটও টাই পরা, মুখে উৎসাহ ও আনন্দ,—যেন বয়স তাহার কমিয়া গিয়াছে। কথাবার্তায় পূর্বের অমায়িকতা তেমনি আছে, হাস্য আছে, মাধুর্য আছে, কিন্তু তাহার সব কিছুতেই এই ভাব যে—সব পরিবর্তন করিতে হইবে। পরিবর্তন হইতেছেও; কিন্তু আর দেরী করিবার সময় নাই। তাড়াতাড়ি আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে—রিভোল্যুশান্।

সভা সমিতি মিছিল—জাঁক জমক হইবে; কিন্তু হীরেন্দ্র নামিয়াই বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—মদন দাস কোথায়?

সে এসেছে কি ষ্টেশনে?—বিজয়ের তাহা লক্ষ্য নাই।

খুঁজে বার করো—নইলে বলো বাড়িতে আস্‌তে। তার সঙ্গে কাজ আছে আমার।

মদন দাস আসিয়াছিল—কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু এক মুহূর্তে সে লক্ষ্যবস্তু হইল,—তাহার সঙ্গে হীরেন্দ্রের কি কাজ?

যে কাজই থাকুক—হীরেন্দ্র চক্রবর্তী পরিবর্তিত হয় নাই। আহার করিতে প্রথমেই আসিল জ্ঞান চৌধুরীর গৃহে। হৈমবতীকে প্রণাম

করিয়া বলিল: অশোককে জেলে যেতে দিলেন কেন আপনারা? কত কাজ এখন, জেলে গিয়ে বসে থাকলে চলে নাকি?

হৈম সব কথা বুঝিলেন না; কিন্তু খুশী হইলেন। একটি লোক অন্তত চায় না অশোক জেলে থাকুক। আর সেই লোক হীরেন্দ্র চক্রবর্তী। শুধু কি তাহাই? হীরেন্দ্র বলিল,—আপনারা ওর বিয়ে দিন। বিয়ে করবে না আবার কি? আসুক অশোক;—বিয়ে না করে কেমন থাকে দেখব?

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন: তোমাদের তো আজকাল বিয়ে না করাই ফ্যাশান।

সে ফ্যাশান বাতিল হয়ে গিয়েছে। তখন আমরা যোগযাগ করতাম,—কালীপূজা করতাম, ডাকাতি করতাম, সাহেব খুন করতাম—আর বিয়ে না করে মহা 'স্বদেশী' হতাম। এখন জানি—ওতে ইন্দ্রিয়দমন হলেও বা হতে পারে, ইংরেজ-দমন হয় না। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করতে হলে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ চাই, চাই গণসংগঠন, গণ সংগ্রাম।

হীরেন্দ্রের সব কথা বুঝা যায় না। জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: তা তুমি বিয়ে করো না কেন এবার?

করব না কেন? করব।—অত্যন্ত সহজ সরলভাবে হীরেন্দ্র বলিল। মোটে ত এলাম দেশে।

হৈমবতী উৎসুক হইয়াছিলেন, বলিলেন: তা হলে মেয়ে দেখব না কি?

দেখবেন, দেখুন। কিন্তু আপনারা কি দেখবেন? জাত, গণ, কুল, কোষ্ঠী? তা ত মেয়ে দেখা নয়, মেয়ের পূর্ব-পুরুষদের দেখা। দেখুন না—অশোক কাকে পছন্দ করে।—তারপর বিজয়কে

বিজয়'কে হীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে,—কি, জানিস নাকি কাকে পছন্দ করে অশোক ?

তাহারা কিছুই জানে না। জানিলেও কি তাহা আলোচনা করিবার মত বিষয় জ্ঞানের সম্মুখে, হৈমর সম্মুখে ? কেমন বিব্রত বোধ করেন জ্ঞান। কিন্তু হীরেন্দ্রের সে দিকে দৃষ্টি নাই, বলিতেছে ;—ইয়ংম্যান—কাউকে পছন্দ করবে না, এ কেমন দেশরে তোদের, বিজয় ? কোন্ শতাব্দীতে আছিস এখনো ?

মজার মানুষ হীরেন্দ্র চক্রবর্তী। তাহার নিকট জাতিভেদ, আচার সংস্কারের গুরুত্ব তো নাই-ই, মনে হয় 'স্বদেশীয়ানায়'ও সে আর গুরুত্ব দেয় না। খদ্দর থাকুক, স্বদেশী বস্ত্রেও তাহার বিশ্বাস নাই।

আহারান্তে বাহিরের ঘরে বিশ্রামের জন্য আসিয়া হীরেন্দ্র দেখে মদন দাস অপেক্ষা করিতেছে, সঙ্গে মুনিম খাঁ।

ম্যানক্রি !—বিস্ময়ে পুলকে অগ্রসর হইয়া গেল হীরেন্দ্র।

হেনরি—হাত বাড়াইয়া আগাইয়া আসিল মুনিম খাঁ।

দুইজনে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইল। হামবুর্গের জাহাজ ঘাটার পরে এই তাহাদের দেখা। মুনিম খাঁ জাহাজী লস্কর, হীরেন্দ্র তখন রুশিয়ার গোপন যাত্রী ; দুইজন জানিতও না দুইজনার স্বদেশীয় নাম।

দুইজনে কি কথা হইবে—একসঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। বিজয় বিমূঢ় হইয়া রহিল—মুনিম খাঁ হীরেন্‌দা'র বন্ধু !

সম্বর্ধনা সভা হইতেছে—আদর-আপ্যায়ন অভিনন্দন পাঠ হইয়াছে। কিন্তু সব জিনিসেই কেমন অপ্রত্যাশিত নূতন সুর লাগিল। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা আসিয়া সভায় বসিল,—বুঝা গেল, মুনিম খাঁর

পরামর্শে। নিকটের একটা গ্রাম হইতে জন দশ বার কিছু চাষী-ধরণের লোক আসিয়া সভাগৃহের আনাচে-কানাচে ঘুরিতে লাগিল; মদনদাস তাহাদের আনিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতেই আবার কে একটা লোক দাঁড়াইয়া বলিল: 'হীরেন্দ্রবাবু বলুন তিনি কি দেখে এসেছেন, আমরা তা শুনতে চাই। বক্তৃতা শুনতে আসি নি।' বিজয় ভাবিল, সকলেই ত তাহা শুনিতে চায়, এই লোকগুলির এত বাড়াবাড়ি কেন? কিন্তু দেখা গেল শেষ অবধি হীরেন্দ্র তাহাদেরই দিকে ফিরিয়া তাহাদেরই উদ্দেশ্যে রুশিয়ার কথা বলিতে লাগিল। সভায় কি অন্য মানুষ নাই?

পরিষ্কার হইয়া গেল—বিজয়ের সঙ্গে হীরেন্দ্রের মতের মিল নাই, মিল হইবে না। বিশেষ করিয়া তাহা বুঝা গেল, শুয়োচকের প্রজাদের বিষয়ে আলোচনায়। প্রজাদের ব্যাপারটা মীমাংসা করার ব্যাপারে বিজয়ই দায়িত্ব লইয়াছিল। কিন্তু হীরেন্দ্রও বলিল, সে ব্যাপারটিতে বিজয় প্রজাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিছুতেই বিজয় তাহাকে বুঝাইতে পারে না—প্রজারা না হইলে তখন ধনে প্রাণে মরিত। সুমন্ত্রদের সঙ্গে হীরেন্দ্রের মতান্তর আরও বেশি। তাহাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক হইল, তর্ক হইল—তাহাদের বুঝাপাড়া হইবে। কিন্তু বুঝা গেল কিছুই মীমাংসা হয় নাই। একটা বড় রকমের পার্থক্যই হীরেন্দ্রের সঙ্গে তাহার পূর্বতন সহকর্মীদের ঘটিয়াছে। তাশখন্দের পূব বিশ্ববিদ্যালয়ে সে শিক্ষা লইয়াছে, মস্কোতে তাহার মার্কস্‌বাদ পড়িতে হইয়াছে, পুটিলোভ কারখানায় সে কাজ করিয়াছে, হীরেন্দ্র পাকা বলশেভিক হইয়া ফিরিয়াছে। নূতন পৃথিবী দেখিয়াছে, নূতন মানুষের জন্ম দেখিয়াছে—সে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী-শক্তিতে বিশ্বাসী। শ্রমিক নেতৃত্ব ব্যতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি করিয়া ভাঙিবে, কি করিয়াই বা ভারতবর্ষ হইবে স্বাধীন?

বিজয় বলিল: এই সব কথা জানি, অশোকও বলে। হয়ত সব একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু ওরা সবাই থিওরি কপচায়। ওরা কেউ আমার থেকে বেশি চেনে বারাহীপুরের প্রজাদের? মুনিম আর মদন বললেই হল? প্রজাদের ডাকুন না, হীরেনদা,' এখনো—দেখি তারা আপোষ-রফা চাইত, না, মুনিম খাঁর কথা মত দাঙ্গা করত, জেলে পচে মরত, সর্ব্বস্ব হারাত। ওরা সর্ব্বস্ব হারাতে চায় না—'সর্বহারা' হবে না; যতই আপনারা বলুন ওদের 'সর্বহারা'।'

জ্ঞানশঙ্করও কেমন দুঃখিত হইলেন হীরেন্দ্রকে দেখিয়া।

মনোজকে পাইয়া তিনি বলিলেন: মনোজ, এরা এদেশের মানুষকে 'সর্বহারা' বললে তারা শুনবে কেন? তারা শুনছে অনাদিকাল থেকে—তারা অমৃতস্য পুত্রাঃ। এ বিশ্ব সর্বহারাদের নয়; অমৃতের সন্তানদের।

না, অশোককে মনোজ জানে বুঝে; কিন্তু হীরেন্দ্রকে তাহারও ভালো লাগে না, কেমন ভয় ভয় করে।

হীরেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিল। কিন্তু জ্ঞান ও বিজয়ের মনে একটা কালো ছায়া রাখিয়া গেল—কোথায় গেল সেই মানুষ—হীরেন্দ্র চক্রবর্তী?—'স্বদেশীর' নেতা, কংগ্রেসের পরিচালক?

ইন্দিরা চাপা মেয়ে। তাহার আচরণে বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু তবু হৈমবতীর কেমন সন্দেহ রহিয়া গেল—কিছু একটা ঘটিয়াছে। অন্তত অমিতা তাহার সহিত যে ভাবে সামান্য কারণে দুর্ব্ব্যবহার করিল তাহাতে হৈম'র বুঝিতে বাকী রহিল না—ইন্দিরা অপমানিতা বোধ করিয়াছে। মেয়েদের সভায় ভলেন্টিয়ারের নেতৃত্ব করিবার ভার ইন্দিরার উপরই থাকা উচিত ছিল, বুদ্ধি-শুদ্ধি তাহারই আছে। রাগ করিয়া অমি'ই তাহা

আদায় করিল। তাহাতে আর কি? কিন্তু তুচ্ছ কারণে তাহার পর ইন্দি'কে সে সভাতেই ঢুকিতে দিল না। সুমন্ত্র কিছু বলিতে আসিলে তাহাকেও দুই কথা শুনাইয়া দিল। হৈমবতী তখনো বুঝিলেন না—কি ইহাদের নিয়ম। পরে বুঝিলেন; দেখিলেন ইন্দিরা আর তেমন স্বচ্ছন্দ নাই, বাড়িতেও দূরে দূরে থাকে। হৈম মুখে কিছু না বলিয়া তাহাকে কাছে টানিতে গেলেন কাজে কর্মে। ইন্দি' কাকিমায়ের সঙ্গে খুশী মনে কাজ করিতে লাগিল। সবই যেন পূর্বের মত। দিন কয় পরে সে মায়ের নিকটে বাড়ি গেল। এমনি সময়ে আসিল তাহার পাশের খবর। সকলে খুশী, অমি' কিন্তু গম্ভীর। ইন্দি' তাহার আগে কলেজে পড়িবে!

জানা গেল—অরুণ পাশ করে নাই, আসলে কলেজেও সে যাইত না—এত খেলা এত গান-বাজনা তাহার নেশা। সে দায়িত্ব জ্ঞানহীন। ইন্দিরা পড়িতে যাইবে বারাণসীতে—শাস্তা দেখিবে শুনিবে। জ্ঞান চাহেন অরুণও সেখানে যাক্ পড়িতে;—অরুণ তাহা শুনিবে না।

অমিতা বলিল: বুঝছ না, কলকাতার খেলার মাঠ ছাড়বে না।

অরুণ ক্রুদ্ধ হইল। চিরদিনই কি অমিতা এমনি করিয়া অরুণের উপর খবরদারি করিবে? সেও কি ইন্দি'—চুপ করিয়া সহিবে? যেহেতু অমি' পিতার আদরিণী, অতএব অন্যকে সে যা' তা' বলিলেও মা তাহা কানে তুলিবেন না।

অরুণ বলিল: খেলার মাঠ ত আর সংঘ লাইব্রেরী নয়—মেয়েদের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করা সেখানে চলে না।

কি বলিতে চাহে অরুণ? কিন্তু হৈম তাহা বুঝিবার পূর্বেই চিরদিনের ক্ষ্যাপা মেয়ে অমি' ক্ষেপিয়া গেল: দ্যাখো, মুখ সামলে কথা বলো—এটা বাড়ি, গজুদের আড্ডাখানা নয়।

হৈম বুঝেন না কি রকম কথাবার্তা ইহাদের? বড় হইয়াছে—তবু

সেই ছেলেবেলার মতই একজনের কথা আর-জনের গায়ে সহিবে না। হৈম অবাক্ হন ইহাদের কাণ্ডে।

থাম অমি'। বেয়াদবি রাখ।

কিন্তু অরুণও ছাড়িল না: হাঁ, এটা বাড়ি—আমাকেও ইন্দি' পাস নি। ওসব রাগ রঙ্গ করতে হয় যা তোর সুমন্ত্রদা' শেখরদা'দের নিয়ে 'নবযুগ সংঘ' করগে।

হৈমবতী চমকিত হইলেন। কি ইঙ্গিত করিতেছে অরুণ? সত্যই অরুণ কি একেবারে বখিয়া গিয়াছে। কাহাকে কি বলে ঠিক নাই।

কঠিন স্বরে হৈম বলিলেন: অরুণ!—তারপর বলিলেন: যাও, বাইরে যাও। এ ঘরে নয়। না, কথা শুনতে চাই না।—হাঁ, আমি তোমাকে কোনো কালে দেখ্‌তে পারি না, তা'ই ঠিক—দেখতে চাই-ও না। যাও, এখন বাইরে যাও।

অপমানটা অরুণের যে কতখানি বাজিল তাহা হৈমবতী ভাবিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন—কি ইঙ্গিত ছিল অরুণের কথায়? সেই কুস্তীর আখড়াটা আবার নাম পালটাইয়া 'নবযুগ সংঘ' হইয়াছে। এ বাড়ির পার্শ্বেই এখনো তাহার লাইব্রেরী, ক্লাব। অমি' ইন্দি' সেখানে যায়, তাহারা উহার মেয়ে সভ্যও। কিন্তু হৈমবতী বুঝেন নাই, ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু আছে কি? সুমন্ত্র, শেখর, ইহারা ত অশোকেরই কনিষ্ঠের মত,—প্রায় নিজ বাড়ির ছেলে। কিন্তু সেখানকারই কিছু ঘটনা লইয়া কি তবে অমিতাতে ইন্দিরাতে মনোমালিন্য ঘটে? কি সেই ঘটনা? অমিতার ভলেন্টিয়ার রূপে বাড়াবাড়ি করা? যাহাই হউক, হৈমবতী এক সময়ে বলিলেন: ঐ সংঘে ক্লাবে তুমি আর যেতে পারবে না, অমি'।

অমিতা তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ করিল।—কেন? তোমার কথায়?

হাঁ। তুমি বড় বেয়াদব হয়েছ। ইন্দি'কেও তুমি অপমান করেছ।

অমিতা তৎক্ষণাৎ আর একটা গোলমাল বাধাইয়া ফেলিত। কিন্তু তাহার সুযোগ বেশি ঘটিল না। কারণ ছুটি ফুরাইতেছে। আর অরুণের ফেল করা ও পড়ার কথাবার্তা লইয়া সকলেই চিন্তিত। কমলাও তাহার ছেলেমেয়ে শুদ্ধ বাড়িতে আছে; অমি'কে কেহ বিশেষ বাধা দিল না।

অশোকের কথাটাও তত তীক্ষ্ণরূপে ভাবিবার আর সময় হয় না। হৈম ও জ্ঞানের বেদনা দিনেদিনে যেন একটু সহনীয় হইয়া উঠিল।

৫

জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী আশ্বস্ত বোধ করিতে পারিতেছেন না। পূজায় বাড়ি আসিয়াছেন—সকলেই আসিবার কথা। অবশ্য অশোক জেলে, আর শান্তা বারাণসীতে, আর অরুণ কোন্ বন্ধুর সহিত পূজায় রাঁচি গিয়াছে—পরে আসিবে। এই চৌধুরীদের ভদ্রাসন:—কিন্তু সকলে এখন এই পূজার বাড়িতেও এক সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। বিদেশেই কাটায়। সত্যই মূল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!

ভূমিও বুঝি সরিয়া যাইতেছে। পদ্মার সেই পারঘেঁষা চরটার চিহ্নমাত্র নাই, দক্ষিণের মাঠেও ভাঙন লাগিয়াছে। পূর্বেও এই সব সংবাদ তিনি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ি আসিতে পারেন নাই, তাই চক্ষে না দেখায় সেই কথা সর্বাংশে মর্মে গ্রহণ করিতে যেন এতদিন পারেন নাই। কয় হাত বাকী আর মাঠটার?—যদি সত্যই ভাঙে পদ্মা, তাহা হইলে আর কয়দিন? পুরাতন দিনে চৌধুরীদের কত সম্পত্তিই ত পদ্মা গ্রাস করিয়াছে। চৌধুরীদের এই

ভদ্রাসনও কি আর রক্ষা পাইবে না? শঙ্কর চৌধুরীর ভৌমিক-গরিমা নানা পুরুষের মধ্য দিয়া আসিয়া আসিয়া কবেই শেষ হইয়াছিল। এখনও তবু টিঁকিয়া আছে বৃত্তিজীবী চৌধুরীদের এই ভদ্রাসন। কিন্তু পদ্মার দিকে তাকাইলে ভরসা হয় না তাহাও আর টিঁকিবে। টিঁকিলেই বা কি টিঁকিবে?...পূজায় বাড়িতে এবার ক্ষণে ক্ষণেই মনে পড়ে—এই পর্যায়ের কুলবধূরা আর বাড়ির পূজায় বাড়িতে আসে না। বিশেষ করিয়া এবার তাহা মনে পড়িল:—অমর আসিয়াছে,—শীঘ্রই চলিয়া যাইবে সে;—কিন্তু এই পূজা বাড়িতে আসিবে না কোনো দিন তাহার বধূ শান্তা।

কেমন একটা অবসাদ ও বেদনা জাগে জ্ঞানশঙ্করের দৃষ্টিতে এই বাড়িতে বসিয়া বসিয়া; চক্ষে শঙ্কা ফুটিয়া উঠে নদীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই। খরস্রোতে যেন কুটিল বক্রহাস্যে বিদ্যুৎ ঝলকাইয়া যায়। ঘোলা নদীর জলের মধ্যে পাক খাওয়া আবর্তগুলি উথলাইয়া উথলাইয়া উঠে। বাজারের দিকে এখন ভাঙন, খানিকটা অংশ ইতিমধ্যেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কুণ্ডুদের বড় আড়তের পিছন দিকটায় বাঁশের বেড়া ও খুঁটি পুঁতিয়া স্রোত রোধের চেষ্টা হইতেছে—এই পূজা আর শীত চলিয়া গেলেও আগামী বর্ষায় তাহা টিঁকিবে না। দাসু ঘোষের বাড়ির সামনেকার কদম গাছটার শিকড় নদীর পাড়ে বাহির হইয়া আছে—যেন নিরুপায় গাছটা দশ আঙুল দিয়া শূন্যে কিছু আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এক কালে দুপুর রৌদ্রে এই গোচারণের মাঠের গরুগুলি এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিত—ঘোষেদের এই কদমতলায়। রাঘব চৌধুরীর শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে—রাজীব গৃহত্যাগী হইলেন, সত্য গ্রামের বাড়ি জীবনেও দেখে নাই—অন্যান্যরা নানাখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল;—এবার বুঝি নদী গর্ভেই ভিটাও তলাইয়া যাইবে।

কিন্তু এসব লইয়া কোনো অস্বস্তিই জাগে না অমরের মনে। অমিতা ইন্দিরার ত কথাই নাই। দুইজনার কলহ সম্ভবত তাহারা সহজেই ভুলিয়া গিয়াছে—ইন্দিরা যদি বা একটু সাবধানে চলিতে জানে, অমিতার সে বালাই নাই। সে যেন এই ভাঙন-ধরা কূল, এই স্রোতের জল, এই খাল-বিল মাঠ দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। 'দাঁড়িয়া-বান্ধার' কোঠ দেখিয়া ইন্দি'কে, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া জড়ো করে ;—'এসো খেলি।' হৈমবতী বুঝাইতে পারেন না তাহাকে,—'দ্যাখ, এ শহর নয়, এ গ্রাম।' নদীতে সাঁতার কাটিবার জন্য অমি' পাগল ;—অথচ এখনো নদীর স্রোতে এমন ধার। কলিকাতায় মেয়েদের সাঁতার কাটিবার জন্য কোন একটা রাজবাড়ির অন্দর মহলে একটা পুকুর আছে। অমিতা সেখানকার সভ্য—সেই স্যুইমিং কষ্টিয়ুম বাক্সেই আছে, তাহা খুলিয়া সে পদ্মায় নামিতে উদ্যোগী। হৈম'র কথা কি শোনে ? শেষে অমরই তাহাকে নিবৃত্ত করিল,—এ নদীতে সুইমিং চলে না। নৌকা লইয়া অমিতা তখন খালে বৈঠা বাহিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জলে কাদায় কাপড় ভিজিয়া একাকার।—তবু কি শুনিবে কথা ?

কিন্তু মুশকিল বাধিল আরও পরে। 'নবমী' গাহিয়া গেল কাপালিরা। অমিতা ক্ষেপিয়া গেল—আরতি নৃত্য দেখাইবে, সে আর ইন্দি'। জ্ঞান চৌধুরী শুনিয়া অবাক। বলে কি অমি'—নাচিবে! ভদ্রলোকের কন্যা নাচিবে !

অমর বলিল : ক্ষতি কি ?—অনেক নজির অমরের মুখস্থ—কয় বৎসর ধরিয়াই ত নৃত্য কলিকাতায় চালু হইতেছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অনেকেই এখন নৃত্য দেখাইতেছেন। শান্তিনিকেতনের 'নটীর পূজার' ভাবসম্পদ কি অপূর্ব ! দক্ষিণের 'ভারত নাট্যম্,' 'কথা কলি,' গুজরাটের

'গরবা,' পশ্চিমের 'কাজরী' নাচ, মণিপুরের 'লাইছাবি' নাচ—নৃত্য ত এদেশের একটা বড় সামাজিক সনাতন অনুষ্ঠান।

জ্ঞানশঙ্কর তাহাকে বুঝাইতে পারেন না—যাহা লোকগীতি, লোক-নৃত্য, তাহা হয়ত স্বাভাবিক। তাহার শিকড় জাতির চেতনার অতলে সুদৃঢ়, তাহতে তাই ক্লেদ নাই। কিন্তু বাঙলা দেশে নাচ একটা নূতন ঢঙ্;—একটা পরগাছা, আগাছাও। ইহাকে 'ভারতীয় নৃত্যকলা' বলিলে কি হইবে? এ সেই Exotic Indianism, নামাবলীর পাঁৎলুন, যাহার উপর জ্ঞানের এত বিতৃষ্ণা।

অমর বলিল: তা বলে প্রাচীন ভারতীয় এই সব শিল্প-কলার রিভাইভেল্ও চাইবেন না নাকি?—দেশে হীরেন্দ্র চক্রবর্তীর মত সব বর্বর সৃষ্টি হবে যে তা হলে।—হীরেন্দ্রকে সে কোনো দিন শ্রদ্ধা করিত না। সেই অশোকের শনি। লোকটার বুদ্ধি আছে, কিন্তু কালচার নাই।

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: হলে হোক বর্বর। একটা কলা নতুন করে না জন্মালেও ভারতবর্ষ মরে যাবে না। নাচ বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। নট-নটী কোনো কালে ভদ্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, হবেও না।

তা কিন্তু হচ্ছে এখন ইউরোপে। হ'ত আমাদের দেশেও—ভারতনাট্যম্ মিথ্যা নয়। অর্জুন উত্তরার কথাও ভাবুন। আর, আর্ট শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে শিল্পকলার অধোগতি ঘটে, যেমন ঘটেছে সঙ্গীতের। শিক্ষিত শিষ্ট সমাজের সঙ্গে যোগ রাখাটা শিল্পকলায় নিজেরই দায়ে দরকার।—

জ্ঞান চৌধুরী তর্ক করিলেন না। অমর আগে 'ভারতীয় আর্ট' বায়ুগ্রস্ত ছিল, বরাবর সে নূতন কিছু করার দলে। কিন্তু জ্ঞান জানেন—তখনকার সমাজে অনেক জিনিস যাহা স্বাভাবিক ছিল আজিকার সমাজে তাহা

স্বাভাবিক নাই,—ইহা বুঝা এমন কি কঠিন? মেয়েরা না'চিয়া না বেড়াইলে এদেশের উন্নতি হইবে না, এমন বিশ্বাস জ্ঞানের নয়। না, এই কথা তিনি কি করিয়া ভাবিবেন—তাঁহার কন্যা, তাঁহার বধূ দশ জনের সম্মুখে গান গাহিবে, নাচ দেখাইবে?—টিকিট কাটিয়া লোক আসিবে, যাহার খুশী; মোক্তার আমজাদ আলি কিংবা পাটের দালাল 'গেণ্ডারী রাম।' তাহারা বসিয়া বসিয়া বাহবা দিবে—আর তাহাদের সম্মুখে নাচিবে' তাঁহার কন্যা, তাঁহার পুত্রবধূ।...আর্ট, আর্ট, আর্ট!—যেন সব আর্ট এক দরের। না, সব আর্ট সমাজে সমতুল্য নয়। অমি' কমলার মত কবিতা লিখিলে তিনিই আপত্তি করিতেন কি? অমিতা গাহিলেও তিনি আপত্তি করেন না। কিন্তু নাচ দেহ আশ্রয় করিয়া ফোটে, উহার সমস্ত আবেদন দেহজ। কাব্য-গানের সত্যকারের আবেদন প্রধানত স্পিরিচুয়াল্— মনোময়; এমন কি,—মনোজ যেমন চায়—বিজ্ঞানময়, আনন্দময় লোকের ইঙ্গিতও তাহা বহন করে। নাটকও ততটা অধ্যাত্ম-রচনা নয়,—কিন্তু নৃত্যের আবেদন একেবারেই দেহজ রূপের, এই সহজ কথাটা অমর কেন বোঝে না?

অমিতা তথাপি আব্দার করে:—বেশ, বাইরের লোক কেউ থাক্‌বে না। শুধু বাড়ির লোক। আমি আর ইন্দিরা দেখাব একটা নাচ, আর একটা মিলনের বোন্—আমাদের সঙ্গেই পড়ে কলকাতায়।

মিলন কে?

কালচিতার সেনেদের ছেলে, বিলাত গিয়াছে এবার।

জ্ঞানশঙ্কর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কালাচিতার সেনেদের মেয়েরা এ বাড়িতে আসিবে এবং নাচিতে আসিবে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। আর আসিলেও জ্ঞান চৌধুরীর মেয়ে সে বাড়িতে যাইবে না। দুই বংশের অনেক পুরুষের শত্রুতা আজ মিটিয়া গিয়াছে;

তাই বলিয়া দেশে মেয়েরা এখনো কেহ কাহারও বাড়ি যায় না; না, কাহারও বাড়িতে গেলে সেই পিতামহীরাই তাহা ক্ষমা করিবেন··· আর নাচিবার প্রশ্ন ত উঠেই না। এখনি এই কথা লইয়া গ্রামে কথা উঠিয়াছে। এইরূপ করিলে অমি' ইন্দির বাড়ি আসাই বন্ধ করিতে হইবে। উহারা শহরের সমাজে না হয় যেমন খুশী চলে, কিন্তু গ্রামের সমাজকে সম্মান করিতে না জানিলে চলিবে কেন? ইহারা কি শিখিয়াছে গ্রামের সমাজের? না। উহারা স্কুলে যাহা শিখিতেছে তাহার অপেক্ষা তাহাদিগকে বেশি শিখাইতে পারে কমলা।

হেমর হাতটায় বাতের উপদ্রব দেখা দিতেছে। জিতেন্দ্র বলিবে, ভালো কবিরাজ দেখান। আমাদের শাস্ত্রে এর কোনো ঔষধই আসলে নেই।

পূজার পরেই কমলা শ্বশুরালয়ে ফিরিবে, সেই উদ্দেশ্যে জামাতা জিতেন্দ্র আসিয়াছে। পিতার সহিত জিতেন্দ্র এক যোগে প্র্যাক্‌টিস্ করে, চক্রবর্তী মহাশয় কবিরাজী ছাড়েন নাই। ছেলেই বরং কবিরাজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ভালোছেলে, ভালো বোঝেশোনে অসুখ। অবশ্য শান্ত মানুষ বলিয়া চট্ করিয়া পশার জমাইতে সে পারিবে না। তাহা ছাড়া, ব্যাকটি্ওলজি ও দেশী ঔষধ-পত্রের বিষয়ে গবেষণার ঝোঁকই তাহার প্রবল। অমর অশোক তাই তাহাকে পরিহাসও করিত। সে ডাক্তার, কিন্তু তাহার হিন্দুভাব, আয়ুর্বেদে বিশ্বাস, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি, এই সবই কি অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয়? বৈজ্ঞানিক দৃষ্ট যাহার নাই সে ডাক্তার কি? তাহা হইলে আমাদের ঠাকুর মা দিদিমারাই ছিলেন বড় ডাক্তার, মনোজের স্ত্রীর মত তাঁহারাও বলিতেন—বিলাতী ঔষধ খাইব না

বরং মরিব। ইহার মধ্যে মূর্খতা ছাড়া আর কি আছে? মনোজ নিজেও এখন তাহা মানে।

জিতেন্দ্রের কথা শুনিয়া কমলা পর্যন্ত বলে তোমাদের শাস্ত্রে যা আছে, তা'ই কি তুমি জানো? খামোখা তার দুর্নাম করো কেন?

জিতেন্দ্র জানে—কমলার অনুযোগ অমূলক নয়। এবার প্রসব কালে কমলার মেয়েটির পা একটু মচকাইয়াছে, কিন্তু সত্যই ডাক্তারী মতে সাবধান হইলে তাহা হইত না। মেয়েটি হাঁটিতে শিখিবে দেরীতে; তারপরও বাঁকা বাঁকা পা ফেলিবে। অবশ্য দেখা যা'উক, তেমন মাপের তৈরী জুতা পরাইয়া রাখিলে পায়েব সেই দোষটুকু হয়ত তাহাতেই সারিয়া যাইবে। না হয় কলিকাতা লইয়া গিয়া একটু ভাঙিয়া নূতন করিয়া হাড় সোজা বসাইতে হইবে। কষ্ট পাইবে খুকী; কষ্ট পাইবে তাহাতে কমলা। কিন্তু শিশুদের দেহ সহজেই সব দোষ ও কষ্ট সামলাইয়া লইতে পারে। কমলা অবশ্য তাই বলিয়া মোটেই ভুলিতে পারে না যে, এই ত্রুটী তাহার মেয়েটির নয়। আর এই অকারণ শাস্তি খুকীকে কত দিন কি ভাবে সহিতে হইবে তাহার ঠিক কি? শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণর সহজে কি বাড়ির শিশু কন্যাকে চামড়ার জুতা পরাইয়া রাখিতে রাজী হইবেন? না শ্বশুর মহাশয়ই সহজে রাজী হইবেন ডাক্তারদের হাতে হাড় ভাঙিয়া হাড় জোড়া লাগাইতে তাহার পৌত্রীর? ডাক্তারী শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই কি জিতেন্দ্র আপনার গৃহে প্রয়োগ করিতে পারে? এইবার শ্বশুর গৃহে প্রসবকালে যে ত্রুটী ঘটিল তাহাতে কমলা দীর্ঘদিন ভুগিল, হয়ত বা চিরদিনের মত সে ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে। কিন্তু তাহারই কি কোনো সত্যকার চিকিৎসা জিতেন্দ্র করিতে পারিতেছে? তাহাদের পরিবারে পিতা রহিয়াছেন, মাতা রহিয়াছেন, পিসিমা'রা রহিয়াছেন—জিতেন কথা বলিবার কে? চিরদিন মা পিসিমা'রা

আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা করেন, তাহার তদারক করেন; এবারও তাহাই করিয়াছেন। সেখানে জিতেনের কথা বলা চলিত নাকি? এমনি তাহাদের বাড়িতে বরাবর হইয়াছে। নূতন নূতন শিশুরা জন্মিয়াছে—জিতেন্দ্র জন্মিয়াছে, জন্মিয়াছে তাহার ভ্রাতা ভগ্নীরা, জন্মিতেছে তাহার পিসতুত ভাই বোন্‌রা, তাহার ভাগীনেয় ভাগীনেয়ীরা—জন্মিল কমলারও দ্বিতীয় সন্তান খুকী। ইহাতে বলিবার কি আছে? ত্রুটী ঘটিয়া গেল! এমনি যায়—ক্বচিৎকদাচিৎ। হাসপাতালেও যায়, মাতৃসদনেও যায়—কাহার সাধ্য তাহা রোধ করে? দৈব ইহাই, বিধাতার বিধান।

এই যুক্তি কমলাই কি না মানে? কিন্তু কেমন করিয়া যেন এবার এই যুক্তিতে সে বল পায় না আর। মধুখালিতে বাপের নিকট বসিয়া বসিয়া সে যুক্তিতর্ক শুনিয়াছে নানা বিষয়ে। কিন্তু তবু যেন খুকীর কথা ভাবিলে এই যুক্তিতে কমলার আর শ্রদ্ধা থাকে না। মনে পড়িয়া যায় তখন অশোকের তর্ক। কারাগারস্থ অশোকের যুক্তি যেন শরীর ধরিয়া কমলার নিকট শতগুণ মূল্যবান হইয়া উঠে। তাহার চিঠি পড়িয়া মনে পড়ে কমলার—সেও একদিন লিখিতে পারিত বাঙলা, অনেক অদ্ভুত সম্ভাবনা ছিল বুঝি তাহারও।—নিজের শরীরও পিত্রালয়ে সারিল না;—হয়ত কলিকাতায় বিশেষজ্ঞদেরই দেখানো প্রয়োজন। কিন্তু কমলা জানে তাহা হইবে না—শ্বশুর তাহাতে স্বীকৃত হইবেন না, জিতেন্দ্রও সে প্রস্তাব পিতার নিকট উত্থাপন করিতে পারিবে না। সত্যই সে পারিল না। এখনো অমরের কথার উত্তরে সে বলিল: বিশেষজ্ঞরা যা বল্‌বেন্ সে আমার জানা আছে।

হৈম বলিলেন: একবার কলিকাতায় কাউকে দেখালে হয় না?

জিতেন্দ্র বলিল: আর কিছু দিন যাক্ দেখি বাবা কি স্থির করেন—'বাবা কি স্থির করেন, মা কি স্থির করেন':—ইহাই সে পরিবারের

নিয়ম। জিতেনের স্থির করিবার উপায় নাই ;—হৈমবতীরও এতটা ভালোমানুষি ভালো লাগে না।

কমলাও মায়ের সম্মুখে পরিহাস করে : থাক্ মা, থাক্। ওদের বাড়ির সব কিছু স্থির করেন নারায়ণ ;—অর্থাৎ, বাইরে বাবা, ভেতরে মা পিসিমারা। আর 'ওঁরা? ওঁরা শুধু স্থির থাকেন—নারায়ণ শিলা!

কমলার মনে যে এমন বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতা আছে তাহা কেহ জানিত না। ইহাতে যে অমর অশোকেরই ছিল অধিকার।

কমলার মধ্যে এই শক্তি নূতন লক্ষ্য করিলেন জ্ঞান চৌধুরী।

জ্ঞানশঙ্কর ভাবিতেন কমলা তাহার আপন স্বভাবের গুণে ও চির-দিনের ভারতীয় নারী প্রকৃতির নিয়মে বুঝি সংসারাভিজ্ঞ গৃহকর্ত্রী হইতে আর বাকী নাই। বুদ্ধিতে, সেবায়, নিষ্ঠায় কমলা আপনাকে কেমন কল্যাণী মেয়েটির মত জ্ঞানকে এবার মধুথালিতে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল এই কয় মাস। অমি'র বাড়াবাড়ি দেখিয়া কমলা শাসন করিত, 'আপনি ডাক দিন বাবা। অত বড় মেয়ে চললো কোথায় কোন্ ছেলেদের সংগে, না, ওপাড়ার কাদের বাড়িতে একা-একা।' কিন্তু ইন্দিরাকে দেখিয়া সেই কমলার মনের একটা অংশে যে একটা অপূর্ণতা-বোধ জাগিয়াছিল তাহাও জ্ঞান বুঝিয়াছিলেন। 'বাঃ ইন্দি, কেমন সেতার বাজাতে শিখেছে!...আমাদের কালে এ নিয়ম ছিল না।... ওবাড়িতে? সর্বনাশ! এ কথা কেউ ভাবতেই পারে না—মেয়েরা বাজনা শিখছে।' ইন্দিরা পাশ করিল ;— আনন্দের মধ্যেও কমলার মন যেন এক-একবার কোন্ দূর লোকে উড়িয়া যায়—'এই ত সেদিন! কিন্তু ভাবতে পারতেন কি আমাদের দিনে কেউ যে আমরা আবার পাশ করব? আবার কলেজেও পড়তে যাব? কিন্তু পড়ালে আমরাও বাবা খুব খারাপ মেয়ে ছিলাম না।'

এখন কি আর পড়াশুনা করা যায় না ?

জেল হইতে কমলাকে অশোক লিখে অর্ধেক পরিহাস করিয়া, অর্ধেক সত্য বলিয়াই :—অশোক আর গল্প প্রভৃতি লেখে না ইহা ত সত্য নয়। সে লেখে বলিয়াই ত তাহার স্থান হইল জেলখানায়। 'বরং তুমিই লিখতে পারতে অথচ লিখ্‌ছ না। শ্বশুরবাড়ি কি জেলখানার থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর ?—লেখাপড়া চলে না ! এখন তো বাবার কাছে আছ—ছাখোই না, লিখতে পার কিনা ?'

কলম লইয়া বসে নিভৃত দ্বিপ্রহরে কমলা। এক একদিন নির্বাক সন্ধ্যায় মনে হয় কোথায় তাহার কথা জমিতেছে। জ্যোৎস্নাস্নাত নারিকেল বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন সে বলিতে চায়।—কি বলিতে চায় সে ? কবিতা লিখিতে চাহে নাকি কমলা ? গল্প লিখিতে চেষ্টা করে কি ? জ্ঞান চৌধুরী শুনিয়া উৎফুল্ল হন, হাসেন—মাথা ছিল মেয়েটার। সেই মাথায় কল্পনা এখনো এত জোগায়, তাহাই আশ্চর্য।...এমন আশ্চর্য মাথা বুঝি তাঁহারও ছিল না এই বয়সে...তখনো জ্ঞানের কলেজ জীবন...হয়ত তখনো তাঁহারা আবিষ্কার করেন নাই 'কড়ি ও কোমল' কিংবা 'মানসীর' কবিতা ;...কিন্তু সে কি অদ্ভুত জোয়ার নামিয়াছিল তখন জীবনে...দেশ-বিদেশের কবিতা কল্পনা হইতে।...

বাড়ি হইতে কমলা শ্বশুরালয়ে গেল। জ্ঞানের মনে হইল—কমলা এই কয় মাসে তাঁহার অত নিকটে আসিয়া যেন আরও বুঝাইয়া গেল সে তাহার কত নিকটের।—সে শ্বশুর-গৃহের সেই দেবতা-ব্রাহ্মণ-অতিথি-সেবায় আত্ম-নিবিষ্টা গৃহবধূটি মাত্র নয়, সে চৌধুরী বাড়ির জ্ঞান চৌধুরীর কন্যাও—যাহার বুদ্ধি আছে ; যে-পরিহাস করিতে জানে-স্বামীর রক্ষণশীলতাকে ;

যাহার বিস্তার পিপাসাও আছে, জ্ঞান মনোজ অমরের আলোচনাকে যে গৃহের এক কোণ হইতে সকলেরই দৃষ্টির অগোচরে সাগ্রহে পান করে; পিতার আলমিরা হইতে বই খুলিয়া রাত জাগিয়া পড়িতে পড়িতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়; আর সকলের উপর যাহার কল্পনা এখনো গৃহাঙ্গণের শত কর্তব্য, গৃহধর্মের শত আয়োজনের মধ্যেও পক্ষ বিস্তার করিয়া দিতে চাহে...

True to the kindred points of Heaven and home.

জ্ঞানশঙ্কর যেন কমলাকে এবার একান্ত আপনার বলিয়া চিনিতে পারিলেন—শুধু কবিরাজ বাড়ির বউটি বনিয়া যায় নাই· কমলা।...আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের যেন কেমন আশঙ্কাও হইল—সেই প্রাচীন সংসারের অতি নিয়ম-বাঁধা আচার-নিষ্ঠার মধ্যে কমলা কি আপনাকে একেবারে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছে?...না, কোথাও তাহার নিভৃত অন্তরে কি এই বেদনাও জাগিয়া উঠিতেছে—'আমিও পাশ করিতে পারিতাম, আমিও লিখিতে পারিতাম!'

না, অমি' ইন্দি'র মত অস্থিরতা নাই—কমলার কোথাও।

শাস্তার তার আসিল অমরের নামে—'অরুণ আমার নিকট। চিন্তার কারণ নাই।'—অর্থাৎ তারে চিন্তার কারণ জুটিল। অরুণ কবে গেল বারাণসীতে? কেন গেল? কেনই বা এই তার শাস্তার?

অমর ও ইন্দিরা কাশী চলিয়া গেল,—তাহাদের ছুটি ফুরাইতেছিল। অরুণকে তাহারাই দেখিতে পারিবে, হৈম'র ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। পত্রে সব জানাইবে অমর।

ব্যাপারটা কি?

মিশনারি হোস্টেলেই টেনিস্ খেলায় অরুণের হাত খুলিয়া যায়।

নর্থ ক্লাবের ডাব্‌ল্‌সের চ্যাম্পিয়ানশিপে অল্পের জন্য দ্বিতীয়ার নিকট সেবার সে হারে। পরাজয়ের কারণ তাহার জুড়ি বীরু বাঁড়ুজ্জে। বীরুকে পার্টনার করিয়া অরুণ ভুল করিয়াছিল, কিন্তু সেই ভুলও ঘটে বীরুর বোন নিতুর জন্য। সে এখন ডায়োসেশানে বি-এ পড়ে। তাহাদের বাড়িতে বীরুর সঙ্গে খেলিতে ও গল্প করিতে গিয়া নিতুর সঙ্গে অরুণের পরিচয় হয়। অর্থাৎ, অরুণ নিতু বাঁড়ুজ্জেকে ভালবাসে। বোধহয় বলা সঙ্গত, নিতুরও অরুণকে ভালোলাগে। বলা অধিকতর সঙ্গত যে, সলিসিটারের আর্টিকেল্‌ড্‌ বীরু বাঁড়ুজ্জে তাহাতে আপত্তিও হয় নাই। অরুণের পার্টনার-রূপে ফোর্থ রাউণ্ডে উঠিয়া সে রেবাদের বাড়িতে নিজের রীতিমত প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছে—রেবাও হয়ত একেবারে অপ্রসন্ন নয়। এমনি সময়ে বীরু খেলার নিমন্ত্রণ পায় রেবার বড়দা'র নিকট হইতে—রাঁচিতে তিনি থাকেন, রেবারাও ছুটিতে সেখানে যাইবে। বীরু বাঁড়ুজ্জে যদি তাহার বন্ধু অরুণ চৌধুরীকে লইয়া খেলিতে আসেন তাহা হইলে তাঁহারা খুবই খুশী হইবেন।—কিন্তু সঙ্গে নিতুকে আনিতে যেন না ভোলে বীরু। সে, রেবার পরিচিতা, দিন দুই বেড়াইয়া যাইবে এখানে।

যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িল। যথারীতিই তিনজনে সেকেণ্ড ক্লাশে চলিয়াছে। অরুণের সম্মান-বোধ কম নয়। নিজের খরচ সে নিজে দিবে। পথেও খাওয়া-দাওয়ার জন্য সে দরাজ হাতে খরচ করিবে তাহাও ঠিক;—নিতুকে একটু তাক লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। সবই ঠিক মত চলিতেছিল, কিন্তু মুশকিল হইল পরে। বীরু বাঁড়ুজ্জে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—গাড়ীতে উঠিলেই তাহার ঘুম পায়। তখন অরুণ ও নিতু গল্প করিতেছে।...

নিতু প্রথমাবধিই গম্ভীর, পরে ঝগড়াও হইল।

তুমি এলে কেন দাদার কথায়?—অপ্রসন্নভাবেই নিতু অরুণকে বলিল।

অরুণ অপ্রস্তুত হইল মনে মনে। কিন্তু নিতুকে অপ্রস্তুত করিবার জন্যই মুখে উত্তর দিল: তুমি যাচ্ছ বলে।—শুধু অপ্রস্তুত করা নয়, কথাটা শোনাইবেও ভালো।

ভ্রূকুটি দেখা দিল কিন্তু নিতুর কপালে। 'ভালো লাগার' সম্পর্ক তাহাদের দুই জনার। কিন্তু তাহা এতদুর গড়াইয়া যায় নাই যে, অরুণ এমন কথা এত স্বচ্ছন্দে বলিবে।

নিতু বলিল: আত্ম-সম্মান বোধ থাকা উচিত ছিল।

কে জানিত এইটাই দুর্বল ক্ষেত্র অরুণের? বাড়িতে তাহার ভাইএর বোনের অধিকতর আদর দেখিয়াও তাহার আত্মসম্মান-বোধ আহত হইয়াছে। একটা অভিমান ও ক্ষোভ অরুণ এই কারণে পিতার ও মাতার প্রতিও পোষণ করিত। তাঁহারা অশোকের গুণগ্রামে বিশ্বাসী, অমি'কে আদর দেন, অরুণের কোনো প্রতিষ্ঠা বাড়িতে নাই। মা ও বাবা তাহাকে সম্পূর্ণ মর্য্যাদাও দেন নাই—ইহা কি সে জানে না? এই আবাল্যের হীনতাবোধই বাঁকিয়া চুরিয়া একটা ঔদাসীন্য ও দায়িত্বহীনতায় এবং তীক্ষ্ণ প্রেষ্টিজ বোধে পরিণত হইয়াছে। নিতুর কথায় তাই এখন অরুণ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তবু নিতুর কথা;—তাই তখনো হাসিয়া বলিল: কেন, আত্ম-সম্মান বোধ নেই বুঝলে কি করে?—আমাকে অন্যেরা সম্মান করছে দেখে বুঝি?

সম্মান তোমাকে করছে! দাদা তোমাকে সঙ্গে গেঁথে নিয়ে যাচ্ছেন,—তাই করবেন কি আর রেবার দাদা? রেবাদের সঙ্গে দাদা চাল দেন তাও বুঝতে পারি। কিন্তু তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত এই সব চাল দিতে। মফস্বলের ফেল করা একটা ছাত্র তুমি—এই রকম যে দাদার

সঙ্গে বড় চাল দিয়ে যাচ্ছ ওই স্নবদের কাছে, তোমার পজিশ্যানটা কি ওদের চোখে? ঘেন্নায় মরা উচিত তোমার।

পৃথিবীর চক্ষে যাহাই হউক অরুণের পজিশ্যান্ নিতুর চক্ষে মনে হইল তুচ্ছ। অথচ অরুণ ফুটবলের-টেনিসের দিকপাল; পজিশ্যানটা তাঁহার বীরু বাঁড়ুজ্জে বা নিতু বাড়ুজ্জের কৃপায় স্থির হয় নাই; ইহা সকলেই বোঝে। কিন্তু কলহ হইল। রাগ করিয়া অরুণ বলিল—সে খড়্গপুর হইতে কলিকাতা ফিরিতেছে। রাগ না করিয়াও নিতু উত্তর দিল—অরুণ আসিয়াছিলই বা কেন?

দুই জনে গাড়ীর দুই প্রান্তে গিয়া বসিল। অরুণ শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল: ঠিক বলছ?—এর পরে অন্য রকম বলবে না তো? নিতু উত্তর দিল না, ফিরিয়াও দেখিল না। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। আড়চোখে একবার দেখিল অরুণ গাড়ীর দুয়ারের নিকটে গিয়া বসিয়াছে। তারপর কয়েক মিনিট গিয়াছে। একটা ষ্টেশন আসিতেছে। গাড়ীর গতি কমিতেছে। সিগন্যাল পার হইয়া গেল গাড়ী, হঠাৎ ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। নিতু মুখ ফিরাইয়া দেখিল দুয়ার খোলা, অরুণ নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিতে পারিল—অরুণ বুঝি লাফাইয়া পড়িল। চেন্ টানিয়া গাড়ী থামাইতে থামাইতে গাড়ী প্রায় ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অরুণ লাফাইয়া পড়িয়াছিল বুদ্ধি করিয়াই। তখন গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইতেছে; ভয়ানক বিপদ ঘটিবারও কথা নয়। কিন্তু পড়িল যখন, পড়িল সিগন্যালের একটা লোহার উপর। তাই পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না—মরিবার ভয় দেখাইতে গিয়া সত্যই মরিবার কাছাকাছি গেল। মাথায় চোট লাগিয়াছে, চৈতন্য নাই। পায়ে চোট লাগিয়াছে বেশ কঠিনই, কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই। এ দিকে খড়্গপুর

রেল্‌ওয়ে হাঁসপাতালে অরুণকে ভরতি করিয়া দিয়াই যে বীরু বাঁড়ুজ্জে নিস্তার পাইবে, তেমন উপায়ও রহিল না। অরুণের ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই, নিতু এক পাও হাঁসপাতাল হইতে নড়িবে না। সে-ই তার করিল মধুখালিতে,—সে তার সেখানে পড়িয়া আছে। তার করিল বেনারসেও অমরকে ;—সে তার পাইয়াই শান্তা যখন আসিল তখন চতুর্থ কি পঞ্চম দিন।

খড়্গপুর হাঁসপাতালে তখন অরুণ উঠিয়া বসিয়াছে, কিন্তু দাঁড়াইবার শক্তি নাই—পায়ের নাকি কঠিন ফ্রাকচারই হইয়াছে। দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ কালো। এরূপ হইবার কথা নয়। নিতুকে সে শুনাইয়া শুনাইয়া জানাইল, মরিলে সে মরিত, তাহাতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু পা'টা ভাঙিবার কথা ছিল না। আর ভাঙিত ত ভাঙিত—হাত ভাঙিতে পারিত—বাঁ হাত। পা না থাকিলে সে খেলিবে কিরূপে? আর, না খেলিলে বাঁচিবে কিরূপে?

শান্তা যাইতে বীরু বাঁচিল,—অবশ্য টেনিস্ সে একাই খেলিবে—খেলিবে সে সিঙ্গলসে, এবার রাঁচিতে। কিন্তু নিতু মেয়েটা যে আর রাঁচিও যাইবে না!—দাদার খেলা দাদাই যাক্। সেখানে ওই চালিয়াৎদের মধ্যে নিতুর যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ঝগড়া ঝাঁটি করিয়া নিতু কলিকাতাতেই ফিরিল, একাই ফিরিল,—সে খবরও শান্তা পায় বারানসীতে। তারপরে আরও চিঠিও সে পায়।

কিন্তু অরুণ আর নিতুর নামোচ্চারণও করে না। প্রথম তাহার দারুণ বিক্ষোভ মনে ছিল রেল কোম্পানির উপর। অমন লোহা লক্কড় লাইনের পাশে না ফেলিয়া রাখিলে অরুণের কিছুই ক্ষতি হইত না, বরং চলতি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিতুকে জব্দ করা যাইত।—নিতু দেখিত—বীরু বাঁড়ুজ্জেও অরুণের হাত-পা ধরিয়া সধাসাধি করিত····

আর নিতু বুঝিত অরুণ কতটা অভিমানী, কতটা নিতুকে ভালোও বাসে।...কিন্তু অরুণের সে প্ল্যানটা একেবারে কাঁচিয়া গেল—এখন পাটা কি চিরজীবনের মত দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে? ক্ষোভ তাহার জমিয়া উঠিতে লাগিল তখন নিতুর বিরুদ্ধে। সে-ই তো অপমানিত করিয়া অরুণকে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িতে বাধ্য করে। শয্যায় শুইয়া শুইয়া অরুণ এখনো বিরক্ত হইয়া উঠে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এই ক্ষোভ বিরক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল—এই মেয়েগুলির এমনি স্বভাব। এখন আবার দিনের পর দিন চিঠি লিখিতেছে তাহাকে, বৌদিদিকেও। যেন তাহার চিঠির উৎকণ্ঠাই অরুণের ভাঙা পায়ের ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে। পা না থাকিলে অরুণ কি করিবে? এমনি শুইয়া বসিয়া কি বাঁশী বাজাইবে? সিনেমার বই পত্র দেখিবে?

অরুণ বাঁশী বাজাইতে লাগিল। কিন্তু পা ও সারিতে লাগিল। সে উঠিতে পারে, চলিতে পারে, কিন্তু ছুটোছুটি, খেলা? না তাহা শীঘ্র পারিবে না। পারিলেও অন্তত দুই চার বৎসর পরে। 'পারিলেও' কথাটা অরুণের প্রাণকে ভাঙিয়া দেয় বুঝি। কিন্তু ডাক্তার ভরসাও দেয়—'একসেলেণ্ট আপনার স্বাস্থ্য, ইয়ংম্যান। সবই ফিরে পাবেন।' হয় ত তাহাই হইবে, কিন্তু তখন যে খেলার অভ্যাস নষ্ট হইয়া যাইবে। 'টেক টু আদার স্পোর্টস্—বিলিয়ার্ড, গল্‌ফ।' ডাক্তার ভরসা দিলেন।

না, আর খেলা নয়, অরুণ বাঁশীই বরং গ্রহণ করিবে; আর ফিল্‌ম্।

৬

বৎসর ঘুরিয়া আসিবার পূর্বেই অশোক জেল হইতে মুক্তি পাইল। হৈমবতী কলিকাতায় অপেক্ষা করিতেছিলেন—অশোকের বন্ধু হিরণ্ময় বিজনের সঙ্গে নৃপেন ও অমিতা গিয়াছে জেলের ফটকে। ফুল কিনিয়া লইয়া যাইতে ভুল করে নাই অমিতা। কিন্তু গাড়ী হইতে আরও বড় ফুলের গার্লেণ্ডও আরো ভালো ফুলের তোড়া লইয়া নামিলেন মিসেস্ মজুমদার ও রেবাদি'। তাঁহাদের দেখিয়া অমিতা খুশী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা যে মালা আর তোড়ার ঐশ্বর্য্যে অমিতাকে হার মানাইবে, ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। অশোক ফটক হইতে বাহির হইতে না হইতেই আগাইয়া গেল তবু ললিতা মজুমদার; তাহাকে ঠেলিয়াই তখন অমিতা সামনে গিয়া পড়িল। দাদাকে ফুলের তোড়াটা আগে দিতে সে পারিবে না, দিবে এই ললিতাদি'? কিন্তু ললিতাও বুঝি শোধ তুলিতে জানে। নিজের গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া দিয়া বলিল: আসুন—

অশোক বলিল: কোথায়?

অমিতা জানাইল: মা বাড়িতে বসে আছেন।

ললিতা অশোককেই হাসিয়া বলিল: মায়ের কাছেই যাব, ভয় নেই। অন্য কোথাও যাবার মতলব আছে নাকি?—ললিতা পরিহাস করে।

নৃপেন ভাবিতেছিল কি বলে। কিন্তু অমিতা তৎপূর্বেই বলিল: জামাইবাবু, তোমার ট্যাক্সি কোথা?

সত্যই ট্যাক্সি বলা ছিল, প্রস্তুতও ছিল। অশোকও হয়ত ব্যাপার বুঝিল: যেখানেই হোক আপনি আর যাবেন কেন, মিসেস মজুমদার? রেবার ত কলেজও আছে। আপনারা বাড়ি যান। আমিই আসব'খন দেখা করতে।

ললিতা বলিল: আমরাই কি মায়ের সঙ্গে দেখা না করে যাব নাকি? জানতাম না যে উনি এসেছেন এখানে—খবরটা দেননি কেন বিজনবাবু? মাসীমাকে আমি গিয়ে নিয়ে আস্তাম এখানে।

নৃপেন বলিল: তিনি আস্তে চাইলেন না।

ললিতা মানিলই না এই কথা: অশোকবাবু মুক্তি পাচ্ছেন, মা সে জন্যই কলকাতা এসে বসে আছেন, আর এখানে আসতে চাইতেন না?

হৈমবতীও বসিয়া বসিয়া শুনিলেন এই কথা ললিতার মুখেই—সেই কয় মিনিটের মধ্যেই। সত্যই তো, তিনি গেলেন না কেন জেল ফটকে? যান নাই—নৃপেনের তাহাতে বিশেষ উৎসাহ নয় বলিয়া। নৃপেন কি বলিতে চাহে—হৈম শুধু নিজের চিকিৎসার জন্যই আসিয়াছেন কলিকাতায়? যেন হাতপা বাতে আর কাহারও ধরে না। তাহা যেন এমন মারাত্মক অসুখ! এমন কি অসুখ পৃথিবীতে আছে যে, অশোককেও হৈম তাহার জ্বালায় দেখিতে যাইতে পারিবেন না! ইহারা বুঝিবে না এই সত্য। বুঝিয়াছে বরং ললিতা—হোক সে জংলী, তবু সে সন্তানের মাতা, তাই সে বুঝিয়াছে হৈমর মনের কথা।

অমিতা ও নৃপেন্ বিরক্তচিত্ত ললিতার বিরুদ্ধে।—হৈম'র কিন্তু ললিতাকে আজ ভালো লাগিয়াছে। বেশ মেয়ে ললিতা, বেশ মেয়ে রেবাও। ইহারই জন্য বুঝি সেই অরুণের বন্ধু বীরু বাঁড়ুজ্জে পাগল? তা হউক। অশোককে সত্যই উহারা সম্মান করে,—হৈমকেও উহারা মান্যগণ্য করে। অবশ্য উহাদের সমাজ চাল-চলন জীবন-যাত্রা এক ধরণের, আর হৈম'র ঘর-সংসার অন্য ধরণের। 'উহারা কলিকাতার লোক, পদস্থ, চালও আছে। আর নৃপেন যতই চাল দিক ইহাদের সম্মুখে—আসলে তাহারা বাঙাল, মধ্যবিত্ত, ব্যবসাপত্রে হয়ত সম্প্রতি নৃপেন এখানে ভালো করিতেছে। সরযূ সুখী হউক!

অশোক জানিত—কাগজ ও ছাপাখানার কোনো কাজই আসলে নৃপেন এখনো দেখিতে পারে নাই। জেলেই অশোক শুনিয়াছিল—কাগজটা কয় মাসের মধ্যে উঠিয়া যাইতেছিল, লিখিবার লোক নাই। হিরণ্ময় কয়দিন মাতামাতি করিয়া পলাইয়াছে। বিজন আপনার কাগজের সঙ্গে এক সঙ্গে গাঁথিয়া এখনো তাহা নামেমাত্র জীয়াইয়া রাখিয়াছে। অশোক আসিলে আবার 'অভিযান' স্বতন্ত্র চলিবে, ততদিন 'প্রভাতী ও অভিযান' এক সঙ্গে প্রকাশিত হইবে। ছাপাখানার কাজ মোটামুটি চলিয়াছে। টাকাকড়ি বাকী আছে, দেনা আছে, শোধ হইবে। যথাসাধ্য বিজনই তাহা দেখে। কিন্তু 'প্রভাতীকে' একটু খাড়া করিতে গিয়া এদিকে সেও মনযোগ দিয়াছে কম। 'প্রভাতী' অবশ্য সিনেমার বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য সুবিধা লইযা এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিজনের চোখা-চোখা কলমের খোঁচাতে আর বেপরোয়া কালি ছিটানোতে কংগ্রেসের ইউনিভারসিটির মহারথীরা বিপর্য্যস্ত। তাহাতে হিরণ্ময়ের আপত্তি, কিন্তু সাধারণ মানুষ মজা পাইতেছে—বেশ ত! বিজনও মজা পাইয়াছে, এবার আসর জমিবে। সিনেমার, সাহিত্যের, রাজনীতির, বিদ্রূপ রসিকতার আড্ডা—অশোক এখানে এবার বসিয়া যাউক,—আর ও রাজনীতি; সাম্যবাদ, ধর্মঘট নয়। হাঁ, হীরেন্দ্র চক্রবর্তী কি বলিতে আসিয়াছিল বিজনকে। বিজন তাহাকে বলিয়াছে,—'ও সব রাখুন। এতদিন পরে দেশে এসেছেন, দেশটাকে চিনে নিন্ আগে।'

কিন্তু মজার খবর আছে। নৃপেন অমনি অশোককে বলিল: হীরেন্দ্র চক্রবর্তী বিয়ে করেছেন দিন পনের আগে। হাঁ হে, তোমাদের স্বদেশী 'দাদা' হীরেন্দ্র—আজীবন ব্রহ্মচারী, চিরকুমার। বিয়ে করেছেন কাকে? তোমাদের বাড়িতে সেই ইন্দুমতী ছিল না? সেই বিধবা মেয়েটাকে।

হৈমবতী জানাইলেন, ঠিকই। মাস দেড়েক আগে চিত্রিসারের দিকে জেলে ও চাষীদের কি কাজ লইয়া হীরেন্দ্র গিয়াছিল। কাদম্বিনীর নিকটে যায় দেখা করিতে হয়। তারপর কথাবর্তা হয় কাদম্বিনীর সহিত। অমরের বিবাহের সময় হইতেই কাদম্বিনীর কেমন মনে হইয়াছিল—ইন্দুমতীব তিনি বিবাহ দেন। কাদম্বিনীই তাহা জ্ঞানকেও লিখেন। জ্ঞান বিধবা বিবাহের পক্ষে। দুই একটা বিবাহ নিজে উপস্থিত থাকিয়াও সম্পাদন কবাইয়াছেন। সমাজ-সংস্কার তাঁহাদের হিন্দুসভার ঝোঁক। কিন্তু ইন্দুমতীই তখন রাজী হইল না। না হইলে হৈম মনোজের কথা ভাবিয়াছিল। ইন্দুমতী তখন কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছিল। পড়াশুনা করিয়া এবার সে ট্রেনিং পাশ করিয়াছে। কর্পোরেশন স্কুলে সে শিক্ষয়িত্রী হইয়াছে। হীরেন্দ্রকে সে বিবাহ করিতে রাজী হইল। হীরেন্দ্র আবাব তিন আইনে ছাড়া বিবাহ করিবে না। বলে, 'ঠাকুর দেবতায় কি হবে?' ইহা কিন্তু জ্ঞান চৌধুরীর মনঃপূত হয় নাই।

বিজন রসাইয়া বলিল: হীরেন্দ্র চক্রবত্তির ও বিবাহ নূতন নয়। আর ইন্দুমতীর ত বিবাহ নূতন নয়ই।

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার হইল। হীরেন্দ্র নিজেই বলিয়াছে—রুশিয়াতে সে বিবাহ করিয়াছিল সে দেশীয়া মেয়ে। একটি ছেলেও আছে, হীরেনোভিচ নিকোলাই।

বিজন রঙ্গকুশল, বলিল: রুশিয়াতে কেন?—ওরা সাম্যবাদী, দেশে দেশে 'কলত্রাণী'। এ ওয়াইফ এট এভরি পোর্ট—জাহাজীদের মত।

অশোক দমিল না।—তা এক সঙ্গে কয়টি?—সাড়ে সাত শ' দশরথ রাজার মত'? অন্তত চারটি—পবিত্র কোরান মত'? যাই করুক্ যে, আমাদের হিন্দুদের কাছে কিছু নয়।

অশোকের নিকট ললিতার বড় প্রয়োজন। বিকালেই সে আবার আসিল। ঝোঁক চাপিয়াছিল—দেশের কাজ করিবে। বড়দিনে এবার কলিকাতাতেই কংগ্রেস ; তাই কলিকাতায় এখন উদ্যোগ চলিয়াছে। পদস্থ লোকদের বাড়িতে যত কংগ্রেস নেতা ও নেত্রীদের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। মিসেস মজুমদার তাহাদের নূতন সহযোগী—অবস্থাপন্ন মহিলা তিনি। অশোককে তাই ললিতাও পাইয়া বসিল।

যাক্, এতদিনে আপনি এলেন। আমি ভাবছি কবে আসেন!

তাহার এত ভাবনার কারণ কি?—'স্বদেশী' সম্বন্ধে সে অশোকের পরামর্শ ও সহায়তা চায়;—সেখানে অপরের কথা তাহার নিকট অচল। কিন্তু অশোকও তো তদ্রূপই—স্বদেশীর সে কি জানে?

জানেন না? ও সব বাজে কথা ছাড়ুন। সুভাষবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই?

নেই।

বেশ, সেন গুপ্ত'র সঙ্গে তো আপনার তা হলে পরিচয়—

কস্মিন্‌কালেও না।

আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন।

কিন্তু সত্যই বড় বড় কংগ্রেসওয়ালাদের সঙ্গে অশোকের পরিচয় প্রায় নাই। সে পরিচয় আছে তাহার সুহৃদ্ বিজয়দা'র। বিজয় কলিকাতায় থাকে না। কিন্তু ললিতাকেও ঠেকানো যাইবে না। সে অশোককে বলিল: বেশ, একটা কাজের প্রোগ্রাম করে দিন।

কি কাজ, কাদের কাজ,—বলুন তো?

কংগ্রেস আসছে। মেয়েদের একটা সংগঠন করা প্রয়োজন।

তার আমি কি জানি?

আপনিই জানেন।

অশোকও মানে না, ললিতাও ছাড়ে না। নিজ বাড়িতে সে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল ভাই বোন্‌কে।

রেবাও আসিল সেই নিমন্ত্রণে। আর মিষ্টার মজুমদার বেশ সহজ গল্পে পরিচয় জমাইয়া তুলিলেন। কিন্তু ললিতা ভুলিল না;—প্রোগ্রাম এবার করে দিন, অশোকবাবু। রেবাও তাহার সহিত যোগ দিল। অমিতা গর্ববোধ করিতেছিল দাদার গৌরবে। সেও বলিল: দাও না, দাদা।

অশোক বলিল: মেয়েদের যে কি কাজ, তাই আমি জানি না। তার প্রোগ্রাম করব কি করে?

মিসেস মজুমদার অমনি বলিল: কেন জানেন না? দেশটা কি শুধু ছেলেদের? মেয়েদের নয়?

দেশ যে কার, তা বুঝি না। কর্তৃত্ব হিসাবে দেখলে—দেশ ইংরেজের। আর কাজের হিসাবে দেখলে—দেশ চাষী ও মজুরের। আর দেশোদ্ধারের হুজুগের দিক থেকে দেখলে মনে হয়—দেশ বুঝি জন কয় ইংরেজি-জানা মধ্যবিত্তের।

আলোচনা একটা বিশেষ দিকে চলিল—দেশের মানুষ বলিবে কাহাকে? আসল লোক ত দেশের মজুর-চাষী, অন্যেরা কে? মিষ্টার মজুমদার অবশ্য এই কথা মানিবেন না। কিন্তু মিসেস মজুমদার আবার এই কথা বারো আনি মানে। কারণ, নেতাদের উপর তাহার বিশ্বাস নাই, নেত্রীদের উপর বিশ্বাস আরও কম; তাহার বিশ্বাস বরং ছাত্রদের উপর, যুবকদের উপর।

অমি' আবৃত্তি করিয়া ফেলিল—'আমরা ছাত্র দল।'

অশোক হাসিতে লাগিল।—ভদ্রলোকের দু' দশটি ছেলে; তাদের দায়ও নেই, দায়িত্বও নেই। বাপ-মা খরচপত্র দেয় যত দিন তত দিন হৈ-চৈ করে।—তারপর চাকরি পেলে বাঁচে, না পেলে

তার ধান্ধায় ঘোরে। তাদের সঙ্গে তবে দেশের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কি?

সাধারণ মানুষটা কে?—মিষ্টার মজুমদার জিজ্ঞাসা করেন।—মজুর-চাষী? তিনি ইঞ্জীনিয়ার মানুষ। আজীবন মিস্ত্রি মজুরদের লইয়াই কাজ করিতেছেন। তিনি মজুর চাষীদের চিনেন একেবারে হাড়ে হাড়ে। তাহাদের অত মাথা ব্যথা নাই যে, স্বরাজ চাহিবে, স্বাধীনতার জন্য মরিবে। ফাঁকি দিয়া কিছুটা কামাইতে পারিলেই তাহারা খুশী। এই ফাঁকিই হইল আমাদের জাতীয় ব্যাধি। আর এই জিনিষটিই সাহেবদের মধ্যে নাই।

মিসেস্ মজুমদার এই আলোচনাও শুনিতে চাহে না। সাহেবদের মতো অনেক গুণই আমাদের নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তাহাদের গোলামি করিব নাকি?—ললিতা বলে: দিন্, অশোকবাবু, মেয়েদের কাজের একটা প্রোগ্রাম করে দিন্।

মেয়েদের ও ছেলেদের আবার পৃথক প্রোগ্রাম হয় না কি?

হয় না? মেয়েদের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্বও আছে যে।

অশোক বলিল: ওঃ সে প্রোগ্রাম! বেশ, তা হলে আর ভাবনা কি? 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' কিংবা 'কাউন্সিল্ অব্ উম্যান্' প্রভৃতির কাগজ-পত্র আনিয়ে নিন্'—স্ত্রী শিক্ষা, সন্তান পালন, সব কিছু তাতেই আছে।

মিসেস্ মজুমদার শেষ পর্যন্ত নিরাশ হইল। অশোক বাবু বলিলেন কিনা—মেয়েদের কোনো বিশেষ প্রোগ্রামের প্রয়োজন নাই, ট্রেড ইউনিয়নেই তাহারা কাজ করিবে। দেশের বঞ্চিত মানুষের দাবী ও সংগ্রামেই মেয়েদেরও দাবী পূরণ হইবে।

অমিতাও বিরক্ত হইল—দাদা দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বিশ্বাসও

করেন না। অশোক বলিল: স্বরাজের সর্বাগ্রে 'স্ব',—নেতাদের থেকে এই শিক্ষাটি বুঝে নিলে তবেই হতে পারবে খাঁটি স্বরাজ কর্মী।

এবারকার কংগ্রেস যেন পুরীর রথ। গাড়ী বোঝাই লোক চলিয়াছে। জ্ঞানশঙ্কর নিজের ও হৈমর চিকিৎসার জন্যই কলিকাতা যাইবেন, অশোকের মুক্তির পর তাহার ছাপাখানা ও নৃপেনের ব্যবসাপত্রও একবার দেখিয়া আসিবেন। একবার বিশ্রামও তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু কাজ কর্ম ছাড়িয়া বিশ্রাম করিবার মত তাঁহার সাধ্য কোথায়? অবস্থা তাঁহার তত স্বচ্ছল নয়, কিন্তু বয়স তাহা বুঝিবে কেন? রক্তের চাপ তাহা মানিবে কেন? জ্ঞান চৌধুরীও জানেন—অনেক সময়েই তিনি কেমন শ্রান্ত বোধ করেন। অবশ্য তিনিও তাহা মানিতে চাহেন না, কাজ করিয়া যান। কিন্তু কাজও আসলে বিশেষ করা সম্ভব হয় না। পূর্বে তিনি রাত্রি জাগিয়া পড়িতেন—পড়িতে পড়িতে রাত্রি গভীর হইত। এখন রাত্রিতে পড়িতে গেলেই মাথা গরম হইয়া উঠে। সেই সুনিদ্রাই বা কোথায় গেল জ্ঞানশঙ্করের? বেলা আটটার আগে তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন না। কিন্তু ক্রমে সে গভীর নিদ্রা হালকা হইয়া আসিয়াছে; এখন আর শেষ রাত্রি হইতে ঘুম হয় না, রাত্রিতেও বারে বারে ঘুম ভাঙিয়া যায়। অথচ দিনে কোর্টেও কখনো কখনো ঘুম পায়। অপর পক্ষের উকিল কি বলিতেছে তাহা সময়ে সময়ে কানে যায় না, তিনি ঝিমাইতে থাকেন—হাকিমের মত। পূর্বে এইরূপ অবস্থা তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। এখন নিজে লজ্জিত হইয়া হঠাৎ দেখেন—কি কথা হইতেছে শোনেন নাই,—তিনি বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন। মক্কেলেরাও ইহা জানে কি? জ্ঞানশঙ্কর আশা করেন—হয়ত তাহারা দেখে নাই; আর

তাহার জুনিয়র নিশ্চয়ই নোট লইয়াছে। তারপর জ্ঞান চৌধুরী বলিতে দাঁড়াইলে দুই মিনিটেই মক্কেল উকিল হাকিম সকলেই বুঝিবে কিছুই তাঁহার কান এড়ায় নাই। কিন্তু মুশকিল এই, তেমন ভালো সওয়াল করিবার মত মামলাও এখন আসে কম। সব পুরাতন কথা, নূতন নজির যুক্তি দুই মিনিটেই বলা শেষ হইয়া যায়—জ্ঞানশঙ্কর মামলায় পূর্বের মত আর উৎসাহ পান না। ভালো কিছু না পাইলে উৎসাহের সঞ্চার হইবে কিরূপে? তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠ কি করিয়া আর ঘর মুখরিত করিবে? তাঁহার ভাষায় তেমন ধার খেলে না, যুক্তিতে তেমন কৌতুক বিচ্ছুরিত হয় না। এদিকে বার লাইব্রেরীতেও এখন সব চ্যাংড়ারা আসিয়াছে, আগেকার মত স্বচ্ছন্দে হাস্য পরিহাস করিতে জ্ঞান চৌধুরী কুণ্ঠিত হন। সেবৎসর হিন্দু মুসলমানের বিরোধের পর হইতেই তিনি সেখানে আর বসিতে চাহিতেন না। গণেশ এখন সেখানে হিন্দুদের লইয়া আড্ডা জমায়, ফজল আলী মুসলমানদের লইয়া বসে;—যেন দুইটা শত্রু শিবির। জ্ঞান চৌধুরী ও খাঁ বাহাদুরের স্থান কোথাও নাই। আর, পান-তামাক থুতু কাসি গয়ের চারিদিকে ছড়াইয়া যে সব নূতন হিন্দু-মুসলমান উকিল যে সব মক্কেলের সঙ্গে চাচা-নানা মামা-খুড়া সম্পর্ক পাতায়, তাহা দেখিলে জ্ঞান চৌধুরীর এখন এই ব্যবসায়ের উপরেও আর শ্রদ্ধা থাকে না। মনে পড়ে চল্লিশ বৎসর আগে যাদব সেন এখানে বসিতেন—প্রথম ইংরেজি জানা উকিল তিনি। কী ছিল তাঁহার প্রতাপ! তাঁহারও পূর্বে এখানে ওকালতি করিতেন হরগোবিন্দ রায়, দুর্গাদাস দত্ত। চার বেহারার পাল্কীতে চড়িয়া তাঁহারা আদালতে আসিতেন, ভয়ে পথের লোক কাঁপিত। বারান্দা ছাড়াইয়া ভিতরেও সেদিনে মক্কেল আসিতে পারিত না—বাবুদের গুড়-গুড়ির জল নষ্ট হইবে যে। কত মামলার রায় সেদিনে এখানে বসিয়াই হাকিমেরাও মুখে মুখে শেষ করিতেন। যাদব

সেনের চোগা-চাপকান মাথার শামলা, গর্বব্যঞ্জক গতি এখনো মনে পড়ে জ্ঞান চৌধুরীর। আর আজ উকিলেরা সিগারেট এ উহার মুখ হইতে লইয়া কাড়াকাড়ি করে; মক্কেলের মুখ হইতে হুঁকা লইয়া সে হুঁকা টানিতে থাকে, পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরের কোনেই ফেলে পিক্, আর ময়লা কলারের উপর বিচিত্র টাই আঁটিয়া সাজে সাহেব। শামলা উঠিয়া গিয়াছে; চাপকানও জ্ঞানশঙ্করদের সঙ্গেই যাইবে; সেই গলাবন্ধ পার্শী কোটও বুঝি টিঁকিবে না।—সুরেন্দ্রনাথের দিন গিয়াছে, ফিরোজশাহ মেহটার, শিবনাথ শাস্ত্রীর দিনও গিয়াছে, আসিয়াছে চুনোগলির ফিরিঙ্গিয়ানার দিন।—ইহার মধ্যে জ্ঞানশঙ্কর বসিয়া আর কতটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবেন? মুখে আপনা হইতে কৌতুককর প্রশ্ন আর উত্তর এখনো আসিতে চায়। তিনি তাহা সম্বরণ করেন। বলিয়া কি দরকার? আর বলিলেই কি বুঝিবে ইহারা? ডন্ কুইকসোট ও সাংকো পাঞ্জার নামও ইহারা শোনে নাই, 'টিলটিং দি উইণ্ড মিল' বুঝিবে কিরূপে? স্যাম্ ওয়ালার বা পিক্‌উইকের প্রত্নতত্ত্ব ইহাদের অজ্ঞাত। ইলায়ার সঙ্গে পরিচয় তো দুরাশাই, হয়ত ফলষ্টাফের নামও অধিকাংশের জানা নাই। জ্ঞানশঙ্করের পক্ষে তবু যাহা কিছু আলাপ আনন্দ তাহা এখনো লাভ করা সম্ভব হয়—পুরাতন বন্ধুরা আছেন বলিয়া। আর এই নূতন ভাড়াটে বাড়িতে এখনো বৈঠকখানার আড্ডাটা সন্ধ্যাবেলা মনোজ, বিজয় প্রভৃতি জমাইয়া রাখে বলিয়া। বাত সত্ত্বেও শরৎ এখনো প্রায়ই আসেন, কিন্তু মনোজ বিজয়ই আসলে তাঁহার প্রধান সুহৃদ।

বড়দিনের ছুটিটায় তবু হৈমবতীকে কলিকাতায় ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া আনা প্রয়োজন। হাতটায় বাত আসিতেছে হৈম'র। আর, জ্ঞানও একবার ঘুরিয়া আসিবেন।

বিজয় বলিল : আপনাকে কংগ্রেসের ডেলিগেট্ করে নিই।

আমি কংগ্রেসের সভ্যও নই যে।

মত দিন—সভ্য হবেন, ডেলিগেট হবেন। কলকাতা যাবেন, আর কংগ্রেস দেখবেন না ?

তোমরা ডেলিগেট হও। আমাকে হিন্দুদের পক্ষ থেকে করেছে অল্ পার্টিস্ কন্‌ফারেনসের ডেলিগেট্। তা'ই যথেষ্ট। পারি ত কংগ্রেস দেখব।

বিজয় হৈমকে ডেলিগেট করিতে চাহে। জ্ঞান চৌধুরী হাসেন—হৈমবতী কি বুঝিবেন কংগ্রেসের ?

বিজয় বলিল : কেন, তিনি অশোকের মা, ইন্দি'র মা।

সত্যই কলিকাতায় বিপুল ব্যাপার। সকলেই এত ব্যস্ত যে হৈমবতীর চিকিৎসার ব্যবস্থাই প্রায় হয় না। অশোকের ত কোনো কালে অবকাশ নাই, বাড়িতে সে প্রায় থাকে না। সুমন্ত্র আসিয়া একবার তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া গেল। সে ভলেন্টিয়ারের একজন ছোটখাটো অফিসার, সুভাষবাব জি, ও, সি ; ভয়ানক তাহাদের উৎসাহ। ইন্দি' অমি'ও নাকি মহিলা ভলেন্টিয়ার—ইন্দি' তাই ছুটির আগেই কলিকাতায় আসে। বাড়িতে তাহাদের প্রায় দেখাই নাই। অরুণ বলে, 'দেশোদ্ধার করছে।' জ্ঞান চৌধুরী কৌতুক বোধ করেন। হৈমবতী বলেন : বাড়ি আসতেও পারে না ? এমন কি কাজ ওদের ?

দ্বিপ্রহরে অমিতা ইন্দিরা আসিল। অমিতা হিসাব দিতে লাগিল কত কাজ।—কত কাজ জানো ?

জানবার কোনো দরকার নেই। ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছ, পড়ো তবে কখন ?

সে তুমি বুঝবে কি ? সুমন্ত্রদের বি-এ পরীক্ষা। রেবাদি'রও বি-এ পরীক্ষা। তারা বলে, 'পরীক্ষার জন্য কি দেশের কাজ করব না।' আর তুমি শোনাতে এসেছ আমাকে পড়াশুনোর কথা। ললিতাদি' রেবাদি' সেই সমস্তক্ষণ ওখানে। রাত্রে যান বাড়ি, আবার ভোর হতেই আসেন, দুপুরের খাবার পর্যন্ত ওখানেই খেয়ে নেন।

তাদেরও ওখানে কাজ ? ললিতারও ?

হবে না। মেয়ে ভলেন্টিয়ারদের দেখা-শুনা, খাওয়া-দাওয়া, স্বাস্থ্য এ সব দেখেন ওঁরা। ওঁর হাতের জলখাবার খেলে বুঝতে—তুমিও ভলেন্টিয়ার হতে চাইতে।

জ্ঞানশঙ্কর সকৌতুকে বলিলেন: বাঃ। তোমার মা ডেলিগেট। ওঁকেই তো তোমাদের 'সেবা' করতে হবে। তবে আর কি ? তুমি কর্ত্রীদের বলো; তুমি এই ডেলিগেট ক্যাম্পের ভার নিলে। তারপরে বাড়ি এসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও দু'জনা।

অমিতা ভয়ানক আপত্তি করিল: সে জন্যই ভলেন্টিয়ার হয়েছি কিনা আমরা ? প্রেসিডেন্টের প্রোসেশনে যেতে হবে, মার্চ করে আসতে হবে; ফ্ল্যাগ-সেলুটেশান্ আছে, তারপরে ক্যাম্প ও প্যাণ্ডেলের কাজ।

ভয়ানক গুরুতর কাজ অমিতার। সে চা না খাইয়াই চলিয়া গেল। এখনি গিয়া 'ফল ইন্' করিতে হইবে।

জ্ঞানশঙ্কর একটু উন্মনা হইলেন। অমিতা আসিল গেল যেন বায়ুগ্রস্ত মানুষের মত। কেবল 'কংগ্রেস,' 'ভলেন্টিয়ার,' এই তাহার মুখে। বড় হইতেছে, তবু অমি' পাগলীই রহিয়া গেল।

হৈম বলিতেছিলেন, চাও খেয়ে গেল না।

অশোক বলিল: ওখানে ঢের ভালো চা খাবে। মিসেস মজুমদারের মত বড় লোকের গৃহিণীরা এখন-কংগ্রেস করছেন, চিন্তা নেই। তবে কংগ্রেস দেউলে হবে এবার ভলেণ্টিয়ার দিয়ে—যা পোষাক পরিচ্ছদ, খাবার ইউনিফর্মের ঘটা। আউট এণ্ড আউট্ বুর্জোয়া।

জ্ঞানশঙ্কর জানিতেন,—আরও ভালো করিয়া বুঝিলেন,—অশোক কংগ্রেসের এই হৈ-চৈ'র মধ্যে নাই। তবে সে কি করিতেছে? তাহার ঘরেও নানা লোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসে, তর্ক-বিতর্ক হয়। পোষাক পরিচ্ছদে ইহাদের খদ্দরের চিহ্নও নাই। জ্ঞানশঙ্কর না জিজ্ঞাসা করিলেও বুঝিতে পারিলেন—তাহাদের সঙ্গেও অশোকের মতের মিল হয় না।

হীরেন্দ্র দেখা করিতে আসিয়াছিল। জ্ঞানশঙ্কর শুনিয়া আহত হইয়াছিলেন যে, হীরেন্দ্র রুশিয়াতেও এক পত্নী রাখিয়া আসিয়াছে। কথাটা শুনিয়া প্রথম বিশ্রী বোধ হইয়াছিল। কিন্তু পরে বিচার করিয়া বুঝিয়াছেন হীরেন্দ্র ঠিক কাজই করিয়াছে। উহা একটা সাময়িক মোহমাত্র—তাহা আঁকড়াইয়া সে দেশে থাকার কোনো অর্থ হইত না। সে ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতবর্ষে একটা মেম সাহেব লইয়া আসিলে আরও অনর্থ বাড়িত। অবশ্য দশটা বিলাত-ফেরতার মত হীরেন্দ্রও মেম সাহেব বিবাহ করিতে পারে, এই কথাটা জ্ঞানশঙ্কর ঠিক পরিপাক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এক কালের নাম-করা স্বদেশী হীরেন্দ্র; চরিত্রে তাহারা আদর্শ-স্থানীয় ছিল দেশের লোকের চক্ষে। সেই আদর্শচ্যুতিই যে তাহার ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ আর নাই। কিন্তু হীরেন্দ্রের সাহস তেমনি আছে—ইন্দুমতীকে বিবাহ করিতে সে দ্বিধা করিল না; রুশ স্ত্রীর কথাও সে সহজ ভাবেই স্বীকার করে। পূর্বেকার সেই চারিত্রিক গাম্ভীর্য নাই, কিন্তু কোনরূপ কুণ্ঠা বা পাপবোধও নাই। সহজ ভাবেই ইন্দুকে লইয়া

কলিকাতার অভাব অনটনের জীবনও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইন্দু কর্পোরেশনে পায় পঞ্চাশ টাকা, আর হীরেন্দ্র করে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।

জ্ঞানশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দুকে নিয়ে এলে না কেন, হীরেন্দ্র?

হীরেন্দ্র হাসিল, বলিল: আমি ত নানা কাজে ঘুরি। ওকে বল্‌লাম, তুমি যাও দেখা করে এসো। তা ওর আবার আপনাদের নিকট লজ্জা। আমি বলি, লজ্জা যত করবে লজ্জা তত বাড়বে।

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: লজ্জার কি?

হীরেন্দ্র বলিল: এ দেশে বিয়েতেই লজ্জা। বিধবার বিয়ে ত প্রায় কলঙ্কের কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ত সরল হয়ে ওঠেনি এখনো।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি করিয়া সরল হয়—হীরেন্দ্রের সঙ্গে জ্ঞানশঙ্করের সেই কথা হইতেছিল। হীরেন্দ্র অবশ্য বল্‌শেভিকদের নীতি ও ব্যবস্থাই বলিতেছিল। জ্ঞানশঙ্কর তাহা কতকটা মানেন না, কতকটা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তবু হীরেন্দ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ ভালো লাগিতেছিল। এদিকে বিজয়ের সঙ্গে ততক্ষণে অশোক তাহার নিজের নিয়মে কলহ বাধাইয়া তুলিয়াছে। হৈমবতীকে বিজয় বলিতেছিল —জ্ঞানের চিকিৎসার জন্য বড় ডাক্তারদের আলোচনা করা এখন সম্ভব হইবে না; তাঁহারা সকলেই কংগ্রেসে।

অশোক অমনি ফোঁড়ন দিল: মজুরি পুষিয়ে যাচ্ছে সেখানেই।

বিজয় ক্রুদ্ধ হইল: তার মানে? কি বল্‌তে চাও তুমি?

চাপা ব্যঙ্গের সহিত অশোক বলিল: কি বলব? কংগ্রেসে ত টাকা কম ওঠেনি। রোজকার নিজের না হোক্, দশজন আত্মীয় কুটুম্বের ত ঠিকাদারী জুটছে।

তোমার লজ্জা করে না বল্‌তে এসব? ওঁরা দিবারাত্রি খাটছেন, অকাতরে টাকা দিচ্ছেন,—আর তোমার মত লোকেরা এসব রটাচ্ছ।

হীরেন্দ্র বিজয়কে বাধা দিল: তারা ব্যক্তিগতভাবে কিছু না হয় পান না, চানও না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মুনাফা ত তবু যাবে তাঁদেরই বন্ধুবান্ধব স্ব-শ্রেণীরই হাতে। এই আয়োজনে ওঁদের লাভ কি জানো? প্রথমত, 'নিঃস্বার্থ দেশ সেবার' ধুয়ায় সাধারণ মানুষের মনে নিজেদের শ্রেণীর ও দলের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করা। দ্বিতীয়ত, সেই ধুয়ার সুযোগে নিজ নিজ পশার-প্রতিপত্তি বাড়ানো। তৃতীয়ত, তোমাদের এই সাধারণের ব্যয়ে গঠিত মধ্যবিত্তের ভলেণ্টিয়ার কোরটি পাকা করে তা চেকোশ্লোভাকিয়ার সোকোল বা মুসোলিনির ফ্যাসিস্তদের মত মজুরদের বিরুদ্ধে ভদ্রশ্রেণীর সেনাবাহিনী হিসাবে গড়া।

জ্ঞানশঙ্কর ভালো করিয়া জানেন না—ফ্যাশিজম্ কি। মুসোলিনি যদি প্রাচীন রোমের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়া থাকেন তবে ত তিনি মহৎ কার্য্যই করিতেছেন। ইংরেজদের প্রচার শুনিয়া তাঁহাকে একটা স্বেচ্ছাতন্ত্রের অধিনায়ক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। অবশ্য ক্রোচে ও সিনর নিত্তি প্রভৃতি মনস্বীদের সাক্ষ্যও অবিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু বিজয়ের অত বিচার বিবেচনা করিবার মত ইচ্ছা নাই। সে জানে মুসোলিনি একটা দস্যুস্বভাবের এক-নায়ক—হয়ত এইরূপই ষ্টালিন, ট্রট্স্কিও। ইহারা কর্মী, দুর্ধর্ষ পুরুষ। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় নেতাদের তাহাদের সহিত তুলনা করা চলে না। সে বলিল: তুমি ত জানো হীরেনদা,' গান্ধী জওহরলাল সুভাষবাবু সবাই মজুরের সপক্ষে। ত্যাখো না, অশোকেরাই কি 'নেশান' কাগজে রুশিয়ার প্রোপাগোণ্ডা কম করছে?

হীরেন্দ্র বলিল: যতক্ষণ মজুরের শক্তি কম ততক্ষণ 'নেশনের' কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেসের নেতারা মজুরের এরূপ মুরুব্বি সাজবেন,

—বিলিতী আমলাতন্ত্র ও বিলিতী কলওয়ালার বিরুদ্ধে এদের নিজেদেরই স্বার্থে উস্‌কিয়ে দেবেন।

অশোক বলিল: যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ আছে, ততক্ষণ একটা সহযোগিতা কংগ্রেসের সঙ্গে করা চলে—কংগ্রেস যদি সত্যই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হয়। সাইমন কমিশনারের বিপক্ষে যেমন আমরা 'এক সঙ্গে দাঁড়িয়েছি।

বিজয় বলিল: বেশ ত, সেটুকুই করো না তোমারা। অন্তত যতক্ষণ ইংরেজ আছে ততক্ষণ একত্র দাঁড়াও তার বিরুদ্ধে।

হীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল: বিজয়, কথাটা অত সহজ নয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দাঁড়াবে কতটুকু?—দেখছ না, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসেই তারা সন্তুষ্ট; স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য নয়। মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে ছাড়া স্বাধীনতার সংগ্রাম সত্যই পরিচালনা করা যায় না, স্বাধীনতাও লাভ করা যায় না।

এতদিন তবে কারা করেছে সে সংগ্রাম—১৯০৫ থেকে?

তারা মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত। তাই তারা প্রাণ দিলেও স্বাধীনতা সংগ্রাম বেশি ব্যাপক হয়নি। তারপর এসেছেন কংগ্রেস-কর্তারা—মাত্র আট বৎসর ধরে। তাঁরা প্রাণ দেন না; ইংরেজকে চাপ দিয়ে কিছুটা ক্ষমতা নিজেদের জন্য আদায় করতে চান। বরং গণ-আন্দোলনের ব্যাপক সম্ভাবনাকে নানা চালে তাঁরা বন্ধ করেন—ইউ-পি'র 'ঐক্য' আন্দোলনকে তা করেছেন। খাজনা বন্ধের কথা উঠতে না উঠতেই বারদৌলি প্রস্তাবে গান্ধীজী একেবারে তার মুলোচ্ছেদ করেছিলেন। এতগুলি কুলি ষ্ট্রাইক্‌, রেলওয়ে ষ্ট্রাইক্‌, চটকলের ষ্ট্রাইক্‌—সব কিছুকে ওঁরা বানচাল করে দিচ্ছেন।—চিয়াং কাইশেক যা করছে এখন সাংহাই-এ, তা'ই তাঁরাও করবে এদেশে। আর তোমরা পুরনো 'স্বদেশীরা'—

যতই যা বলো তোমরা—পেটি বুর্জোয়ার শ্রেণী-নিয়মে তোমরা তাদেরই দলে গিয়ে জুটবে—'ছোটলোক' মুটে মজুরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না ভদ্রলোকের ছেলেরা। এমনি জিনিস শ্রেণীর-স্বার্থ।

এবার বিজয় রাগ করিল: কি আমাদের শ্রেণী-স্বার্থ বলো ত? কারো দু'দশ বিঘা জমি, কারো দু'দশ টাকার মহাজনী। অধিকাংশের তাও নেই—পরিশ্রম করেই ভাত-কাপড় যোগাড় করতে হয়। তবু এ লোভেই ভুলে যাব আমরা আমাদের আদর্শ? মা-বাপের মমতা কাটাতে পারে, লেখাপড়া, মান মর্য্যাদা, বড় মানুষির লোভ কাটাতে পারে, প্রাণ দিতে পারে ফাঁসিকাঠে ঝুলে—আর পারবে না তারা ওই দু' দশটাকা মুনাফার লোভ কাটাতে, না? তুমিও ত 'স্বদেশী' ছিলে, এই কি তুমি বুঝেছ সেই স্বদেশীদের?

জ্ঞানশঙ্কর এতক্ষণ কোন কথায় যোগদান করেন নাই। কিন্তু বিজয়ের কথায় তিনি আনন্দিত হইলেন। তবে বিজয় কথাটা ঠিক মত বলিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই তিনি হীরেন্দ্রকে বলিলেন:

হীরেন্দ্র, ইউরোপে পেটি বুর্জোয়া কাকে বলে সে তুমিই জানো। কিন্তু বাঙলার ভদ্রলোক আর সেই ইউরোপের পেটি বুর্জোয়া এক বস্তু নয়—এইটা মনে রেখো। দোষ-গুণ আমাদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা ভিন্ন ধরণের। ছাখো, 'মুনাফার' অপেক্ষা 'ভদ্রতা' আমাদের পক্ষে একটা বড় জিনিস। তা ছাড়া, টাকা পেলেও আমরা সব কাজ করতে চাই না। এ দোষের কথাও। কিন্তু সাধারণ ভাবে, আমরা কেরানী হতে চাই, তবু ব্যবসায়ী হতে চাই না। আবার, বরং পরের গলগ্রহ হব, তবু ষ্টেশনে গিয়ে মুটের কাজ করব না। কায়িক পরিশ্রমের কাজকে আমরা বহু শতাব্দী ধরে হীন কাজ বলে ভাবি। মানসিক পরিশ্রমের কাজকে আমরা গৌরব দিই। অন্তত হাজার বৎসর ধরে

বাঙলা দেশে আমরা বামুন কায়েৎ এরকম ভাবেই জীবন যাপন করছি। এর দোষ অনেক, কিন্তু বনিয়াদ খাঁটি। সে বনিয়াদ আমাদের জীবন-যাত্রা, এথোস্: একটা আধ্যাত্মিক মানসিক পরিমার্জনার সঙ্গে একটা সুস্থ সবল জীবন-বিন্যাস এখানে রচিত হয়েছিল। এমন সত্যকার আভিজাত্য ঐতিহ্য বড় বেশি জাতির নেই।

হীরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই নিজেকে সংযত করিল। বলিল: মূলগত কোনো তফাৎ নেই। সমাজ মোটামুটি একই দিকে এগোচ্ছে—ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে। অবস্থা ও ব্যবস্থা যে পালটে যাচ্ছে, তাওত দেখছি। তবে নানা সূত্রে প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু নিজস্ব ধরণ-ধারণ গড়ে ওঠে, কিন্তু তাও আবার পরিবর্তিত হয়। বাঙলা দেশের ভদ্রলোকেরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কি তার আর্থিক বনিয়াদ,—কি তার মানসিক রীতি পদ্ধতি, আর আগামী দিনে কিই বা তার সম্ভাব্য ভূমিকা,—এসব ভাববার মত'; গবেষণা সাপেক্ষ।

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন: বেশ-ত, তুমি এ গবেষণা করো না?

আমি!—হীরেন্দ্র হাসিয়া উঠিল।—আমার সে বিদ্যা কই? বড় জোর শিখেছি মজুরের সঙ্গে কথা বলতে, তাদের সংগঠন করতে। এ সব লেখাপড়ার কাজ করতে পারে অশোক।

জ্ঞানশঙ্কর আগ্রহান্বিত হইলেন—অশোকের উত্তরের অপেক্ষায়। অশোক কি হীরেন্দ্রের কথা শুনিতেছে? তাহার কাজ লেখাপড়া—হীরেন্দ্রও ইহা বলিতেছে। অশোক কি তাহার সেই প্রতিভাকে, সেই ভবিষ্যৎকে এখনো স্বীকার করিবে? কোথায়, অশোক নীরব যে!

জ্ঞানশঙ্কর দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করিয়া বলিলেন: অশোক! তবেই হয়েছে। বলে গ্যাখোদিকিন্—কৃষক উদ্ধার তা হলে কে করবে?

হীরেন্দ্রও হাসিল। অশোককে বলিল: কেন, অশোক, করবে না?

আপত্তি কি? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এ সব বিচার অনুসন্ধান করো—এ কাজই তোমার।

অশোক বলিল: না, ও আমার যোগ্যতা নেই, রুচিও নেই। আমি বুঝি না—বাঙালী ভদ্রলোকের বৈশিষ্ট্য কি। পুরনো আমলের মহাজনী তালুকদারীও তারা ছাড়েনি,—সবাই আবার চাকরি খোঁজে ও বেকার হয়ে বসে থাকে।—এ যুগে ওদিকে তারা লোন অফিসও গড়ে, শেয়ার কিনে, ছোট ছোট ব্যবসায় চালায়—ও ফেল করে। অর্থাৎ ফরাসী 'রেঁতিয়েরের' মত একটা বিপ্লব-বিরোধী শ্রেণীতে তারা পরিণত হতে চলছে। এমনিতে 'সনাতনী' মনোবৃত্তি আছে, তার উপরে এরা লাভ করেছে 'পাতি বুর্জোয়ার' শ্রেণীগত সকল দুর্বলতা।

অশোককে দিয়া কোনো আশা নাই,—জ্ঞানশঙ্কর আহত হইলেন। অশোক কিছুতেই বুঝিবে না—বাঙালী ভদ্রলোক মাড়োয়াড়ী হইতে পারে না,—দুই একজন সুরেশ্বরের মত ব্যবসায়ী হইতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোক জীবিকার চাপে মরিতেছে, তবু ভদ্রতা ছাড়িতে পারিতেছে না। অশোক কিছুতেই মানিবে না—সেও ভদ্রলোক, আর তাহার স্বধর্ম এই রাজনৈতিক হৈ-চৈ নয়,—সে হীরেন্দ্র নয়, বিজয় নয়,—সে অমরের সগোত্র, মনোজের সতীর্থ, জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর পুত্র—তাহার স্বধর্ম মানসিক পরিশ্রম, সৃষ্টি, আধ্যাত্মিক দান।

কিন্তু কে শুনিবে জ্ঞানশঙ্করের এই কথা?—হীরেন্দ্রের সহিত, বিজয়ের সহিত অশোক তর্কে মাতিয়া উঠিয়াছে। সে কংগ্রেসে বিশ্বাস করে না; অথচ হীরেন্দ্রের সঙ্গেও তাহার মতের সম্পূর্ণ মিল নাই।—শ্রমিক বিপ্লব এত সন্নিকট বলিয়া সে মনে করে না, এখনো সে সম্মিলিত সংগ্রাম চায়। তথাপি হীরেন্দ্রের কথা-মত লেখাপড়ার কাজেও সে আত্মনিয়োগ করিবে না।—হীরেন্দ্রও কি অশোককে কর্ম ক্ষেত্র হইতে

আপাতত দূরে রাখিবার অভিপ্রায়েই এই পরামর্শ দিতেছেন মুনিম খাঁরই মত ?

হীরেন্দ্রের মতবাদ জ্ঞানশঙ্কর বুঝতে পারেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে হীরেন্দ্রের উপর প্রসন্ন হন—সত্যই হীরেন্দ্র অশোকের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে চায়, অশোক লেখক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হউক !

অমর বন্ধুদের সঙ্গে কংগ্রেস ঘুরিয়া বেড়ায়, বেশি খোঁজ-খবর রাখিতে পারে না। সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না—অশোকের হইল কি ? শান্তার সহিতও যে অশোক দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই। হীরেন্দ্র চক্রবর্তীদের দলে খুব মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছে বোধ হয়। কিন্তু তাহার 'অভিযান' কাগজটা সে এখনো প্রকাশ করে নাই। 'নেশনে' সহকারী সম্পাদকতা করিয়া কি ফল ? বেশ, না হয় সাপ্তাহিক পত্র সে আর প্রকাশ না করিল, একখানা উঁচুদরের মাসিকপত্র বাহির করুক। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়এর যুগ গিয়াছে,—এখন দরকার 'ক্রাইটেরিয়ান্', 'এডল্ফির' মত সাহিত্য পত্রের, অন্তত 'লণ্ডন মার্কারির' মত কাগজের। কিন্তু অশোক সেদিকেও উৎসাহী নয়।

জ্ঞানশঙ্করকে লইয়া অমর অলপার্টিজ কন্ফারেন্সে যাইতেছে।

অমর বলিল : চলো, অশোক, কংগ্রেসে না যাও, চলো অল-পার্টিজ কন্ফারেন্সে যাই। এবার সেখানেই আসল কাজ।

সেখানে কাজ কোথায় ? সেখানে হবে বক্তৃতা।

পলিটিক্সে বক্তৃতাটাই কাজ। হয় বক্তৃতা দেবে মজদুর ভাইদের নিকটে, নয় বক্তৃতা দেবে গান্ধীটুপীর নিকটে।

জ্ঞানশঙ্কর ভাবেন—কিন্তু বাগ্মিতা কি তুচ্ছ জিনিস ? তাঁহাদের

দিনে বাগ্মিতা ছিল একটা প্রধান আর্ট। বাঙালী বাগ্মিতার তখন স্বর্ণ যুগ। আর, বাঙ্গালী আজ ইরেজী বলিতেও জানে না! কোথায় সেই লালমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথের রোলিং পীরিয়ড্‌স্‌। সেই সমুদ্র গর্জন আর নাই, গঙ্গার স্বচ্ছ স্রোতও নাই। এখন সব কলের জল, নল খুলিয়া দাও, একই ভাবে ঝরিয়া পড়িবে, একঘেয়ে এক গতিতে। যদি বিপিন পালও দাঁড়াইতেন একবার!

অমরও বক্তৃতা ভালোবাসে। পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ, এ্যানি বেসান্টের বক্তৃতা সে শুনিয়াছে। মিসেস নাইডুর বক্তৃতায় সে বিমুগ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হন—অমর কত ছেলেমানুষ। নেহেরু রিপোর্টের সাম্প্রদায়িক অংশ লইয়াই যত তর্ক বিতর্ক। অমর বলে, যখন ইনি বলেন তখন মনে হয় এঁর কথাই ঠিক। আবার যখন উনি বলেন, তখন মনে হয় ওঁর কথাই ঠিক।'—তারপরে হাসিয়া অমর বলে তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে: যেমন ইনি তেমন উনি! দু'জনাই আসলে জোচ্চোর। নইলে কে কয়টা আসন পাবে তা নিয়ে করে মারামারি, স্বাধীনতার নাম গন্ধ নেই। মিথ্যা কি বলে অশোক—শার্লাটান্‌!

জ্ঞানশঙ্কর দেখিতেছেন—অল্‌ পার্টিজ্‌ কন্‌ফারেন্‌স্‌ ব্যর্থ হইতে চলিল। 'সৎশ্রী অকাল' বলিয়া শিখেরা বাহির হইয়া গেল।

অমর সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া আছে, বলিল: হাজার হোক, মার্শাল রেস্‌!

মিষ্টার জিন্নাহ 'চৌদ্দ দফা' দাবী উত্থাপন করিলেন। জ্ঞান সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন—দাদা ভাই নৌরজীর সেক্রেটারি, তিলকের দক্ষিণ হস্ত এই সেই জিন্নাহ! অসহযোগে কংগ্রেস্‌ ত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগের নেতা হইতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ইহা কিরূপ দাবী?—ইহা কি তাঁহার স্বধর্ম ত্যাগ, না সত্যই স্বধর্মাবিষ্কার?

অমর ততক্ষণ বিজনকে বলিতেছে: বেষ্ট ড্রেস্‌ড্ এম-এল-এ! দেখেছ ত পোষাক, কথার ভঙ্গি! চাঁচা পার্সোনালিটি! দীন শাহ পেটিটের মেয়ে কি আর সহজে ধর্ম ছেড়ে দেয়। সোসাইটির 'রেজ্' সেও, মিসেস জিন্নাহ্।—

'আপনারা কি জিন্নাহ্‌কে চান? এই মুহূর্ত্তেই তাকে পেতে পারেন। কিন্তু আপনারা মুসলমানদের তাতে পাবেন না। আপনারা কি মুসলমানদের চান? তা হলে এই চৌদ্দ দফা গ্রহণ করুন— মুসলমানদের পাবেন, আর পাবেন জিন্নাহকেও।"—সহাস্য স্বচ্ছকণ্ঠে বলিতেছেন মিষ্টার জিন্নাহ্।

সপ্রশংস চক্ষে বলিতেছে অমর: ফিনিশ্‌ড্ স্পীকার। ফিনিশড ম্যানার্স! সুতীক্ষ্ণ পার্সোনালিটি!

জ্ঞানশঙ্কর শূন্য দৃষ্টিতে সভার চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন—ভারতবর্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কল্পনা ভাঙিয়া যাইতেছে। আশা নাই বুঝি, এই জাতি বুঝি কোনো বিষয়েই একমত হইতে পারিবে না। সাইমন্ কমিশনের প্রতিবাদে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখিয়া জ্ঞানশঙ্করের মনে আশা জাগিয়াছিল—বুঝি জাতীয় ঐক্য আবার গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু এইখানে আজ জিন্নাহ'র কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে পুরাতন নৈরাশ্য আবার উদিত হইল।—কি তবে এই জাতির ভবিষ্যৎ? অনৈক্য, আত্মবিরোধ, শেষে থার্টি ইয়ার্স ওয়ার?—

না, না, অত নিরাশারও কারণ নাই সম্ভবত।

অমরের মুখে গল্প আর ধরে না। অশোক তাহা ব্যঙ্গ হাস্যে শোনে। বলে: তা বুঝলাম—বক্তৃতা। কিন্তু ফল হল কি? একমত হয়েছে তারা?

একমত হবে কি করে?—অমর বলিল। আবার সে আরম্ভ করিল জিন্নাহ্‌র কথা, তাঁহার দাবী বিশ্লেষণ আর তাঁহার ব্যক্তিত্ব-ব্যাখ্যা।

অশোক শুনিয়া শেষ পর্যন্ত বলিল: আসল সংঘাত চাপা দিতে গেলে সংঘাত এমনি ভাবে ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসে—কদর্যরূপে।

আসল সমস্যাটা—শ্রেণী সংগ্রাম,—অমর তাহা জানে। কিন্তু এই সময়ে চুপ করিয়া আছে কেন অশোক? হীরেন্দ্র চক্রবর্তীরা মজুর দঙ্গল লইয়া কংগ্রেস পাণ্ডেল দখল করিতে গিয়াছিল; অশোক তাহাতে যায় নাই? কি করিতেছিল তবে অশোক?

হৈমবতী দেখিয়াছে—কাল দ্বিপ্রহরে একদল লোক অশোকের নিকট আসিয়াছিল। অশোকের সঙ্গে তাহাদের কাল কথা কাটাকাটি হয়, তর্ক বাধে। হৈম'র ভয় হইয়াছিল—যে রকম লোকগুলির চেহারা, মারামারি বুঝি বাধে। অশোককে তাহারা শেষে শাসাইয়া গেল বাঙলায় —'অশোক বাবু, এখনো আমাদের সঙ্গে চলো। নইলে তোমার ভালো হবে না।' অরুণ জানিত, উহারা অশোকের দলের লোক।

বিজয় সেদিন আসল সংবাদ পাইল—অশোকের সঙ্গে তাহার দলের মনান্তর ঘটিয়াছে। হীরেন্দ্র চক্রবর্তী যতটা পারে তাহার পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেও অশোককে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারে নাই। অশোকের অপরাধ—সে কেন বারাহীপুরের প্রজাদের বিজয় জ্ঞানশঙ্করের পরামর্শ শুনিতে দিল? সেই আপোষ রফায় প্রজাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। অশোক সেই বিষয়ে যতই নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করুক পার্টি তাহাকে শাস্তি দিয়াছে।

শুনিয়া অমর খুশী হইল। অশোক ত হীরেন্দ্র চক্রবর্তীর মত ফ্যানাটিক নয়। কাণ্ডজ্ঞান আছে। যত শীঘ্র এই দলের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়, ততই মঙ্গল। তখন অশোক আবার ভদ্রলোক

হইবে—লেখাপড়া আরম্ভ করিবে—হয়ত তারপর হইবে চেষ্টারটন কিংবা গলস্‌ওয়ার্দি ; কিংবা বাঙলায় 'ক্রাইটেরিয়ান' কিংবা 'এডেলফি' সম্পাদনা করিবে···

অপরাহ্ণে অমলা আসিয়াছিল। হৈমবতীর ডেলিভেট টিকেট লইয়া সে কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ বড় গোলমাল। হীরেন্দ্র চক্রববর্তীরা নাকি হাজার দশেক কলের মজুর ভাড়া করিয়া আনিয়া কংগ্রেস দখল করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ভলেন্টিয়ারদের হাতাহাতিও হইয়াছে।

হৈমবতী চমকিত হইলেন—অশোক কোথায় ? অশোক বাড়িতেই। এক গাদা কংগ্রেস-সংখ্যা সংবাদ-পত্র লইয়া সে শুইয়া শুইয়া তাহা পড়িতেছে।

অমলা বলিল : তাই নাকি ? উনি যে বল্‌লেন এসব অশোক-বাবুদের কাজ ? অশোকবাবু নিজে যাননি বুঝি ?

হৈম জিজ্ঞাসা করিলেন : অমি' ইন্দি'কে দেখেছ ?

অমলা বলিল : দেখবার উপায় আছে ?—সে আগাইয়া গিয়া অশোককে পরিহাস করিতে লাগিল : কাণ্ডটা কি বলুন ত ? আগেই নয় বল্‌তেন, আজ যেতাম না।

অশোক কিছুই জানে না—এই কথা বিশ্বাস করিবে না অমলা। চেঁচামেচি নাচানাচি করিয়া লোকগুলি প্যাণ্ডেলে একটা দক্ষযজ্ঞ বাধায় আর কি। জওহরলালের ধমক খাইয়া শেষে চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে অমর গৃহে ফিরিয়া দেখিল—অশোক বাড়িতে একা ! সে বলিতে লাগিল : বিজনের সাহিত্যিক বন্ধু বলে 'গণ ক্ষেপেছে।' তখন গণই বটে ! কিন্তু এ তোদের কি বাহাদুরী। ওরা কংগ্রেসের কি বোঝে—ওদের লাগিয়ে দিলি কংগ্রেসে। একি রামলীলা ?

জ্ঞানশঙ্কর সচকিত হইয়া শুনিতেছিলেন;—আবার সুরাটের পুনরভিনয় নয় ত? যাহাই হউক কংগ্রেস, তাহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তাহাকে ভাঙিয়া দিবার এই চেষ্টা ত গুণ্ডামি। ইহার মধ্যে একটা ইতরতা আছে, এই সব গরীব মানুষকে ক্ষেপাইয়া দেওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্বের কি পরিচয় থাকিতে পারে?

অশোক ততক্ষণ অমরকে প্রোলিটেরিয়ান যুদ্ধ কৌশল, ষ্ট্রাটেজি ও ট্যাক্‌টিক্‌স্‌, ব্যাখ্যা করিতেছিল। অমর তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল: তারা ত হীরেন্দ্র চক্রবর্তীর দল—তুমি ত সে দলে আর নেই শুনলাম।

অশোক মুখ নত করিল। অমর বুঝিল কথাটা সত্য। অশোক একটু পরে বলিল: দলে থাকি বা না থাকি, মত ত আছে।

অমর তাহাতে কান দিল না। আসল কথা এবার অশোক ঐ সব বাজে লোকের কবলমুক্ত হইয়াছে; এবার অশোক অশোক হইবে।

তবু সন্ধ্যায় সুমন্ত্র অমিতা ইন্দিরা আসিয়া অশোককেই অপরাধী করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। সুমন্ত্র বলিল:

কোথায় অশোক দা,' বড় রক্ষা পেয়েছ আজ জওহরলালের কৃপায়। একবারে লোপাট করে দিতাম তোমার মজুরদের আজ।

অশোক হাসিল: সে চেষ্টা না করে ভালো করেছিস্। ও কাজে ওরা তোদের থেকে বেশি ওস্তাদ।

সুমন্ত্র স্বদেশী ছেলে। এই অপমান সহিবে? সে বলিল: মুটে মজুররা পারে কোনো কালে অর্গেনাইজড্ ভলেন্টিয়ারের সঙ্গে?

অমিতা আরও ক্ষিপ্ত।—ইংরেজের সঙ্গে যারা লড়াইতে প্রাণ দিতে পারে, তারা এই সব ছোটলোকদের বাড়াবাড়ি দেখে ভয় পাবে?

জ্ঞানশঙ্করের নিকট বড় অপ্রীতিকর ঠেকিতেছে কথাবার্তা। অমি'ই বা কেন এই সব ব্যাপারে এত উত্তেজিত হয়। সামান্য বালিকা

সে, ষোল বৎসরেও পড়ে নাই। 'পাগলী' বলিলে চলিবে কেন? এইরূপ কথা তাহার মুখে নিশ্চয়ই অশোভন।

অবশেষে তিনিই বলিলেন, থামো অমি।

কিন্তু অমিতা থামিবে না। অশোকই বরং চুপ করিয়া গেল।

তথাপি উত্তেজনা শেষ হইল না। কংগ্রেস যথারীতি চলিতেছে—অশোক তাহা দেখিতে যাউক বা না যাউক। জ্ঞানশঙ্করও একদিন কংগ্রেস দেখিয়া আসিলেন। সেই ১৯০৭এ তিনি গিয়াছিলেন কংগ্রেসে, তারপর আর যান নাই। তখন সুরেন্দ্রনাথ ফিরোজশাহ মেহটার যুগ। কংগ্রেস মণ্ডপে চারদিকে তখন দেখা যাইত শিক্ষা-দীক্ষা বুদ্ধি ভদ্রতা সৌন্দর্য। আর আজ একি কংগ্রেস! একটা মেলার মত ব্যাপার। কী ভিড়, কী ভিড়! কত মানুষ! আর কোথায় সেই ভদ্রতা, শোভনতা? বক্তৃতার জন্য কেহ মুখ না খুলিতেই চীৎকার উঠিবে 'হিন্দী, হিন্দী!' কোনো আলোচনা নাই, যুক্তি নাই, বিবেচনা নাই,—শুধু হিন্দীতে বলিলেই হইল। ইহা ত আর সভা নাই, 'শো,' তামাসা।

রাত দুপুরে হৈমবতীর টিকেট লইয়া আমিতা ভোট দিয়া আসিল 'পূর্ণ স্বাধীনতার' পক্ষে। যেন এই রাত দুপুরে ভোট চুরিতে যোগ না দিলে পৃথিবী ইহাদের স্বাধীনতার রথ গ্রাস করিয়া ফেলিত!

জওহরলাল করিলেন কি? অমিতা ক্ষুব্ধচিত্তে বলে: তিনিও কমিউনিষ্ট—ওঁদের কোনো কথায় বিশ্বাস নেই।

অমর বলিল: চালাক ছেলে জওহরলাল। তিনি সুভাষ বসু নন যে, 'পূর্ণ স্বাধীনতার' জন্য গান্ধীজীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন। নিজের নেতৃত্বের পথটি পাকা করে ফেললেন এবার ছোট নেহেরু। এরই নাম টাকটিক্‌স্ রাজনীতিতে—বুঝলে অশোক।

অশোক হাসিয়া বলিল: বুর্জোয়া রাজনীতিতে। এজন্যই ত

হীরেন'দা বলেন—বুর্জোয়াজিকে বিশ্বাস নেই। তারা 'ট্রেটর ক্লাশ', বিশ্বাসঘাতকতা করবেই। তবে অন্য দেশে তা করে বিপ্লবের সময়ে, এদেশে এরা তা করে বিপ্লবের আগেই। কলোনির বুর্জোয়াদের এমনি সাহসের অভাব।

জ্ঞানশঙ্কর এই আলোচনার বিশেষ অর্থ খুঁজিয়া পান না। কোথায় বা পূর্ণ স্বাধীনতা, কিই বা তাহার সম্ভাবনা? সামান্য কোনো একটা বিষয়েও এই জাতি এক মত হইতে পারে না। স্বাধীনতা যেন একটা মুখের বুলি মাত্র—সাধনার জিনিস নয়। স্বদেশীর সেই দিনে এই কথাটা উচ্চারণ করিতে তাঁহাদের শিহরণ জাগিত প্রাণে। আজ অমি' দিয়া আসে উহার জন্য চুরি করিয়া ভোট্। বড় সস্তা হইয়া গিয়াছে সব,—কথা কল্পনা, জীবন-চেতনা, সবই যেন গুরুত্ব হীন।

চিত্রিসারে অভ্যস্ত কাজকর্মে স্থির হইয়া বসিতে এবার জ্ঞানের বিলম্ব হইবে। কলিকাতার দিনরাত্রিগুলি যেন একটা ঝড়ের মধ্যে গিয়াছে—এক মুহূর্তও স্বস্তি নাই। কিন্তু শুধু তাঁহার কেন, এ দেশের কাহারও জীবনে বুঝি আর সুস্থিরতা নাই। রাজনৈতিক দলগুলির কলহ দেশের জীবনকে বিষাইয়া তুলিয়াছে—কিছুতেই তাহারা নিজেরা কোনো কল্যাণের পথে একত্রিত হইবে না; আর কিছুতেই এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের সুস্থ কল্যাণবোধকেও তাহারা স্বচ্ছ রাখিতে দিবে না। বারাহীপুরের সেই প্রজাদের ক্ষেপাইবার জন্য আবার হীরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্ররোচনায় লাগিয়া গিয়াছে মুনিম খাঁ মদন দাস;—তবু ভালো, অশোক তাহাদের সঙ্গে নাই। কিন্তু কী বিশ্রী বিদ্বেষমূলক প্রচারই

নাকি শুরু হইয়াছে সে অঞ্চলে জমিদার মহাজন ও নায়েব গোমস্তার বিরুদ্ধে। অশোক এখনো তাহাদের সঙ্গে নাই ;—কাহার সঙ্গে সে আছে তাহাও বুঝা যায় না। সে কাগজ আর বাহির করিল না, ছাপাখানাও দেখিতে চাহে না। কিছু একটা ঘটিয়াছে তাহার জীবনে ;—কি তাহা ? তাহার ছাত্রী রেবা কি জানে ? কিংবা অন্য কেহ ? অসম্ভব। যাহা জ্ঞান চৌধুরী জানেন না, অমর বিজয়ও জানে না, অশোকের তেমন কথা জানিবে কে ? কোন মেয়ে ?—তবে কেন হৈম আবার অশোকের বিবাহের কথা ভাবিতেছে ? অবশ্য অমি'র বিবাহের প্রস্তাব রজনী পাঠাইয়াছে বলিয়াই হৈম সে কথা বলিতেছে—আর সত্যই, অমি'র এবার বিবাহের আয়োজন করিতে হয়। দিনে দিনে কি হইতেছে সে !—সেই সুমন্ত্রদের সঙ্গে মধুখালিতে লাঠি ছোরা খেলিত ; তাহা বুঝা যায়। কিন্তু কলিকাতায় সেও রাজনীতি লইয়া একি বাড়াবাড়ি করিতেছে। অশোক, হীরেন্দ্রদের সঙ্গে সে মুখে মুখে তর্ক করে।—কলিকাতার দিনগুলির স্মৃতি যেন জ্ঞানশঙ্করের মনে কেমন অস্বস্তিকর হইয়া রহিয়াছে।

ফিরিয়া গেলে শরৎ পরিহাস করিল: তুমি হলে আমাদের হিন্দুদের ডেলিগেট্, তোমার স্ত্রী হলেন বিজয়দের ডেলিগেট্, তোমার মেয়ে হল কংগ্রেস ভলেন্টিয়ারদের চাঁই, তোমার ছেলে হল মজুরের নেতা ;—সবটাই দেখছি তোমাদের ফ্যামিলি এফেয়ার।

জ্ঞানশঙ্কর এই পরিহাস উপভোগ করিলেন। কিন্তু একেবারে স্বচ্ছন্দও বোধ করিতে পারিলেন না। অবশ্য শরৎও জানে না যে, ইহার পিছনে একটা গভীর দুশ্চিন্তার কারণ ঘনাইতেছে। চৌধুরী পরিবারের মধ্যে ভেদরেখা এতদিন দেখা দিয়াছে আপনার নিয়মে—ব্যবসায়ী স্বার্থে সুরেশ্বর দূরে গিয়াছে, আত্ম-স্বার্থে অতুল এখন পর, আপনার ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে অমরও কতকটা স্বতন্ত্র। কিন্তু এবার বাহিরের টানে চিড় খাইতে শুরু করিল তাঁহাদের চৌধুরী গোষ্ঠী। আসলে অশোক হইতেই ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। এবার রাজনীতিও তাহাদের বিভেদ ঘটাইবে —তাহা আর বৈঠকখানার বাদবিতণ্ডার জিনিস নাই—এখন উহা অন্তরের দ্বন্দ্বও বাধাইবে। জ্ঞানের মনেও এইরূপ আশঙ্কার ছায়া জাগিতেছে!

৮

কলিকাতায় বড় রকমের একটা খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের ধূম পড়িয়াছে; হীরেন্দ্র চক্রবর্তী ও তাহার বন্ধুরা আবার গ্রেপ্তার হইয়াছে। জ্ঞান চমকিত হইলেন—আশঙ্কা সত্য হইল কি? গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়াই জাল ফেলিয়াছে—কমিউনিষ্টদের ধরিয়াছে। অশোকের সংবাদ কি?—উৎকণ্ঠিত চিত্তে জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছিলেন। শুনিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইলেন—তাঁহার ঘর তল্লাসী হয়, থানায়ও তাহাকে কয়েক ঘণ্টা আটকাইয়া রাখা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। বরং এখানে পুলিশ খোঁজ করিতেছে মুনিম খাঁর। সে জাহাজী লস্কর, কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। দিন-কয় তবু জ্ঞান চৌধুরী ও হৈমবতী সশঙ্কচিত্তে যাপন করিতে লাগিলেন—কখন বুঝি পুলিশ আসিল। কিংবা টেলিগ্রামের পিয়ন আসিয়া হাঁক দিবে, 'টেলিগ্রাম'।—আর কম্পিত বক্ষে জ্ঞান খাম খুলিয়া পড়িবেন—হয়ত পাগলী অমি'ই লিখিবে, কিংবা লিখিবে নৃপেন—'অশোক গ্রেপ্তার।' কিন্তু বিজয় ভরসা দিল—মুনিম খাঁরা অশোককে দূরে দূরে রাখিয়াছে; তাই অশোককে এখন আর ধরিবে না।

সত্যই অশোক এযাত্রা বিপদে জড়াইয়া পড়িল না। তাই বুঝি সে

এখন আরও অস্থির হইয়া উঠিতেছে, জানাইয়াছে নৃপেন। অশোক বন্ধুকৃত্য করিবে কি করিয়া? বন্ধুদের জন্য সে ব্যস্ত।

মীরাটের কমিউনিষ্ট মামলার সুদীর্ঘ আয়োজন-পর্ব নিজের নিয়মে অগ্রসর হইয়া চলিল। অশোক তাহাতে জড়িত হয় নাই, ইহাই জ্ঞানের ও হৈম'র সান্ত্বনা। কিন্তু হীরেন্দ্রের মত মানুষেরা অনেকেই উহাতে আসামী রূপে হাজতে পচিতেছে, এই চিন্তাও জ্ঞানকে স্বস্তি দিল না। হউক তাহারা কমিউনিষ্ট,—রুশিয়ার অর্থপুষ্ট বিপ্লবী;—আমাদের সমাজ, আমাদের সভ্যতা, আমাদের ধর্ম,—কোনো জিনিসেই তাহাদের আস্থা নাই;—কিন্তু সে আস্থা আছে কাহার? অমরের আছে? আছে অরুণের? আছে সুরেশ্বরের, অতুলের,—কিংবা নৃপেনের? কিংবা ব্রিটেনের অর্থ-দাস এই দেশী বড় চাকরেদের? কিংবা যত একজিকিউটিব্ কাউনসিলরদের? তাহারা উহাদের শাস্তি দিবার কে? শাস্তি দিতে হয়, এ দেশের লোক এ দেশের নিয়মে তাহাদের বিচার করিবে।

কিন্তু এই অসন্তোষ জ্ঞান চৌধুরীর মনে রহিলেও তাহা তীব্র আকার ধারণ করিতে পারিল না। সত্যই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছিল ইহারা—মুনিম খাঁকে ত সে দেখিয়াছে। হীরেন্দ্রও দেশে আসিয়াই না বুঝিয়া শুঝিয়া উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। এদিকে বিবাহও সে করিয়া গিয়াছে। ইন্দুকে এখন কে দেখিবে? সে কাদম্বিনীর নিকটে আসিবে কি? না। ইন্দু কলিকাতাতে কাজ করিতেছে। আত্মনির্ভরশীলা হইতে সে শিখিতেছে। ভাবনার কারণ তাহার জন্য নাই।

ভাবনার বরং অন্য কারণ জ্ঞান চৌধুরীর চতুর্দিকে জুটিল।

ইতিপূর্বেই স্থানীয় স্কুল কাউন্সিলের একটা সভায় জ্ঞানের চেষ্টা সত্ত্বেও মণীন্দ্র সভ্য হইতে পারিল না, সভ্য হইল গণেশবাবুর

প্রস্তাব মত কুমুদ। এখনো এই কাউন্সিলের সেক্রেটারি জ্ঞানশঙ্কর; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের সমর্থন হঠাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে যায়। কারণ কি?—নানা 'হট হেডস্' কাউন্সিলে আসিতেছে—অর্থাৎ বিজয় অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হইয়াছে সম্প্রতি। জ্ঞান ইহাও বুঝিলেন পরে—সরকারী চক্ষে জ্ঞান চৌধুরীর সমস্ত ফ্যামিলি 'ডিস্‌লয়েল্'। বুঝিতে পারিলেন—ভবিষ্যতে কুমুদই স্কুলের সেক্রেটারি পদে অভিষিক্ত হইবে। দুই এক বৎসর হয়ত বিলম্ব আছে; জ্ঞান চৌধুরী নিজে না চাহিলে কেহ তাঁহাকে এই পদ হইতে অপসারিত করিতে সাহস করিবে না, চাহিবেও না। আর বিজয় তাঁহাকে সরিতেও দিবে না। দ্বিতীয় বিড়ম্বনাটাও সহজেই তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন—সাম্প্রদায়িক গোলমালের সময় তাহার বন্দুক সরকার সাময়িকভাবে 'জিম্বা' রাখিয়াছিল। পরে আবার জ্ঞান চৌধুরী তাহা ফেরৎ পান। কিন্তু এই দুই বৎসর পরে সেই বন্দুকের পাশ আর তাঁহাকে দেওয়া হইল না—রাজনৈতিক কারণে সরকারের আপত্তি আছে। বিজয় যাহাই বলুক, এ সব যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কথা। ইহার উপর আবার—হীরেন্দ্র নাই, মুনিম খাঁ নাই,—কিন্তু কোথা হইতে একদল লোক আসিয়া এখন বারাহীপুরের সেই প্রজাদের ও খাতকদের ক্ষেপাইতে শুরু করিয়াছে। ম্যানেজার বাবু ও ছোট রাজার নিকট জানাইতে ক্রটী করেন নাই—জ্ঞানবাবুর ও বিজয় বাবুর কথা মত মামলা মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়াতেই—এবং প্রজাদিগকে এষ্টেটের বৃত্তি ও সাহায্য পুনরায় প্রদান করাতেই উহাদের এত স্পর্ধা হইতেছে। জ্ঞানের হাসি পায়—মুনিম খাঁরা না হয় ফেনাটিক,—অকারণে অশোককে পর্য্যন্ত দোষী করে। কিন্তু ইহাঁরা কি? এই ম্যানেজার নায়েবরা? অকৃতজ্ঞ ভেম্‌পায়ার!

পরীক্ষা দিয়া ফিরিল অমিতা—গৃহে ফিরিল অরুণ। দিনকয় পরে আসিল ইন্দিরাও। আর শত কাজ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জ্ঞান চৌধুরী কোথা দিয়া একটা আরামও তখন পাইলেন। অমি'র পাগলামিতে ক্ষ্যাপামিতে, বাড়ি-ঘর এখনো সহজেই ভরিয়া যায়। এবার সে পরীক্ষা দিয়াছে পাশও করিবে,—তারপর—কিংবা দেরী করিয়াই বা লাভ কি? এখনো কথাবর্তা পাকা করা যাইতে পারে—না হয় বিবাহ পরে হইবে। কিন্তু অমিতার যে বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, কিংবা আসিতে পাবে ইহাই যেন অমিতা বিশ্বাস করে না। হৈমবতী যতই বলুন, অমি' কানেই তোলে না কোন কথা। চলিয়াছে কোথায়, করিতেছে কি, কিছুই ঠিক নাই। অবশ্য এখন ইন্দিরাও এখানে আছে। কিন্তু ইন্দিরা দিন কয়েকের মধ্যেই চিত্রিসারে মায়ের নিকট যাইবে। সে চলিয়া গেলও। তখনো অমি'র কাণ্ডজ্ঞান নাই। হৈমবতী বারে বারে বলিলেন: কোথায়, কখন যাও—লোকে দেখবে।

তাতে আমার জাত যাবে নাকি?—অমি' তীব্রভাবেই উত্তর দেয়।

হৈম বুঝাইতে চেষ্টা করেন: জাত যাবার কথা নয়। কিন্তু একটা রীতি নিয়ম ত আছে। বড় হয়েছ—বিয়ে হবে।

সে ত আমার হবে! আমিই বুঝব তা।

জ্ঞান শুনিয়া হাসেন। বলেন: ছাখো তবে। যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ধুম নেই। কী করবে এমন পাগলীকে নিয়ে?

হৈম বলিলেন: বিয়ে না হলে ওর পাগলামি যাবে না। ওর বয়সে আমার অশোক জন্মে গিয়েছে কবে।

'ওর বয়সে'···জ্ঞানশঙ্করের মনে হয়—সে যে একটা জন্মান্তরের কথা। কত স্থির, আত্মস্থ, তখনি হৈম; দশজনের সংসারে সকলের মন জোগাইয়া

চলিতে চলিতে আর জ্ঞানের মত আশ্চর্য মানুষের মনের পরিচয় পাইতে পাইতে হৈমবতীও তখন কত আশ্চর্য জটিল অনুভূতিশীলা গৃহিণী হইয়া উঠিতেছিল। জ্ঞানশঙ্কর আবার ভাবেন, 'ওর বয়সে' এ যুগে বুঝি আর কেহ হৈমর মত তেমনটি থাকিতে পারে না—সবই অস্থির, সবই অপ্রকৃতিস্থ ; সবাই এখন স্বজন-সংসার সম্বন্ধে অল্পাধিক আগ্রহহীন, দায়িত্বহীন।

অমি'কে ক্ষেপাইবার জন্যই অরুণ বলিল : এই বাইরে যেয়ো না। ভদ্র লোকেরা আজ তোমাকে দেখতে আসবেন।

অমিতা ভাবিল অরুণের মিথ্যা বিদ্রূপ। বলিল : তাই ত যাচ্ছি। কে আসবে, কি দেখবে, জিজ্ঞাস করে আসব এখনি।

কিন্তু হৈমবতী আসিয়া গেলেন। গম্ভীর শান্তভাবে বলিলেন : তুমি আজ বাড়িতেই থেকো, অমি'। কোথাও যেয়ো না যেন।

কেন বলো তো ?

ওঁরা এসেছেন। পথে ঘাটে তোমাকে দেখলে কি মনে করবেন ?

ওঁরা কে, যে দেখ্‌লে আমার মুণ্ডুটা ভস্ম হয়ে যাবে ?

হৈমবতী আশ্বস্ত বোধ করিলেন না : সে পরে বুঝবে। এখন কর্তা যা বলেছেন শোনো।

পাত্রপক্ষ শিক্ষিত ঘর, অবস্থাপন্ন। ছেলেটি বি-এস্‌-সি পাশ করিয়া ইন্‌করপোরেটড একাউণ্ট্‌সের শিক্ষানবিশ,—রজনীর ছেলের বন্ধু। শীঘ্রই বিলাত যাইবে। সম্ভবত সেই ব্যয়টা দাবী করিবে। আংশিক না সম্পূর্ণ, তাহা জ্ঞান চৌধুরী এখনো বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে এই মেয়েটির উপর তাহাদের যখন বিশেষ দৃষ্টি তখন কিছু সেদিকে

সুবিধাও হইতে পারে। বিলাত যাইবে ছেলে, তাহার পূর্বেই বিবাহ দেওয়া চাই। আর বিলাত-যাত্রী সেই ছেলে ও তাহার বন্ধুরা বলে—মেয়েটি শিক্ষিতা ও দেখিতে সুশ্রী। অর্থাৎ 'বার আনা' স্থির; তবু আত্মীয়দের একবার দেখা প্রয়োজন। আপাতত দেখিতে আসিয়াছেন তাই ছেলেটির মাতুল ও জেষ্ঠ ভ্রাতা। স্থানীয় কলেজের প্রোফেসরদের কাহারও বাড়িতে তাঁহারা উঠিয়াছেন—জ্ঞানশঙ্কর সে দিকেও নিশ্চিন্ত। হৈমরও এইখানে এই সম্পর্ক করার ইচ্ছা।

কিন্তু অমিতা তুমুল কাণ্ড বাধাইল। আবাল্য সে অমর ও অশোকের মুখে এমনি কনে বাছাইর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ শুনিয়া আসিয়াছে। আর এখন এই অপমান সে বুঝি মাথা পাতিয়া লইবে? সে কি বাজারের মাছ তরকারী, ছাগল ভেড়া, না, শাড়ী, জামা, যে, তাহাকে দেখিবে, যাচাই করিবে, তাহার দাম কষিবে,—অন্যেরা? স্পর্ধা বটে এদেশের বেহায়া পুরুষদের।

হৈমবতী বলিলেন: তবে কি না দেখে তোমাকে বিয়ে করবে?

তীক্ষ্ণস্বরে অমিতা বলিল: তাই ত করছে গুণধরেরা। এ ত দেখা নয়—দর কষা; তাও পরের মুখে, মামা দাদার মারফতে।

তবে কি নিজে আসবে নাকি?

সাহস থাকত ত আসত। সেও দেখত, আমিও দেখতাম। শুনে যেত স্পষ্ট কথা। এখন বুঝছি কেন দাদা বিয়ের নামও করেন না—তোমাদের পসন্দ হবে কেন রেবাদি'কে!

একটা নূতন কথা। হৈম চমকিত হইলেন। কিন্তু একেবারে নূতন কি? শুধু তিনি মুখ ফুটিয়া কহেন নাই,—নিজের মনেও নিজে আর কহেন নাই। হৈম আর অশোকের মনের কথা জানিবার, বুঝিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করেন না। কারণ, অশোক বড় দুর্বোধ্য। তবু এই মুহূর্তে

তাহা ভাবিবার সময় কই হৈমর? আগে ত এই অমিতাকে এখন বুঝাইতে পড়াইতে হয়। জ্ঞান চৌধুরী তাহা দেখুন এখন নিজে।

প্রথম বিজয়ের ডাক পড়িল। বিজয়ও এখন এইরূপ কনে-বাছাই ভালো মনে করে না। কিন্তু জ্ঞানশঙ্করের এই বিপদ, পাত্র পক্ষও আসিয়া গিয়াছে,—এখন সেই কথা বলিয়া লাভ কি?

বেশ,—অমিতার নিকট বিজয় প্রস্তাব করিল,—তুমি আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করো,—যেমন করো বরাবর। ওঁদের সঙ্গে দু'টি কথাও নয় কইবে,—যেমন কত কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাদের তুমি উত্তর দেও। তাতে আর কি?

অমিতা ক্ষেপিয়া গেল।—আপনার ভীমরতি হয়েছে—বুড়োদের মত। নইলে এমন কথা আপনি মুখে আনতেন না।

হাসিয়া আবহাওয়াটা হাল্‌কা করিতে চাহিল বিজয়। কিন্তু পারিল না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া বলিল: বড় মুস্কিল দেখছি যে কাকী মা। অমি' কি কারো কথা মানে?

হৈমবতী জ্ঞানকেই আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। আর অরুণ মাকে শুনাইয়া বলিল: অমি'ও শুনবে—তবে নতুন 'স্বদেশী' দাদাদের কথা হলে। বিজয়দা' বাতিল; সুমন্ত্রদা'কে ডাকাও বরং।

আর একবার চমকিত হইলেন হৈমবতী। আবার একটা নূতন কথা। নূতন কি? হাঁ, নূতন, ভয়ানক নূতন। কিন্তু একেবারে নূতন কি এ কথাও হৈমর নিকট? তিনি কি নিজেও জানেন না—অমি' ইন্দি' দুইজনাই সুমন্ত্রদের গুপ্ত মন্ত্রণার মধ্যে আছে। গতবার তাহাদের দুইজনার অভিমান-কলহে যে ঐ সুমন্ত্রদের সম্পর্কেই, এই কথা চিত্রিসারের বাড়িতে বসিয়াও কাদম্বিনী বুঝিতে পারেন, আর এইখানে চোখের সম্মুখে দেখিয়াও হৈমবতী বুঝেন না! তথাপি এখন আর

কিছু হৈমবতী ভাবিতে পারে না; কিছুই ভাবিবার সময় নাই যে। বাহিরের ঘরে ভাবী কুটুম্বরা আসিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন: কোথায় অমি'? দেরী করো না। একটু সাজ-পোষাক যা হয়, ঠিক করে নাও চট্‌পট্‌ করে। বেশি আড়ম্বরের দরকার কি?—ওদিকে ভদ্রলোকেরাও বসে আছেন—আজই বিকালের গাড়ীতে ওঁরা ফিরে যাবেন।

অমিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল: তাতে আমার কি?

অমিতা এই ভাবে তাঁহাকে উত্তর দিবে তাহা জ্ঞানের অভাবনীয়। তথাপি স্নিগ্ধস্বরে জ্ঞান বলিলেন: তোমার আবার কি? ওরা এসেছেন, এমন কত লোক আসেন, কত লোকের সঙ্গেই তো তুমিও কথা বলো, তাতে আর কি?

অমিতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল: আমার আত্মসম্মান বোধ আছে। তোমরা তা রাখতে না চাও। আমি তা রাখতে জানি, রাখব।

জ্ঞানশঙ্কর আহত হইলেন, কিন্তু ধৈর্য্য হারাইলেন না, ধৈর্য্য হারাইবার সময় ইহা নয়। শেষে হাত ধরিয়া বলিলেন: বড় অবিবেচনার কাজ হয়েছে, অমি'। তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে, সব করে গিয়েছি। আর হবে না। এবারকার মত তুমি আমার সম্মানটা অন্তত রাখো।

ক্ষোভে অভিমানে অপমানে অমিতা কাঁদিয়া গিয়া আপনার শয্যায় শুইয়া পড়িল। বালিশে মুখ গুজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষ বারের মত হৈমবতী বলিলেন: কর্তার মান ত' রাখতে হবে, অমি'। ওঠো দেরী করো না।

তাঁর মেয়ের অপমানে তাঁর মান বাড়বে,—এই তোমার বিশ্বাস? বাবার মুখেও এমন কথা শুনতে হবে, ভাবিনি।

পাত্র-পক্ষ ফিরিয়া গেল। কন্যা হঠাৎ কাল রাত্রিতে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে; এখন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। জ্ঞান তাঁহাদের খরচ পত্র প্রভৃতি দিতে গেলেন। তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না; টাকা কেন? তবে একটু পূর্বে বুঝিলে ভালো হইত, বিষয় কর্মের ক্ষতি করিয়া তাঁহারা মিছামিছি এতদূর আসিতেন না।

বুঝা গেল, ছোট শহরে কোনো কথাই চাপা থাকে নাই, থাকে না।

সেদিন জ্ঞান চৌধুরী কাছারি যান নাই। পরদিনও যাইতে তাঁহার পা উঠিতে চাহে না। কি করিয়া তিনি মুখ দেখাইবেন শহরে? হৈমবতী বার বার বলিতেছেন—এইজন্যই মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা বারণ। শাস্ত্র কি না বুঝিয়া ব্যবস্থা দেয়? কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী নির্বাক, নিস্তব্ধ। মনোজ বিজয় আসিয়াছিল, কিন্তু কোনো কথাই তিনি বলিতে চাহেন নাই, কোনো আলোচনাই আর তিনি করিতে পারেন না।

অমিতা গম্ভীর। আত্ম-সচেতন দৃঢ় চরণে সে যায় আসে। কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া কথা বলিল না। সাত দিনের মধ্যে জ্ঞানের সহিতও সে কথা বিশেষ কহিতে পারিল না। দিন সাতেক পরে সহজ ভাবে বলিল: আজ অমাবস্যার জোয়ার। নতুন চরে বান ডাকছে—আমি দেখতে যাই, বাবা?

বান ডাকে, জোয়ারে চর ডুবিয়া যায়, মানুষ ছুটিয়া জল ভাঙিয়া ফিরে। মেয়েরা কি করিয়া সেখানে যায়? কিন্তু কোনো কথা কি অমি' শুনিবে?

I must be a pattern of patience, I shall say nothing.

জ্ঞান বলিলেন: যাও।—হাসি দিয়া তারপর কথাটাকে সহজ করিলেন, ফিরে আসতে পারবে ত?

হাসিয়া অমিতা জানাইল: তুমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখোই না।

কিন্তু দুইজনার হাসির মাঝখানেও বিষম একটা দূরত্ব রহিয়া গেল, তাহাও দুইজনাই আজ জানে।

তবু অমিতা পাশ করিল—প্রথম বিভাগেই পাশ করিল। একবারের মত জ্ঞানশঙ্কর পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই দিনটির কল্পনায়ও তিনি যেমন এক সময়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন, সে তুলনায় এই আনন্দও যেন ক্ষীণস্রোত, হৃতশক্তি। লোকে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল। শরৎ বাত সত্ত্বেও বৈঠকখানায় অমিতাকে ডাকাইয়া নানা পরিহাস করিতে লাগিলেন—এই বয়সের এমনি ছিল তাঁহারও তৃতীয় কন্যাটি, কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্বে সে মারা গেল। হাঁ, পড়ুক না অমিতা, কলিকাতাতেই পড়ুক—শরৎও তাহার আব্দার মানিয়া লন, জ্ঞানকে একটু পরিহাসও করেন। আর তাই আনন্দের একটা সুখস্পর্শ শত সত্ত্বেও আবার জ্ঞান চৌধুরীর মনে লাগে।…সে অমি' নাই, সে অবিমিশ্র আনন্দ নাই। অবিমিশ্র আনন্দ কবে কোথায় থাকে? জীবনের ভাণ্ডে ঢালিলেই সমস্ত সুখ একটু না একটু টকিয়া যায়—তবু তাহা সুখ। The web of our life is a mingled yarn, good and ill together. সে অমি'ই বা তবে নাই কেন? কে বলিল নাই? সেই পাগলী অমি' তাহাই আছে।

পড়ুক তবে অমি, পড়ুক কলিকাতায়। না আর আপত্তি করিবেন কেন জ্ঞান? খরচ? সে তো লাগিবেই। পড়ুক তবু অমিতা।

অমিতা কলিকাতা চলিয়া গেল। চলিয়া গেলে অরুণও—যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অমি' পড়িবে, সেখানে পড়িতে কিন্তু তাহার আর আগ্রহ নাই। না, সে আর নিতু বাঁড়ুজ্জের কথাও শুনিতে চাহে না। নিতুর ঘটনাটা মা শুনিয়াছেন। কিন্তু মা বাবা বরাবরই তাহার বিরুদ্ধে নানা

কথা শোনেন—বিশ্বাসও করেন। অথচ নিতু বাঁড়ুজ্জে যাহা খুশী লিখুক, অরুণ আর বীরুদের বাড়িতে যায় না। নিতুর কথায় ও অপমানেই অরুণ প্রাণ দিতেছিল—সত্যই প্রাণ দিতে চাহিয়াছিল;—হাঁ, প্রাণ গেলেও সে এত কষ্ট পাইত না! এখন অরুণ ফুটবল মাঠে হইবে রেফারি, আর টেনিসে হইবে জাজ্। অথচ এখনি তাহার খেলার 'ফরম্' চরমে উঠিতেছিল। খেলার মাঠ অরুণ ছাড়িতে পারে নাই, কিন্তু বাঁশীই তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে। অরুণ যদি ভালো করিয়া সঙ্গীত চর্চা করিতে পারিত! এদেশে সঙ্গীত বিদ্যালয়ও নাই। কলিকাতার নানা আসরে ঘুরিয়া সঙ্গীত শিখিতে হয়। তাহাই সে শিখিতে চায়। কিন্তু উহা শুনিলে বাবা তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন না। এখনো তাঁহার ইচ্ছা—অরুণ উকিল হউক্। কিছুতেই তাঁহারা অরুণকে বুঝিতে চাহিবেন না। কি করিবে অরুণ? কলিকাতায় পড়িবে? হয় ত পাশও করিবে ঠিক সময়ে। কিন্তু এখন তাহার পড়িবার মত ইচ্ছা নাই।

একবারের মত জ্ঞান চৌধুরী আপনার শক্তি পরীক্ষায়ও জয়লাভ করিলেন। কলেজে ব্যায়াম শিক্ষক চাই। সুমন্ত্র তাহার জন্য প্রার্থী। বি-এ পাশ সে করিয়াছে—যত বারেই হউক। তাহা ছাড়া নানা রকমে খেলায় কসরতে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে পুলিশের কেমন সন্দেহ। হিন্দু ভদ্রলোকেরা সকলেই সুমন্ত্রের উপর সন্তুষ্ট। তাহাদের ক্লাবের ছেলেদের লাঠি ডেগার তলোয়ারের ভয়েই ত মুসলমানেরা তবু এখনো হিন্দুদের এই শহরে বে-ইজ্জত করে না। সরকারের পক্ষ হইতে বাধা দিয়াছিল গণেশ। কিন্তু জ্ঞানের ও বিজয়ের চেষ্টায় সুমন্ত্র তথাপি এই পদে নিযুক্ত হইল।

জ্ঞান চৌধুরী বুঝিলেন, চেষ্টা করিলে এখনো কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না।

জ্ঞান চৌধুরী এখনো কিছু করিতে পারিতেছেন না মনোজের জন্য। দিন দিন মনোজের অভাব বাড়িতেছে, 'ছিট'ও বাড়িতেছে, কোথায় তাহার একটা আক্ষেপ আপনার মধ্যেই জন্মিতেছে, সে স্থির চিত্তে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি সে বৈরাগী বোষ্টমদের আখড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সহজিয়া দেহতত্ত্বের মধ্যেও সে একটা সত্য খুঁজিয়া পাইতেছে, বুঝিয়া উঠিতেছে উহার কথা।

মনোজ বলিল:—সাধারণ বাবাজী লোকটা। আমি বললাম, 'তোমরা ত দেহতত্ত্বের সাধনা করো।' কথাটার মধ্যে অশ্রদ্ধা ছিল, শিক্ষিত মানুষ আমরা, দেহতত্ত্বকে ঘৃণাই করি। বাবাজী তা বুঝেই একটু হাসল, বলল, 'দেহটা কি তুচ্ছ করবার জিনিস, বাবু? তা হলে এটা দিলেন কেন তিনি? দেহ ছাড়া আর কিছু দিয়েও ত পাঠান না।—দেহ দিয়েই সব করতে হবে।' বলে ত বাবাজী গাঁজা খাওয়া গলায় গান ধরলেন—'ও তোর দেহের মধ্যে গয়া কাশী বৃন্দাবন।'

নূতন কথা কিছু নয়। এই তত্ত্ব কবে অস্বীকার করিয়াছে তন্ত্র, কিংবা বৈদিক ঋষিরা? মাঝখানে তবু বৈরাগ্য আর সন্ন্যাসের নামে দেহ, পৃথিবী, সংসার সকলকে নরক ও মায়াজাল বলিয়া বর্ণণা করিতে লাগিয়াছিল কেন শাস্ত্রকাররা ও সন্ন্যাসী উদাসীরা? সত্যই নরক হইয়া উঠিয়াছিল হয়ত তখন সমাজের জীবন-যাত্রা।—বিশৃঙ্খলা আসিয়াছিল, বর্ণসংকর ঘটিয়াছিল, গীতায় সেই সমাগত বিভীষিকারই আভাস ছিল,—মানুষ আপন আপন স্বধর্ম, সোশ্যাল ডিউটি ত্যাগ, করিয়াছিল। আর তাহার ফলে আত্মভ্রষ্ট হইতেছিল, integrity হারাইতেছিল—যেমন হারাইতেছে আবার মানুষ এই যুগে।

জ্ঞান চৌধুরী তাই জানেন মনোজের আবিষ্কারে নূতনত্ব নাই। কিন্তু নূতন এই যে, যে-মনোজ দেহকে বাধাই মনে করিতে চাহিতেছিল, সে ফিরিয়া দেহকে আবার স্বীকার করিতে চাহিতেছে। ভালোই; সে আপনার গৃহ ধর্মকেও একটু আবার স্বীকার করুক। তথাপি দেহতত্ত্ব হইয়া মোহ গড়িবার দরকার নাই।

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন: বাবাজীকে কিন্তু তোমার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, 'দেহ যিনি দিয়েছেন, তিনিই দেহকে নশ্বর করেছেন, রোগ-জরা-মৃত্যুর অধীনও করেছেন দেহটাকে।' অতএব বুদ্ধদেবের মত সংসার ছাড়ারও দরকার নেই, এদের মত বিশ্রী বাড়াবাড়ি করারও দরকার নেই। গীতা ইজ আওয়ার গাইড্।

মনোজেরও সংসারকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঘটনা-স্রোত বড় জটিল আবর্ত সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছে তাহার চারি দিকে। সেই ছোট শ্যালিকাটির কথা সে ভুলিতে পারে নাই, বরং তাহার স্বামীগৃহের নানা দুঃখ গঞ্জনার কাহিনী মনোজের এই বোধটাই তীব্র করিয়া তুলিয়াছে—সে অপরাধ করিয়াছে সেই বালিকার নিকটে। বোধটা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে, কিন্তু ইতিমধ্যে চাই মনোজের লেখাপড়ার কোনো কাজে আকর্ষণ;—সংসারে প্রতিষ্ঠা, সমাজে প্রতিষ্ঠা, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা।

মনোজ, তুমি কিছু বই লেখো না।—জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন।

মনোজ অপ্রস্তুত হইল। বলিল, কি লিখব—শর্টকাট টু ইংলিশ গ্রামার এণ্ড কম্‌পোজিশ্যান্?

জ্ঞান বুঝিলেন। হাসিয়া বলিলেন: পার ত লেখো,—তাতেও দু'পয়সা হবে। কিন্তু আমি বলি অমর অত পার্সোনালিটি' নিয়ে বই লেখে, অশোক ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার বুলি কপচায়;—তুমিই আমাদের কথাটা লেখো—ভারতীয় সমন্বয়তত্ত্ব। যেমন, ধরো অধ্যাত্মিক

সাধনায় আত্মতত্ব ও দেহতত্ত্বের এই সমন্বয় ; জীবন-যাত্রায়—সমাজ ও ব্যক্তির ধর্ম্ম সমন্বয় ;—আর্থিক ব্যাখ্যাও নয়, ভাববাদী ব্যাখ্যাও নয়, সত্যকারের কর্মযোগীর ব্যাখ্যা।

কেমন গম্ভীর হইয়া গেল মনোজ। জ্ঞান বুঝিলেন কথাটা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, এবার আলোড়িত করিবে৷

সত্যই আলোড়িত হয় মনোজ। সে কর্মযোগী নয় বরং জ্ঞানযোগী। তবু পড়িতে বসিল, ভাবিতে বসিল। জ্ঞান চৌধুরীর সঙ্গে তর্ক ও আলোচনা জমাইয়া তুলিল :—জ্ঞানও একটু আশ্বস্ত হইলেন। দেখিলেন, মনোজের অন্তরে যে গভীর সত্যনিষ্ঠা আছে তাহা যেন একটা কিছু করিবার মত কাজ পাইয়া আবার স্থির শিখায় প্রকাশিত হইল।

কমলা আবার আসিয়াছে। শরীর তাহার একটুও সারে নাই। এখানে কিছু দিন দেখিয়া বরং পিতামাতার নাম করিয়াই কলিকাতা যাইবে—সেখানে ডাক্তার দেখাইবে। জিতেন্দ্র নিজে তাহার পিতামাতার নিকটে এখনো এই প্রস্তাব করে নাই, হয়ত করিতে সাহস পায় না।

কমলা বলে : প্রয়োজন মনে করেন না। বলেন, চিকিৎসার আসলে কিছু নেই। রোগটা নাকি অনেকাংশেই আমার মনের। বাকী অংশ দুরারোগ্য। কাজেই তিনি বল্‌বেন না শ্বশুর শাশুড়ীকে।

জ্ঞান জানেন জিতেন্দ্র বাজে কথা বলিবে না। কিন্তু ইহা সত্য, কমলারও শরীর সারে নাই। জ্ঞানই তাহাকে দেশ হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। তাঁহার নিকটে কমলা দুই দিনেই তাজা হইয়া উঠিবে, ইহা কি জ্ঞানশঙ্কর জানেন না? তাঁহারও দিনগুলি ভালোই কাটিবে—কমলার সান্নিধ্য-সেবায় ;—হৈমও বিশ্রাম ভোগ করিতে পারিবেন।

সত্যই দিনগুলি আবার স্বচ্ছন্দ হইতেছিল। মনোজ তাহার বই, পুঁথি পত্র আলোচনা লইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। কমলার ছেলে ও মেয়ে হৈমকে রাতদিন ঘিরিয়া রাখে, জ্বালাতন করে; কমলা অবশ্য জটিল দৈহিক যাতনা হইতে মুক্তি পায় না, কিন্তু ইহার মধ্যেও কখনো সে পড়ে, কখনো লেখে, আপনাকে ব্যস্ত রাখিতে চায়। বাবার নিকটে বসিয়া তাঁহার নানা কাজে লাগিয়া সে উহারই মধ্যে খুশী হইয়া উঠে। সে বাবারই সঙ্গী—সংস্কৃতে বাঙলায় নানা বই পড়িয়া শোনায় জ্ঞানকে। মনোজ বলিয়া গিয়াছে—বইগুলি জ্ঞান পড়িয়া না রাখিলে তাহাদের আলোচনা-কালে অসুবিধা ঘটিবে।

কিন্তু এই স্বচ্ছন্দ দিনগুলিও হঠাৎ ঠেকিয়া গেল একটা চড়ায়।

সংবাদটা প্রথম আসিল অশোকের নিকট হইতে। পূজার পরে অরুণ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পড়াশুনা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। সে চাহিতেছিল—কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইতে। এখানে এত খেলাধুলা, আর অরুণ খেলিতে পারে না পায়ের জন্য, ইহা তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। তাই সে চাহিত বাঁশী শিখিতে, বাজনা শিখিতে; ইচ্ছা ছিল লক্ষ্ণৌ যায়। তাহা আপাতত সম্ভব হইল না। সে একটা সিনেমা কোম্পানির সঙ্গে, অভিনেতা ও বংশীবাদক হিসাবে এখন বোম্বাইতে গেল।

অশোক লিখিয়াছে, 'তাহাকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়। সত্যই যদি সঙ্গীত ভালো লাগে, দেখুক। আর সিনেমা ত লেনিন বলেছেন,—ভবিষ্যতের প্রধান শিল্প। সোভিয়েটে তার আশ্চর্য রকমের বিকাশও হচ্ছে।'

জ্ঞানশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার ছেলে শেষ পর্যন্ত হইবে পেশাদার অভিনেতা!—একদিন রেলের লোকেরা অরুণকে কাজ দিতেছিল; পুলিশের কর্তৃপক্ষ খেলার জন্য অরুণকে চাকরিতে লইতে

বলিয়াছিল। শুনিয়া জ্ঞান তখন লজ্জিত বোধ করিয়াছেন—শেষে সিনেমার একটর। ইহা যে পুলিশের চাকরীর অপেক্ষাও হেয় কর্ম। জীবনে জ্ঞান নাট্যশালার ছায়া মাড়াইতে চাহেন নাই—ষ্টার থিয়েটরের ভিতরে প্রথম গিয়াছিলেন মিসেস বেসান্টের অপূর্ব বক্তৃতা শুনিতে। সারা জীবনে হয়ত মাত্র ছয় সাতবার তিনি থিয়েটর দেখিয়াছেন। বায়স্কোপ ত বলিতে গেলে প্রায় দেখেনই নাই। স্তিমিত আলো, লোকের ভিড়, সিগারেটের ধোঁয়া, নানা রকমের ফিরিওয়ালার ডাক, চাপা গলায় নানা লোকের নানা কথা, ঘামের গন্ধ, আবদ্ধ বায়ু, বহু লোকের নিঃশ্বাসে ভরা উষ্ণ বাতাস—প্রমোদাগারের নিজস্ব বিলাসিতা আর নিজস্ব ইতরতা—ইহার মধ্যে শরীরও যেন হাঁপাইয়া উঠে। সুস্থ মানুষ এই আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে? আর দেশী ফিল্ম?—সেবার তাহা দেখিয়াছেন জ্ঞান। 'জয়দেব' না কি ছিল, হেম দেখিলেন। কিন্তু তাহারও মধ্যে মার্কিনী ও হিন্দী মিশানো একটা অদ্ভুত ইতরতা গানে, ভঙ্গিতে;—ভক্তির নামে কুৎসিৎ বারাঙ্গনা-বৃত্তির প্রশ্রয় ও ব্যাভিচারের পরিবেশন। যে সব ছবিতে ভক্তি নাই তাহা ত আরও অসহ্য। মার্কিন গ্যাংষ্টারদের অনুকরণে হত্যা গুণ্ডামি পলায়ন, বাঁদরের মত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি! ইহাই নাকি জীবনীশক্তির প্রাচুর্যের লক্ষণ। 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' আর এখন অমি'রা পড়ে না। 'ল্যা মিজারেবল' ফিল্‌ম্ হইতেই তাহাদের পরিচিত। জ্ঞান চৌধুরী সেবার সত্যর ছেলেমেয়েদের দেখিয়াছিলেম ফিল্‌ম-ষ্টারদের ছবি লইয়া বসিয়াছে। দেখিয়া জ্ঞান অবাক হইয়াছিলেন। সত্যকে সে দেখিয়াছিল তাহার পিতার আমলে ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডির ছবি লইয়া বসিতে। সে বক্‌সিং করিত, তলোয়ার খেলিত। আর তাহার ছেলেমেয়েরা মুখস্ত করে মেরি পিকফোর্ড কিংবা রুডল্‌ফ ভেলিন্টিনোর ঠিকুজি কোষ্ঠী। আর এখন

অরুণও হইবে ফিল্‌মের অভিনেতা! কখনো জ্ঞান চৌধুরী তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। অরুণ দায়িত্বহীন—সেই ব্রজবাবুর মেয়ের কাণ্ড, তারপর নিতু মেয়েটির সহিত তাহার আচরণ, তাহা হইতেই জ্ঞান ইহা বুঝিয়াছিলেন। অরুণের ভিতরে অসৎ প্রবৃত্তি না থাকিলেও সারবস্তু নাই। কিন্তু সে ফিল্‌মের অভিনেতা হইবে—এতটা নামিবে! অশোক আবার তাহার সমর্থক—'লেনিন বলিয়াছেন ফিল্‌ম ভবিষ্যতের শিল্প।' পৃথিবীর সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার স্বপক্ষেই অশোকের যুক্তি আছে—হয়ত ইহাই তাহাদের কমিউনিজম্।

হৈমবতী বলিলেন: অশোককে লেখো,—আর নইলে আমিই যাই,—অরুণকে ওসব দলে মিশতে হবে না।

হৈম হয়ত বুঝিতেই পারেন না বোম্বাই কত দূর!

কিন্তু কাহারও যাইবার প্রয়োজন হইল না। অরুণের চিঠিই আসিল মায়ের নিকটে। পড়াশুনায় তাহার আগ্রহ নাই, তাহা ত বাবা মা জানেন। অবশ্য তাঁহারা জানেন—পড়াশুনায় তাহার মাথা নাই। পড়িলে যে সেও ভালোই করিতে পারে, কাহারও অপেক্ষা খারাপ করিত না, এই কথা হয়ত তাঁহারা মানিবেন না। বেশ, মানুন না মানুন, সে আর পড়িবে না ঠিক করিয়াছে। বই অপেক্ষা তাহার নিকট খেলা ও গান-বাজনা বরাবরই বেশি ভালো লাগে। তাই সে নিজের 'লাইন' এবার নিজে গ্রহণ করিল—সে শিল্প চর্চায় মন দিল। কলকাতার একটা নব-গঠিত সিনেমা দলের সঙ্গে সে এখানে আসিয়াছে। সিনেমা কিন্তু আগেকার দিনের মত মাতাল আর অশিক্ষিত কুশিক্ষিতদের 'থিয়েটারী দল' নয়। ইহাঁরা সকলেই সুশিক্ষিত, ভদ্রসন্তান। অনেকেই বিশিষ্ট বংশের পুত্র কন্যা, বধূও। যেমন, জ্ঞানও চিনিবেন,—সত্যধার কন্যা মিলিকে। সেও তাহার স্বামী মিষ্টার দত্তরায় এই দলেরই প্রধান

কর্মকর্তা, অভিনেতা। অরুণকে তাঁহারা বিশেষ ভালোবাসেন—অরুণ খেলিতে জানে, বাজাইতে জানে, তাহার 'সিনেমা ফেস্' আছে। একটা ছোট ভালো ভূমিকায় এবারই অরুণ নামিতেছে; সাধারণত এইরূপ সুযোগ লোকে বড় একটা পায় না। কয়েকটা 'শুটিং' আছে এই অঞ্চলে, কাড়লির গুহামুখেও একটা দৃশ্য তুলিতে হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মূর্খ অরুণ, কিছুই বোঝে না। ইহা ছাড়া আর কি ভাবিতে পারেন জ্ঞান চৌধুরী তাহার সম্বন্ধে?—সেবার কলিকাতায় তিনি শুনিয়াছিলেন সত্যর মেয়ে মিলি দুই বার বাগ্‌দত্তা হইবার পরে এই দত্তরায়ের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে; অথচ দত্তরায়ও পূর্বেই বিবাহিত। মিলি কি করিয়া দত্তরায়ের স্ত্রী হইল—কোন্ ধর্ম অনুসারে? কোন্ আইন অনুযায়ী? যাহার পিতামহ ছিলেন সেদিনের ব্রাহ্ম-সমাজের এমন দৃঢ়চিত্ত নেতা—গৃহ, আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিয়াছিলেন ধর্মের জন্য;—যাহার পিতা ম্যাটসিনি গ্যারিবল্‌ডীর ভক্ত, এখনো পি-মিত্র-অরবিন্দের নামে মাতিয়া উঠেন,—সেই মিলি মাতিয়া উঠিয়াছে সিনেমার অভিনেত্রী হইবার জন্য। গৃহত্যাগ করিল সিনেমার কোনো অভিনেতাকে বিবাহ করিতে! না আছে মিলির বিবেক-বুদ্ধি, না আছে মর্যাদাবোধ! হয়ত রাজীব চৌধুরীর সেদিনের বলিষ্ঠ সমাজ-বিদ্রোহও আজ তাহারই পৌত্র পৌত্রীর মধ্যে পরিণত হইয়াছে এমন নীতি সংযমহীন বিদ্রোহে।—একদিন আদর্শ ছিল 'ইমিটেশন্ অব ক্রাইষ্ট,' আজ আদর্শ ইমিটেশন্ অব হোলিউড্। বিদ্রোহ আপনারই নিয়মে আপনার দেনা শোধ করিতেছে।...এমনি রূপে সেই দেনা শোধ করিতে হইবে কি অমরের? শোধ করিতে হইবে কি অশোকেরও? কিন্তু অরুণ কি করিয়া তাহার পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার ভুলিল?...কোনো দিনই আসলে এই পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা অরুণ গ্রহণ করিতে চাহে নাই—চিরদিনই সে তাহাদের

নিকট পর। হৈম'র নিকট হইতে সে সেবা ও আদর পাইয়াছে। কিন্তু মর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই—হৈম'র বাক্যবাহুল্যহীন শিক্ষা-দীক্ষার সহজ ধর্মবোধের, গভীর কল্যাণ বোধের। মূর্খ সে, মূর্খ! কোনো গভীরতা নাই তাহার জীবনে, কোনো দৃঢ়তা নাই তাহার চরিত্রে, একাগ্রতা নাই কোনো প্রয়াসে। লেখায় নাই, পড়ায় নাই, চিন্তায় নাই, আকাঙ্ক্ষায় নাই। কি বুঝিবে সে শিল্পের—সত্যই শিল্প যদি থাকে সিনেমায়? কোথায় সে সংযম তাহার জীবনে, সে নিষ্ঠা, সে সাধনা?

হৈম'র অনুরোধে জ্ঞান চৌধুরী তবু একবার পত্র লিখিলেন: সিনেমায় তিনি বিশ্বাস করেন না। অভিনেতাকে ভদ্রলোক বলিয়া এই দেশের সমাজ কোনো কালে গণ্য করে নাই। এখনো করে না। অরুণ পড়া-শুনা করিতে না চাহে—অন্য কাজ করুক।—অশোকের ছাপাখানার কাজ দেখুক, নৃপেনের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ও ইনশিওরেনসের কাজকর্মে যোগদান করুক। অবশ্য বি-এ পাশ করিয়া সে এই সব লাইন ধরিলেই ভালো হয়।

অরুণ এই কথায় কর্ণপাত করিবে না, হৈমবতী ইহা ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু সত্যই অরুণ এই কথার উত্তর দিল না;—স্বল্পাক্ষরে জ্ঞানকে জানাইল ব্যবসায়ে তাহার মাথা নাই। হৈম না জানুক, জ্ঞান জানেন—আসলে মস্তিষ্ক বলিয়া জিনিসই অরুণের নাই। পৃথিবীতে জ্ঞানের মুখ আর কাহারও জন্য নোয়াইতে হয় নাই, নোয়াইতে হইয়াছে অরুণের জন্য। তবু সে আসলে ছিল নির্বোধ ও লঘুচিত্ত। কিন্তু এখন কি হইতে চলিল অরুণ?—জ্ঞান চৌধুরী তাহা ভাবিতে চাহেন না। অরুণের কথা না ভাবিতে হইলেই তিনি রক্ষা পান। কিন্তু উপায় ছিল কি? মুখে না বলিলেও হৈম যে রাত্রিদিনই আরও বেশি করিয়া তাই ভাবিতেছেন অরুণের কথা।

এই আঘাতের মধ্যে জ্ঞানকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই আরও তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল কমলা। মনোজকে সে ডাকাইয়া পাঠায় পিতার সাহচর্যের জন্য; আর নিজে সেই আলোচনার পারিপার্শ্বকটি আরও সযত্নে সাজাইয়া রাখে। শুধু কি তাহাই ?—আপনার লেখা গল্প, কথা চিত্র পড়িয়া শোনাইতে নিজেই অগ্রসর হয় জ্ঞানের নিকটে। বিস্ময় ফোটে, আনন্দ জাগে জ্ঞানের মনে। এমনি করিয়াই অমি'ও একদিন তাহার পিতার কাছটিতে আসিতে ছিল কিন্তু আসিল না। কমলা এখনো আগাইয়া আসিতে পারিল—আরও সে স্থির বুদ্ধি, আরও তীক্ষ্ণ তাহার অনুভূতি ও চেতনা। কে জানিত সত্যই সেও অশোকের মত সাহিত্য প্রতিভার অধিকারিণী ?—অথচ, কতদূরে চলিয়া গিয়াছে অশোক। আর আরও কতদূর আশৈশব তাহার পিতার নিকট অরুণ! কিন্তু বিবাহে গোত্রান্তরে শত দূরত্বেও দূর হয় নাই কমলা। দূর হইবে না তবে অমি' ও—কন্যা রহে কন্যা চিরদিন!

৯

কোনখানে যে হঠাৎ ভূমিকম্প হইল, ঐশ্বর্যের বিপুল সমারোহ ধসিয়া গেল, তারপর চিড় খাইয়া ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল দূর দুরান্তরের প্রাসাদ, ভদ্রাসন, কুটির—তাহা জ্ঞান চৌধুরী জানিবার কথা নয়। হয়ত সময় থাকিতে কতকটা তাহা বুঝিয়াছিল সুরেশ্বর। আর তাহা অনেক পরে জানিল অমর, অশোক :—ট্রেড সাইক্‌ল্ অনিবার্য নিয়মে মন্দায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু উহা বুঝিবার পূর্বেই ভরাডুবি হইল নৃপেনের। শীঘ্রই কথাটা আর চাপিয়া রাখা গেল না। ফটকা বাজারে খেলিতে খেলিতে সে এতদিন সচ্ছল ভাবে চলিয়াছিল। ব্যবসা মন্দার প্রথম ধাকাতে গা করে

নাই, ছাপাখানাটাকেই বন্ধক দিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছে •কিন্তু গা যখন করিতে হইল তখন আর পথ নাই। সে ডুবিতে বসিয়াছে; ব্যাংকের অজ্ঞাতে তাহার টাকা ভাঙিয়া শেয়ারের টাকা সে জোগাইতে চাহিয়াছিল।

জ্ঞান ও হৈম একই সঙ্গে এবার সরযূর চিঠি পাইলেন। চিঠি সরযূর হইলেও বক্তব্য সরযূর নয়। কিন্তু বাবা মা কি উদ্ধার করিবেন না তাঁহাদের জামাই মেয়েকে, দাদা দিদিমণিদের? ব্যাংক যে না হইলে নৃপেনকে জেলে দিবে! শেয়ার মার্কেটের ফেরেই নৃপেনের এই সাময়িক দুর্ভাগ্য, না হইলে ইত্যাদি।

মাথায় বজ্রাঘাত হইল। ন্যাশন্যাল ব্যাংকের পতনে এখনো কাঁপিতেছে স্থানীয় ব্যাংক লোন আপিস। জ্ঞান চৌধুরী উহার অন্যতম কর্তৃপক্ষ; কিন্তু উহার নিকট ঋণগ্রস্তও। আরও ঋণ চাহিলে এই কোম্পানি এখন দিতে পারিবে না।

সুরেশ্বর পত্রোত্তরে জানাইল—অনেক দিন নীরব থাকিয়া—নৃপেন ফটকা বাজারে আসলে জুয়া খেলিতেছিল, সে বিজনেস করিতে চাহে নাই। ব্যাংকের টাকা উহাতে লাগান গুরুতর অপরাধ। কিন্তু সেই জুয়া শেয়ারের পিছনে আরও টাকা ডুবাইয়া জ্ঞান লাভ পাইবেন না। তবে ব্যাংকের টাকাটা নৃপেনের শোধ করা দরকার। সুরেশ্বর নিজে অবশ্য রিক্ত হস্ত, মন্দার বাজার, তাহার ব্যবসাপত্রও নানাভাবে বিপন্ন।

হয়ত সুরেশ্বর মিথ্যা লিখে নাই। কিন্তু ততদিনে সমস্ত সঞ্চিত পুঁজি আর আরও কিছু ঋণকৃত অর্থ জ্ঞান চৌধুরী নৃপেনকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আর পাঠাইতে পাঠাইতে জানিয়াছেন--নৃপেন যদি বা উদ্ধার পায় জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী আর জীবনে বেশি দিন এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন না।

অন্ধকার হইয়া গেল সমস্ত গৃহ। আর কথা, গল্প কোনো কিছুতে জ্ঞান চৌধুরী আগ্রহ বোধ করেন না। কমলা আসিয়া বসে তাঁহার

কাছটিতে—কিন্তু বসে এখন সন্তর্পণে, আগেকার মত নিশ্চয়তা নাই যেন তাহার মনোভাবে। মনোজও আর জ্ঞান চৌধুরীকে সমস্যা তুলিয়া উত্যক্ত করিতে চাহে না। দেখিতেছে না কি তাহারা সেই উদ্বিগ্ন মুখের ক্লান্ত দৃষ্টি? বিজয় সমস্ত বুঝিয়াই সময় পাইলে আরো বেশি করিয়া জ্ঞানের নিকট ছুটিয়া আসে। কিন্তু কংগ্রেস আসিতেছে, কাজ তাহার অনেক। যে করিয়াই হউক্, এবার গান্ধীজীকে বাধ্য করিতে হইবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে। জ্ঞানকে সময়ে অসময়ে আসিয়া সে এইসব শুনাইয়া যায়। বিজয় চুপ করিয়া থাকিতে দিবে কেন জ্ঞান চৌধুরীর মত অমন মানুষকে? তাঁহাকে সব কাজে চাই।

বড়দিন আসিতে না আসিতে অমিতাও মা-বাবার নিকট আসিল। এখানে না আসিলে তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সত্যই কেমন অস্থির ও উত্তেজিত সে, পূজার সময়ে তাহার মুখে যতীন দাসের আত্মদান আর ভগৎ সিং ছাড়া কথা ছিল না। এবার সে বিষয়ে সে নিস্তব্ধ, কিন্তু আরও ক্ষুব্ধ তাহার মন।

কমলার সঙ্গে সামান্য কারণে অমিতা কলহ করিল: তুমি যখন বাবার কাছে বসে মনোজদা'দের সঙ্গে গল্প করো, মনোজদা' এলেই তোমার লেখা নিয়ে ছোটো; তখন ত তোমাকে আমি ড'াক দিতে যাই না। আমি পথে বেরোচ্ছি, না লাইব্রেরীতে যাচ্ছি, না কোথায় যাচ্ছি,—সুমন্ত্রের সঙ্গে কথা বলছি, না শেখরের সঙ্গে গল্প করছি,—তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন? তুমি কি বই পড়ো, কি কবিতা লেখো, তা আমি দেখতে যাই? নিজে ঠিক থাকো না ততক্ষণ। আমি কারও বিয়ে করা স্ত্রী নই, কবরেজ বাড়ির বউ নই। আমার নিজের দায়িত্ব আমার, তোমার নয়। না, মা'রও নয়। বাবার যদি হয় তা তিনি বল্‌বেন—তোমরা কে? তোমরা মেয়েরাইত তাঁকে পথে বসিয়েছ—

বড় অসংগত উক্তি। জ্ঞান চৌধুরী অমিতাকে শাসন করিলেন, একি তোমার উপযুক্ত কথা অমি'? মেজদি'কে এমন অকারণে এতগুলি বিশ্রী কথা বললে।

কিন্তু একটু তিরস্কার করিতে না-করিতেই অমিতা কাঁদিয়া ফেলিল! সবাই কেবল তাহাকে শাসন করে। কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। শেষে বাবাও কিনা তাহাকে দোষ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মহা বিপদ হইল জ্ঞানের। মেয়েটা বরাবরই পাগল, অভিমানী। আরও যেন ক্ষ্যাপামি তাহার বাড়িয়া যাইতেছে দিনে দিনে। পিতার উদ্বেগই অমিতাকেও এবার এতটা অধীর করিয়া তুলিয়াছে। জ্ঞান অমিতাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন, তবু কোথায় যেন বাধা পান। অমিতাও আপনার নিজস্ব আনন্দে, অভ্যস্ত ছেলেমানুষিতে আর তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিবে এমন সাধ্য কি? সেবার পিতামাতার কথা অমান্য করিবার পর হইতেই ত একটা দূরত্বও আসিয়া গিয়াছে তাহার সহিত পিতার ও মাতার আচরণে। আর কি অমি' তেমন স্বচ্ছন্দে পাগলামি করিতে পারে মাতার সহিত? আব্দার করিতে পারে পিতার নিকটে? কি করিয়া পারিবে?

জ্ঞানশঙ্করের জীবনের কাঠামোই বুঝি এইবার ভাঙিয়া যাইতে শুরু করিল—নৃপেনের ও সরযূর সৃষ্ট এই আর্থিক দুর্যোগে। বাড়িতেও এখন কেমন একটা অস্বচ্ছলতা। কিসের উপর তিনি দাঁড়াইবেন—এবার এই বয়সে? অথচ জীবনের কোন কর্তব্য তিনি সমাপ্ত করিতে পরিয়াছেন? ছেলেরা হয়ত মানুষই হইল না। মেয়েরাও সকলে এখনো পাত্রস্থ হয় নাই। ভাবিয়া লাভ নাই, তবু অমিতার কথা ভাবিতে হয়। আর হৈম? ভবিষ্যতের কোন্ সুনিশ্চিত আশ্রয়ই বা জ্ঞান তাঁহার জন্য রচনা করিতে পারিয়াছেন?

বিজয় লাহোর কংগ্রেসের ফেরৎ কথাটা শুনিয়া আসিয়াছিল, এখন দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। বারাহীপুরের জমিদারী দেনার দায়ে বাঁধা পড়িয়াছিল, এখন ছোটরাজা তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন মারোয়াড়ীর নিকটে—নগদ টাকা লইয়া তিনি আপাতত বৎসরখানেকের মত বিলাত চলিলেন। 'বিজনেসে' ছোট রাজা বহুদিন হইতেই নামিয়াছিলেন। কিন্তু সে 'বিজনেস' আসলে শুধু কয়লার খনিতে বা কল কারখানায় নয়। সত্য চৌধুরীর কথামত কিছু কিছু ছিল একস্‌পোর্ট ইম্‌পোর্ট, কিন্তু আসল ঝোঁক শেয়ার মার্কেট। তাহারই ফলে তিনি এখন ডুবিতে বসিয়াছেন। কিন্তু আরও তিনি চটিয়া গিয়াছেন প্রজাদের বিদ্রোহে—সেবারে বড় রাজার কথায় শুয়োচকের প্রজাদের অনেক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজারা তবু থামিল না। ছোটরাজা তাই এখন আর এই সব ঝামেলা পোহাইতে ইচ্ছুক নন—প্রজারাও বুঝিবে এবার মজা।

শেষ পর্যন্ত ছোট রাজা এই করিলেন?—মাড়োয়াড়ীর হাতে প্রজাদের তুলিয়া দিয়া চলিলেন বিলাত! জ্ঞানশঙ্কর যেন ভাবিতেই পারেন না রাজাদের এই অধঃপতন!

ম্যানেজার বাবু কলিকাতা গিয়াছিলেন। রঙ্গলাল মনসুখলাল বলিয়াছেন, খরচপত্র কমাইতে হইবে। তাহারা বাঙালী 'রাজা' নয়,—মহাজন, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার। বাজে চাল তাহাদের জন্য নয়। শহরের বাড়িগুলির দিকেই তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে প্রথম। বলেন, এগুলোর ভাড়া বাড়াও।—

কুমুদের দাদা প্রমোদ ছোট ম্যানেজার হইয়া আসিতেছে। সে ম্যানেজারবাবুদের কুটুম্বও। ম্যনেজার বাবু বলিতেছেন, প্রমোদ নিজের জন্য এই বাড়িটাই চাহিতেছে। শেঠজীও তাহাই বলিয়াছেন।

বিজয় বলিল: কিছুতেই ও কথা কানে তুলবেন না।

কিন্তু বিজয়ের অবকাশ নাই—লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গৃহীত হইয়াছে; 'স্বাধীনতা দিবস' ঘোষিত হইয়াছে। তাহার সংকল্পবাণী রচিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে শিক্ষিত মানুষের মনে একটা আশা উৎকণ্ঠাও জাগিয়াছে। 'আইন-অমান্য আন্দোলন' নির্ধারিত; বড় রকমের একটা সংগ্রাম অদূরেই; আর স্বরাজ নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই এইবার গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনে নামিবেন। মনোজ্ঞের অবশ্য তাহাতে ঔৎসুক্য নাই, জ্ঞান বিজয়ের কথায় সাড়া দিতেও অক্ষম—বয়সে বিপদে বুঝি আর সে তেজও নাই। বিশ বৎসরের অনেক ব্যর্থতা ও অনেক স্বপ্ন বিজয়কে আজ সবলে নাড়া দিয়াছে—এতদিনে সত্যই দেশ অন্তত সাহস করিয়া স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিতে পারিল। কথাটা ঘরে বসিয়া চুপি চুপি উচ্চারণ আর করিতে হয় না, যেমন উচ্চারণ করিত বিজয় তাহার প্রথম যৌবনে। শুধু আর দুই দশজন কিশোর ছাত্র ও যুবকের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ নাই দেশের এই স্বাধীনতার প্রেরণা—বিশাল কংগ্রেসের সহস্র সহস্র মানুষ সে সাধনায় আজ উন্মুখ। হয়ত অশোকের কথাও সত্য, আরও লক্ষ লক্ষ মানুষও ক্ষেত হইতে, কারখানা হইতে, স্কুল হইতে আপিস হইতে আসিয়া জুটিবে—সত্যই যখন গান্ধীজী এবার পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। অশোক তাহাতে বিশ্বাস না করুক, উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। অহিংসায় আস্থা না থাকুক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সুমন্ত্র ও শেখরেরা। বিজয়ের সহিত অনেক আলোচনা তাহাদের এখনো বাকী। কিন্তু ইতি-মধ্যে 'ছাব্বিশে জানুয়ারী' আসিতেছে, গবর্ণমেণ্ট চুপ করিয়া নাই।

সুভাষবাবুকে আগেই তাহারা কারারুদ্ধ করিয়াছে। 'স্বাধীনতা দিবসের' কার্যক্রম ও স্বাধীনতা সংকল্প লইয়া সুমন্ত্রদেরও এখনি জেলার গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে হইতেছে। সুমন্ত্রদের সঙ্গে বিজয় তর্ক করিবে পরে ;—জ্ঞান চৌধুরী মনোজ্ঞ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সে বারাহীপুরের বা স্কুলের কথা পরেও আলোচনা হইতে পারিবে,—আপাতত চাই এই প্রথম 'স্বাধীনতা দিবস' প্রতিপালিত করিয়া দেশের মানুষকে আশায় উৎসাহে সচল করিয়া তোলা। তারপর ?—তারপর—'আসিবে সেদিন আসিবে।'

বিজয় চিরদিনেরই সেই বিজয়—স্বাধীনতার নামে মাতিয়া যাইতেছে। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত। পড়েন—it is a 'crime against man and God to submit any longer,' বারে বারে জ্ঞান চৌধুরী পড়িতেছেন স্বাধীনতার 'সংকল্পবাণী' —বারে বারে ভাবিতেছেন। আজ তাঁহার দেহ জীর্ণ, মন অবসন্ন, শতাব্দীর উষাকালের তেজোবীর্য্য আশা আগ্রহ কিছুই আর নাই। কিন্তু তবু এ সংকল্পবাণীর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যেন তিনি আপনারই এই ষাটবৎসরের জীবনের সাক্ষ্য পাঠ করিতে পাইতেছেন। ভারতবর্ষের 'চতুর্বিধ এই সর্বনাশ'—ফোরফোল্ড রুইনেশন অব ইণ্ডিয়া—তাহার রাষ্ট্রীয় দাসত্ব, তাহার আর্থিক শোষণ, তাহার নৈতিক আর আধ্যাত্মিক পতন,—ইহা জ্ঞানশঙ্করের নিকট একটা পুঁথিগত শিক্ষা নয়—শুধু একটা বিদেশীয় শাসক শক্তির বিরুদ্ধে বাক্‌-চাতুর্য নয়,—ইহা ত তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধি। হাঁ, এই ষাট বৎসরের জীবনের মধ্য দিয়া প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে উহা তাঁহার মনে গভীর মর্মন্তুদ সত্যে পরিণত হইয়াছে ; তাঁহার চেতনায় তাঁহার অভিজ্ঞতায় রহিয়াছে এই সত্যের রক্তাক্ত স্বাক্ষর। রাষ্ট্রীয় দাসত্ব—যৌবনের দিনে জ্বালাময় বেদনা ছিল তাঁহার নিকটে। আর্থিক শোষণ—সে দাসত্বের গ্লানিকে আরও নৃশংস ঘৃণ্যই করিয়া

তুলিয়াছিল তাঁহার বুদ্ধি মার্জিত মনে। কিন্তু নৈতিক আর আধ্যাত্মিক পতন—এই দুই সত্য কি বুঝিতে পারিতেন জ্ঞানশঙ্কর এই পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ হইতে যাট বৎসরের নিকটে পৌঁছিবার পূর্বে ?—বুঝিতে পারিতেন তাহা না দেখিলে সুরেশ্বরের ব্যবসায়িক ইতরতা, লোভ, নৃপেনের এই আভিজাত্যহীন চালাকি,—বারাহীপুরে রাজাদের এই অধঃপতন ?—না দেখিলে, সত্যই আপন অভিজ্ঞতায় না বুঝিলে, নিঃস্বার্থ অমরের এই মিথ্যা আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদের মোহ ; লঘুচিত্ত অরুণের এই বোধলেশহীন নৈতিক নিশ্চেতনতা ; চিন্তাশীল হৃদয়বান্ অশোকের তিলে তিলে এই আধ্যাতিক অপমৃত্যু ? 'চতুর্বিধ সর্বনাশ' আর কাহাকে বলে ?—কে-ই বা আর তাহা ঠেকাইতে পারে—আমাদের মেয়েরা ? হৈম কাদম্বিনী ? কমলা অমিতা ? জ্ঞানের মতই দিন গিয়াছে হৈম'র ও কাদম্বিনীর। এখন কোথায় সে শক্তি আর এই বুদ্ধিমতীও এই মমতাময়ী কমলার ?—শ্বশুরগৃহে সে ফিরিয়া যাইবে—আপন গৃহভার গ্রহণ করিবে। অস্থির চিত্তা অমিতারই বা কি সাধ্য আছে ? অভিমান বেদনায় অমিতা সতত চঞ্চল, এ কালের নানা উত্তেজনায় উত্তেজিতা। সংসারেই কি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে সহজে এই পাগলী মেয়ে অমিতা ?…কে ঠেকাইতে পারিবে এই ক্রম-অধোগতি তাঁহার আপন গৃহে ?…ঠেকাইতে কে পারিবে এই ধ্বংস সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে ? কে ? এই বিজয়েরা ?—গান্ধীজী ও তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় ?…দেখিলেন ত জ্ঞান সেদিনও কলিকাতার 'সর্বদলীয় সম্মেলনে' সকলের দলগত কলহ।—কোথায় সেই প্রবুদ্ধ মানুষের জাতীয় ঐক্য ?…

কত সত্য তাহার এই 'চতুর্বিধ বিনাশ'।…

কমলা স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের সভায় গেল। নীরবে জ্ঞান চৌধুরী আপনার গৃহে বসিয়া স্বাধীনতার সংকল্পবাণী স্মরণ করিতে করিতে

কামনা করিলেন—সত্য হউক, সত্য হউক, এই সংকল্প, হে ভগবান।

সময় না থাকিলেও বিজয়কে মাথা দিতেই হইবে,—জ্ঞান চৌধুরী সত্যই আরও বিপদে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। হেডমাষ্টার শশীকান্ত বাবু পীড়া ও বার্ধক্যের জন্য বিদায় লইয়াছিলেন। পূজার পরে তিনি আর আসিবেন না, তাহা অনেকেই বুঝিতেছিল। তাহার পদে জ্ঞান ও বিজয়ের চেষ্টায় সাময়িক ভাবে মনোজকে নিয়োগ করা গিয়াছিল। গণেশ, কুমুদ বাধা দিলেও মনোজকেই স্থায়ী করা যাইবে এক বৎসর পরে। কিন্তু কে জানিত যে, শশীবাবুর পীড়ার সুযোগে অভাবগ্রস্ত কেরানী স্কুলের হিসাবপত্রে এমন গোলমাল ঘটাইয়াছে? মনোজ স্কুলের হিসাবপত্র প্রভৃতিতে বরাবরই উদাসীন—কিছুই দেখে নাই।

গণেশবাবু যখন হিসাবে গোলযোগ ধরিলেন তাহারই পূর্বে কী যেন হইয়াছিল মনোজের! কিন্তু তাহার পরে হঠাৎ মনোজ শহর ছাড়িয়া বাড়ি চলিয়া গেল। জ্ঞানশঙ্কর অসহায় বোধ করিলেন। হিসাবের গোলমাল শশীবাবুর আমলের। কেরানীই তাহার জন্য প্রধানত দায়ী, মনোজের দোষ নাই। কিন্তু হঠাৎ মনোজ উধাও হইয়া গেল কেন? এখন সমস্ত দোষই লোকচক্ষে জ্ঞানের উপর আসিয়া পড়িল। বলিবে, জ্ঞান চৌধুরী সেক্রেটারি, এই সেক্রেটারির বাড়িতে হাজিরা দেওয়া ছাড়া কোনো কাজেই এ সময়ে মনোজের উৎসাহ দেখা যায় নাই।

বারাহীপুরের ম্যানেজারবাবুর দলটাও এইবার এই ঘোট পাকাইয়া তুলিতে ছাড়িল না। জ্ঞান এই বিপদ দূর করিবেন কিরূপে? গণেশ বাবু বার লাইব্রেরীতে বলিতেছেন: 'ওহে মরতে মরে কেরানীই। দেখো নাই মেডিকেল কলেজে বার্ণার্ডোর ব্যাপার।' এই কদর্য ইঙ্গিতের

পরে জ্ঞান স্থির করিয়াছিলেন, তিনি স্কুলের সেক্রেটারী ও সদস্য পদ ত্যাগ করিবেন।

শুনিয়া তখন বিজয়ের মাথায় টনক নড়িল: সর্বনাশ করবেন না, কাকাবাবু। জানেনই তো, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হল গণেশ বাবুকে সেক্রেটারি করে স্কুলটা হাত করা—যেন মাষ্টার বা ছাত্র কেউ আর মাথা তুলতে না পারে।

সত্যই কি স্কুলটা শেষ পর্যন্ত ঐরূপ গোলামখানা হইবে? জ্ঞান চৌধুরী তাহাও ভাবিতে পারেন না।

কিন্তু মনোজের হইল কি? বিজয় বিরক্ত হইয়াছিল, মনোজকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে দেশের বাড়ীতে গিয়া বসিয়া আছে। কেমন বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, কথা বলে না, কাজ করিবে না। বিজয় তাহাকে নিজের গৃহে লইয়া আসিল, তাহার নামে টাকা জমা দিল, ছুটির দরখাস্তও করাইল। কিন্তু মনোজ বিজয়ের গৃহেই বসিয়া রহিল। জ্ঞানের সহিত দেখা করিতেও আসে না। কি হইল মনোজের? অধ্যাত্মতত্ব লইয়া আলোচনা করিতে করিতে উন্মাদ হইয়া গেল নাকি? ছিট্ তাহার বরাবরই ছিল। জ্ঞান নিজেই তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। এমন মেধাবী মানুষটা—এমনটা তাহার সততা! হইল কি?

আমার মাথা স্থির নেই—আমাকে এখন ছেড়ে দিন।—অনেক প্রশ্নের উত্তরে মনোজ বলিল।

কিছু কাজ করো, স্কুলে আবার যোগ দাও—তবেই ত মাথা স্থির হবে।

আমি কাজ করতে এখন পারব না।

কাজে লাগলেই দেখবে করতে পারছ।

কিন্তু মনোজ শুনিল না। সে পদত্যাগ করিতেই বদ্ধপরিকর। কোনোরূপে ছুটি লইতেও রাজী হয় না,—এমনি পাগল।

পাগল হইয়া যাইবে না তো শেষটা, মনোজ ?

হৈম বলিলেন : বাড়িতেই যাক না। বরং বিবাহাদি করুক।

হৈমবতী কোনো কথা বলেন না—বহু আয়াসে তিনি আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন। না রাখিয়া লাভ কি ? মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে জ্ঞানশঙ্করের।—তাঁহার সমস্ত সঞ্চয় শেষ হইয়া গিয়াছে : শরীর দিনে দিনে ক্ষয় পাইতেছে, ছেলেরা কেহ কিছুই করিবে না ; ইহার উপর মেয়েরা এখন এমন ভাবে তাঁহাকে আঘাত করিলে আর বাঁচিতে পারিবেন কেন মানুষটা ? সরযূ আর নৃপেন তাঁহাদের নিঃস্ব করিয়া দিয়াছে ;—অমিতা তাঁহাকে অপমানের একশেষ করিয়াছে। কমলাই তাঁহার সান্ত্বনা—এই সময়ে।

হৈমবতী বুঝিয়াছেন—বুদ্ধির বলে, বিদ্যার আগ্রহ ছিল বলিয়া, কমলা জ্ঞানের ইদানীং আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে। সে নাকি পদ্য ও গল্প লেখে—নিজ নামে নয়, কিন্তু কোন্ ছদ্ম নামে ; সেই গল্প প্রকাশিত হয় কলিকাতার মাসিকপত্রে। অশোক তাহাকে উৎসাহ দিয়া লেখে ; মনোজ তাহাকে লাইব্রেরী হইতে বই পত্র জোগায়,—তাহার লেখা কাটিয়া কুটিয়া শুদ্ধ করিয়া দেয়। জ্ঞান শোনেন, কমলাকে উৎসাহ দেন সকল চেষ্টায়। হৈমবতী আপত্তি করেন করেন নাই। কিন্তু তবু একটু বাড়াবাড়ি ঠেকিতেছিল তাহার নিকট। কমলার ছেলে ও মেয়ে দুইটি রহিয়াছে, অবশ্য হৈম'র নিকটেই তাহারা বেশি সময় থাকে, হৈমও তাহাদের ছাড়িতে চাহেন না। তবু সত্যাই, অত কি কমলার লিখিবার নেশা, পড়িবার নেশা ? কেন অমন উন্মনা, ভাবনা, তন্ময়তার ভাব ? তাহাদের শ্বশুর বাড়িতে পুরাতন

ধরনের হাল-চাল! বইপত্রের চর্চাই সেখানে বেশি নাই। কমলা এখানে বসিয়া গল্প ও পদ্য লিখিতেছে শুনিলে কি বলিবেন তাহার শ্বশুর? আর জামাই বা কি মনে করিবে? কমলা কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছে?

কমলা রাগ করিত! সে আমি আর ভাবতে পরি না, তোমরাই ভাবো। ও বাড়িতে লিখতে বাধা, পড়তে বাধ,—বাধা নাই কিসে সেখানে?

হৈম বোঝেন, সত্যই বড় সেকেলে জিতেন্দ্ররা। সে ডাক্তার মানুষ, তবু কমলার ঠিক সময়ে ঠিক মত চিকিৎসাও তাহারা করিল না।

কিন্তু তবু হৈম কতটুকু জানেন সংসারের?…

দুপুরের দিকে খিড়কীর পুকুর হইতে গা ধুইয়া আসিয়াছেন হৈমবতী। উঠোনে চোখ পড়িতে দেখিলেন কে যেন—ও মনোজ! কিন্তু একেবারে ছোট ঘরের দুয়ারে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া কেন? বাড়ির ভিতরে—ঘরের দুয়ারে—একা—এ সময়ে! হৈমর বুক কেমন আতঙ্কে ঢিব ঢিব করিতে লাগিল। কণ্ঠ হইতে কোন রূপে বাহির হইল একটা বাজে কথা—'রান্না ঘরটায় শিকল না দিয়েই গিয়েছে দেখছি বংশী।'

বুক কাঁপিতেছে;—রান্না ঘরেরই শিকল লাগাইতে লাগিলেন তবু হৈম। কি ভয়, কেন এই ভয়, তাহা যেন তিনি জানেন—শত অভাবনীয় হইলেও জানেন।

হৈমবতী ফিরিয়া যখন দাঁড়াইলেন তখন মনোজ চলিয়া যাইতেছে, একবার হৈম তবু প্রাণপণ চেষ্টায় বলিলেন: কে? মনোজ না? এ সময়ে?

হাঁ, এমনি—

মুখ তুলিতে পারিল না কেন মনোজ? কথা বলিতে পারে না,—পলাইতে চাহিতেছে। তবু মনোজ একবার বলিল—

একটা বই দরকার ছিল। ওঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখছি—

মিথ্যা কথা তাহার অনভ্যস্ত; মোটেই তাহা সত্যের মত শোনায় না মনোজের কণ্ঠে। সেও বুঝি তাহা জানে।—বুঝি তাহা আরও পাঠ করিল হৈমর চক্ষে। সে দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ, অভিযোগে অবিশ্বাসে এত নিষ্ঠুর কঠিনও হইতে পারে? মনোজ পালাইয়া যাইতে চাহিল কোনো রূপে। তবু কোনো রূপ একবার হৈমবতী তাহাকে শোনাইতে পারিলেন: স্কুল চলছে, দুপুর বেলা,—এসময়ে বইএর খোঁজ—কেমন!

মনোজ দাঁড়াইল না; চলিয়া গেল। হৈমবতী দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন—ভিতরে কি করিতেছে কমলা?—লিখিতেছে? পড়িতেছে? না, কমলাও হৈমকে বলিবে—সে ঘুমাইতেছিল?

কমলা কবাট খুলিল। লেখা নয়, পড়া নয়, চোখে ঘুমও নয়, দুই চক্ষু ভরা জল। খুলিয়াই ছুটিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল ঘরের মধ্যে আপনার শয্যায়।

. ঘরের মেজে হৈমবতী একা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি বলিবেন, কি বুঝিবেন তিনি। কিছুই ভাবিতে পারেন না, ভাবিতে সাহস করেন না।

ধীর পদে হৈমবতী কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারও মনে ঝড় বহিতেছে:—বিধাতা, এত কী কঠোর শাস্তি দিবে তাহাকে?

কি? কি হয়েছে, বলো।

কিন্তু শুধু উদ্বেলিত অশ্রুর বন্যায় কমলার দেহ কাঁপিতেছে—কথা মুখে ফোটে না। অনেক—অনেকক্ষণ পরে তাহার মুখে ফুটিল প্রথম কথা:

আমায় রক্ষা করো, মা।—বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

আপনাকে অন্যের হাত হইতে রক্ষা করা যায়, সেইরূপ রক্ষা কমলা করিয়াছেও। সে এই দেশের মেয়ে, এই বাড়ির কন্যা, পুরাতন সম্মানিত সংসারের বধূ। কিন্তু সে বুঝিয়াছে আপনাকে আপনার হাত হইতে রক্ষা করা বড় কঠিন, বড় অসম্ভব। এই সত্যই তাহার নিকটে আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে— নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ যখন মনোজ আসিয়া গৃহের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহার চক্ষে কেমন দৃষ্টি। যুদ্ধ-পরাহত সৈনিকের ব্যথিত আবেদন, আর বুঝি আশ্রয়ের আকুলতাও। এই দৃষ্টির নিকট কমলা পরাহত হইবে, এক মুহূর্তেই সে তাহা বুঝিল। তাই ছুটিয়া ঘরে আসিয়া সে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। চোখ ঢাকিয়া রাখিল, ইচ্ছা করিল কানও বন্ধ করিয়া রাখে—পাছে দুয়ারের ডাক কমলার শুনিতে হয়। মাথা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।—

মনকে কাটিয়া সে খান খান করিয়া ফেলে। নিমেষ ত নয়? কত জন্ম যুগ যেন।

তাহার পরে কমলা শুনিতে পাইল মায়ের কণ্ঠ:—বাঁচিল সে বাঁচিল। আর চক্ষু উপছাইয়া তখন কান্না ভাঙিয়া পড়িল। মা তাহাকে রক্ষা করুন্।

কিন্তু আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে না পারিলে কে রক্ষা করিবে তাহাকে?

কয়দিন পরেই কমলা শ্বশুর গৃহে ফিরিয়া গেল।—হৈম ও কমলা জ্ঞানকে তাহাতে রাজী করাইয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানকে বলিতে হইবে নাকি সব?

হৈমবতী বুঝেন না—বলিয়াও ,তিনি করিবেন কি? বিধাতা কমলাকে শক্তি দিন্। শক্তি দিন্ হৈমবতীকে। এই দুঃস্বপ্ন যেন হৈম আর ওই মানুষের মাথায় চাপাইয়া না দেন। অনেক, অনেক দুশ্চিন্তা জ্ঞানশঙ্করের।

তাই, হউক মনোজ্ঞ বিক্ষিপ্ত চিত্ত; হৈম কিছু বলিলেন না জ্ঞানকে।

বার লাইব্রেরীতে কাগজ পড়িতে পড়িতে তখন গণেশবাবু বলিলেন, এই যে জ্ঞান। ওহে অমিতা চৌধুরী কে হে? তোমার মেয়ে অমি'? তাই ত, ঠিক বলেছে তবে কুমুদ। কিন্তু মিলন সেন?—সেই কালচিতার সেনেদের বাড়ির নাকি? জানো না? না, কিছু হয় নি। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে একটা চ্যারিটিতে তাদের নাচের ব্যবস্থা ছিল। কচ ও দেবযানী নৃত্য। কাগজে প্রশংসা বেরিয়েছে। আমি জানতাম জ্ঞান, তুমি ও-রসে বঞ্চিত। কিন্তু দেখছি তোমার বাড়িটা নাটকে ছবিতে, গল্পে সাহিত্যে, নাচে গানে বাজনায়—একেবারে হৈ-হৈ ব্যাপার।

জ্ঞান চৌধুরী হাসিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথায় যেন কেমন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একি কাণ্ড অমিতার? একটু বুদ্ধিও নাই? আর, অশোকই বা করে কি? কোন খোঁজ রাখে না সে নিজের ভগ্নীর?—উদ্ধার করিতেছে দুনিয়ার শ্রমিককে। কথাটা তখনকার মত চাপা পড়িয়া গেল কাজে কর্মে, বৈষয়িক গোলমালে।

এখন অশোকের পত্র আসিল। মিলন সেনের নাম শুনিয়া থাকিবেন বাবা মা। কালচিতার মহেন্দ্র সেনের ছেলে—এম্-এ পড়িতে পড়িতে সে

বিলাত গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে কি একটা অসুখে পড়ায় ফিরিয়া আসে দু'একবৎসর পরে। এক সময়ে বাংলা কবিতা লিখিত। সুশ্রী যুবক, নাচও সে জানে; নতুন রেডিও কোম্পানিতে কাজ করিতেছে।—অমিতা তাহাকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে। অবশ্য সেনেরা বৈদ্য; আর চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ। তবু হিন্দু বিধবা চলে; বিবাহ করিলে রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ করাই হয়ত শ্রেয়ঃ।

জ্ঞান চৌধুরীর হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেক তিনি সহ্য করিয়াছেন —অনেক, অনেক। ধন নাই, জন নাই, মানও যাইতেছে; কিন্তু একি ভগবান্! একি? এ কি পরিহাস তাঁহার সহিত নিয়তির? একি ক্রূর পরিহাস তাঁহার সহিত অমিতার?—চিত্রিসারের চৌধুরীদের মেয়ের বিবাহ কালচিতার সেনেদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে? বৈদ্য আর ব্রাহ্মণের কথা নয় শুধু, জাতি গোত্রের কথা নয় মাত্র;—চিত্রিসারের আর কালচিতার কথা, চৌধুরীর আর সেনেদের কথা—বহু বহু দিনের কুলগত মান অপমানের কথা,—দ্বন্দ্ব-বিরোধ রক্তপাতের কথাও।

একশত বৎসরও হয় নাই, কালচিতার সেনেরা দশশালা বন্দোবস্তের জোরে এই অঞ্চলের কর্তা হইয়া উঠেন। শঙ্কর চৌধুরীর বংশধরেরা ভৌমিকত্ব খোয়াইতে খোয়াইতে তখন নামিতেছে জীবিকার্থীর স্তরে। নূতন প্রতাপ তখন সেনেদের। চৌধুরীদের গৃহিণী অষ্টভুজার পূজা দিয়া ফিরিতেছিলেন পূর্ব বেল-তলা হইতে। কালী সেনের ছেলে আসিয়া পালকি আটকায়। সেনেদের ছেলে নসু সেন বলিল: 'খোল পাল্কী, দেখি তোদের চৌধুরী ঠাকরুণকে।' মুখেই শুধু বলিয়াছিল। গৃহিণী প্রতিজ্ঞা করেন—'নসু সেনের রক্ত না দেখে চৌধুরী বাড়িতে উঠব না।' তিনি বসিয়া রহিলেন—সিংহবাহিনীর ভাঙা মন্দিরে। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়। চৌধুরীদের মধু ঢালি আর ফিরে নাই; মেজ কর্তাও আহত

হইয়া ফিরেন। আর চণ্ডীতলার মাঠে দুই বংশের এই শক্তি-পরীক্ষায় উড়িয়া যায় চৌধুরীদের শেষ বিষয়-বিত্ত।

তারপর দুই বংশই জীবিকান্বেষী। এখন তাহারা বিদেশেই থাকে। আর সেই তীব্রতা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নাই। পুরুষদের মধ্যে সদ্ভাবও গড়িয়া উঠিয়াছে; পূজার উৎসবে পরস্পরে প্রীতি-বিনিময়ও হয়। কিন্তু মেয়েরা এখনো পরস্পরের গৃহে পদার্পণ করিবেন না।—সেই চৌধুরীদের কন্যাকে বিবাহ করিবে এখন সেনেদের পুত্র! আজ যদি রাঘব চৌধুরী জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে কি বলিতেন ইহা শুনিয়া? দুই একটা মাথা আজও কি মাটিতে লুটাইত না?

বজ্রাহতের মত জ্ঞানশঙ্কর ও হৈমবতী নিশ্চল বসিয়া রহিলেন। অশোকের নিকট তার গেল—'অমি'কে বাড়ি পাঠাও।' রাত্রিদিন অপেক্ষায় হৈম ও জ্ঞান নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু অমিতা আসিতেছে না। সে আসিবে না।

অমিতা, অমি,' —শেষে এমন দুঃসহ কলঙ্কের বোঝা চৌধুরী গোষ্ঠীর মাথায় চাপাইয়া দিবে আম', চাপাইয়া দিবে তাহাব পিতার মাথায়? অমর নয়, অশোক নয়, অরুণ নয়—চৌধুরী বাড়ির ছেলেরা কেহ নয়! একালের বিষম স্রোতে তাহারা ত ভাসিয়া গিয়াছে, ভাসিয়া যাইতেছে, জানেন তাহা জ্ঞানশঙ্কর। কিন্তু অমিতা, অমি',—চৌধুরী গোষ্ঠীর কন্যা, জ্ঞান চৌধুরীর আদরের মেয়ে অমি',—কন্যা সে, কল্যাণী সে, চিরদিনের গৃহলক্ষ্মীর জাতি সে,—সেও কিনা এই বিদ্রোহের আবর্তে আপনাকে ভাসাইয়া দিতেছে!···জ্ঞানের বারে বারে মনে পড়ে সেই আদরে আব্দারে একান্ত আপন অমি'কে—চঞ্চল যাহার গতি, অনর্গল যাহার কথা, অসম্ভব যাহার শত দৌরাত্ম্য মায়ের কাছে, শত আব্দার পিতার নিকটে,—সেই পাগলী অমি' আপনার উৎসাহে আপনি অধীর,—

সে অমিতা এমনি উন্মাদ কোন অসম্ভব আকুলতায় ? শুনিবে না তাহার পিতার কথা, ভাবিবে না তাহার মাতার মুখ ? ভুলিবে তাহার পিতৃকুলের মান মর্য্যাদা, তাহার ভারতীয় নারী-জীবনের সংযম শালীনতা ?…কোন্ উন্মাদনা ইহা ?—কোন উন্মাদনা ?

না, জ্ঞানশঙ্কর ভাবিবেন না। তবু মনে পড়িয়া যায়—স্মৃতিবাগানের সরকারদের মেয়ে মিসেস দত্ত এখানে কি কেলেঙ্কারী করিয়া গিয়াছে। সেদিন বনগ্রামের গুপ্তদের মেয়ে মুসলমান হইয়া মুসলমান বিবাহ করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত গৃহের কন্যা-বধূ স্বামী পুত্র ছাড়িয়া ডিভোর্স লইয়া প্রণয়ীর সহিত জীবনযাপন করিতেছে। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য কেহ হইতেছে মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান।…সেই প্রবৃত্তি-তাড়িত উন্মাদনা উচ্ছৃঙ্খলতাই কি পাইয়া বসিয়াছে তাঁহার অমিতাকেও ! ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ ! ভাবিবেন না, ভাবিতে চাহেন না তাহা জ্ঞান। এ যে তাঁহাদের অমি', তাঁহার অমি '…

কিন্তু অমিতা আসিবে না।

দেহ ভাঙিয়া পড়িতেছে জ্ঞানশঙ্করের। মন শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কোন অগ্নিশলাকায় শত খানে বিদ্ধ করিতেছে মস্তিষ্ক। পরাহত, রথচক্র-পিষ্ট হেক্টরের মত তিনি,…না, আরও বেশি…

I am bound

Upon a wheel of fire, that my own tears

Do scald the molten lead.

অগ্নিচক্রে গ্রথিত হতভাগ্য লীয়র…I am bound upon a wheel of fire…I am bound…bound…

ডাকের বেলা যায় যে। কিন্তু কাহাকে জ্ঞান লিখিবেন পত্র ? অশোককে ? না, অমিতাকে,—অমিতাকেই লিখিবেন।

উত্তেজিত কম্পিত হস্তে পত্র লিখিতে বসিলেন জ্ঞান চৌধুরী। মাথায় আগুন জ্বলিতেছে···I am bound upon a wheel of fire··· লিখিতে আরম্ভ করিলেন,···

'মা অমিতা,'

'মা ?'—কি লিখিতেছিলেন ভুলিয়া গেলেন, একটি শব্দে সমস্ত অগ্নি-সমুদ্র মন্থন করিয়া মগ্ন ভাবাবেগ ছড়াইয়া পড়িতে চাহিল।

'মা অমিতা, এখনো তোমাকে 'মা' বলিয়া লিখি, অমিতা। আমার মা,—তাঁহার কথা তুমি শুনিয়াছ কি ? শোনো নাই। শুনিলেও তোমার মনে নাই। কাহাকে মনে আছে তোমার ? তোমার নিজের মাতাকেই কি মনে আছে ? মনে থাকিলে তোমাকে আজ আমার এ পত্র লিখিতে হইত না। তোমাকে বুঝাইব কি করিয়া তাহা ? আপন মাকে এত দেখিয়াও চেনো নাই, তুমি চিনিবে কি করিয়া আমার মাকে ? জানিবে কি করিয়া তাঁহাদের সত্য, তাঁহাদের ধর্ম ?—'ধর্ম ? ধর্ম আবার কি ?'—তোমাদের চোখেই এ কালে উহার অস্তিত্ব নাই। অথচ আমার মাকে আমি দেখিয়াছি, তাই আমি আপনা হইতেই জানিয়াছি—ধর্ম কী।···ধর্ম—তাঁহাদের জীবন তাহা—ধর্ম—

মাথার মধ্যে এপার হইতে ওপারে একটা বিদ্যুৎরেখা ঝলসাইয়া উঠিল, চোখ সে তীব্রচ্ছটায় অন্ধ হইয়া গেল।

জ্ঞানশঙ্কর বুঝিতে পারিতেছেন না—অত লোক কেন ? কেন এত লোক ?···বড় তীব্র যাতনা মাথাটায়। হাওয়া করে কে ? হৈম না ?—অমন করিতেছে কেন সে ! বরফ দিতেছে কে মাথায়—বিজয় না ? হাঁ মাথায় বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা। উঃ !

চোখ আবার বন্ধ হইয়া গেল। দূরে শোনা যাইতেছে যেন জগৎ ডাক্তারের কথা! 'বরফ আছে ত আরও?' বিজয় উত্তর দিয়েছে—'আছে, আসছেও আরও।' হাতের নাড়ী দেখিতেছে কে? জগৎ ডাক্তারই কি? চোখ মেলিয়া আর জ্ঞানের সংশয় থাকে না, জগৎ ডাক্তারই।

চৈতন্য ফিরে এসেছে—ভয় নেই।...

কিন্তু কি ব্যাপার? মাথায় বড় যন্ত্রণা যে, বড় যন্ত্রণা যে। বড় যন্ত্রণা—অসহ্য আগুনের হলকা যেন খেলিতেছে...

I am bound

Upon a wheel of fire...

'কথা বল্‌বেন না, চুপ করে থাকুন'...

চুপ করিয়াই ত তিনি আছেন। চুপ করিয়া থাকিতেই ভালো লাগে।...

যন্ত্রণাটাও কমিতেছে কি?...অনেক কমিয়াছে বুঝি।...একটা অস্পষ্ট গুম্‌ড়ানো শব্দ কানের মধ্যে—অনেকটা এরূপ ইদানীং প্রায়ই শুনিতে পান জ্ঞান। কিন্তু কি ব্যাপার?

জ্ঞানশঙ্করের মনে পড়িল—চিঠি লিখিতেছিলেন—বেলা বারোটায়... তারপর মনে পড়িল—অমিতাকে,

I am bound

Upon a wheel of fire,...

এ কি কাণ্ড! হৈম এ কি দেখিতেছেন? দুই চক্ষের কোণ বাহিয়া জ্ঞান চৌধুরীর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাও সম্ভব?

দুই দিন পরে অশোক আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু অমিতা আসে নাই। তারের এই কথা সে বিশ্বাস করে নাই—'জ্ঞান চৌধুরী সংকটাপন্ন অবস্থায়।' ভাবিয়াছে, ইহা তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য একটা কৌশল। বরং বাধা প্রাপ্তির আশঙ্কায় অমিতা তাড়াতাড়ি আরও একটা কিছু করিয়া বসিবে,—অশোক গোপনে হৈমকে তাহাও জানাইল।

'মাইনর্ ষ্ট্রোক্।' এ যাত্রা জ্ঞানশঙ্কর রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্তু এবার সাবধান। ব্লাড্ প্রেশার বেশি ; নানারূপ মানসিক অশান্তিতে তাহাই গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল।—ডাক্তার পরামর্শ দিলেন : 'এখন প্রয়োজন বিশ্রাম।—বাইরে নিয়ে যাও—এখানকার কোনো ঝামেলাই যেন আর ওঁকে স্পর্শ না করে।' বিজয়ও মানে বৈষয়িক দুশ্চিন্তা কি জ্ঞানের কম ?—ন্যাশান্যাল ব্যাংক ফেল পড়া হইতে এখনকার ব্যবসা মন্দা পর্যন্ত ; সব মিলিয়া লোন আফিস প্রায় টলমলায়মান। বারাহীপুরের নূতন ম্যানেজার তাঁহাকে বাড়িটা ছাড়িবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। স্কুল লইয়া ত একটা গোলমাল আছেই। মনোজ আর কাজে যোগদান করে নাই।—মতিভ্রম হইয়াছে তাহার। বিপদ জ্ঞানশঙ্করের ?

বিজয় বলিল : একবার অন্তত মাস কয়েকের মত বাইরে যান।

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন : 'মাস কয় ?'—তিনি হাসিলেন। এই হাসির কারণ বিজয়ও জানে, সেরূপ অর্থ তাঁহার কোথায় ?

বিজয় বলিল : অন্তত পুজো পর্যন্ত, কয়টা মাস।

ইহার মধ্যেই অনেক কিছু ঘটিবে, জানে বিজয়। গান্ধীজী আইন অমান্যের বাস্তব কর্ম-পদ্ধতি স্থির করিতেছেন। এবং অসুস্থ জ্ঞান চৌধুরীকে এই সময়ে এই সহরে বিজয়ই বা আগলাইয়া বসিয়া থাকিবে কি করিয়া ? অশোক তাঁহাকে অন্যত্র বিশ্রাম করতে পাঠাক না ?

এবার তা হলে স্কুলের সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দিয়ে দিই, বিজয় ?—জ্ঞান চৌধুরী জানান। আশ্চর্য! বিজয় আপত্তি করিল না।

অসুস্থ মানুষ, আর ঐ পদ আঁকড়াইয়া থাকিবেন কেন ? আর বিজয়ই কি এখন স্কুল লইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবে ? সম্মুখে কত বড় প্রবল আন্দোলন আসিতেছে কে জানে ? সে স্থানীয় কংগ্রেসের প্রধান কর্মী, সে অন্তত এই জোয়ারে আবার আপনার তরী ভাসাইবে—আর জোয়ারের মুখে কত কিছুই ভাসিয়া যাইবে! স্কুল কলেজই কি ঠিক থাকিবে নাকি ?

একটু করুণ হাসি ফুটিল জ্ঞান চৌধুরীর মুখে,—বিজয়ও আর তাঁহাকে চাহে না। অবশেষে স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন হইতে চলিল—কোথায় সেই পাগলা মনোজ ? সেও বুঝি ভাগ্য-বঞ্চিত। আর একটা দীর্ঘশ্বাস জ্ঞান গোপন করিলেন। বিজয় পার্শ্বের ঘরে অশোকের সঙ্গে তখনি তর্ক করিতেছে—তাহাও কানে আসিতেছে। বিজয় বলে, এখন এই বাড়ি ত্যাগের ব্যবস্থা করা শ্রেয়ঃ। বারাহীপুরের পুরাতন জমিদাররা নাই, তাই পুরাতন আভিজাত্য শিষ্টাচার সুবিবেচনাও আর নাই। অশোক অমনি তর্ক করিতেছে,—কি আভিজাত্য, কি সুবিচার দেখিয়াছিল বিজয়েরা পুরাতন জমিদারদের মধ্যেই বা ?—'বড় রাজা' বাঈজী আর বাজনায় প্রজার রক্ত-জল-করা টাকা উড়াইয়া ধার করিয়াছে। 'ছোট রাজা' রেসের ঘোড়া আর সাহেব ও ইহুদি মেয়েতে তাহার সেই আভিজাত্যের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।—আর ইহাদেরই নিকটে শুয়োচকের প্রজাদের সেবায় 'বিট্রে' করিয়াছে বিজয়েরা। জমিদারদের বিশ্বাস করিয়া কি ফল পাইল প্রজারা ? কি প্রতিদানই বা পাইল বিজয় বা জ্ঞান চৌধুরী—জমিদারদের হাত হইতে ? মাঝ হইতে অশোক অকারণে তাহার সহকর্মীদের নিকট সন্দেহ ভাজন হইল। এ জিলার

কাজ হইতে তাহাকে দূরে সরিয়া থাকিতে হইল। তাহার কাজের পথে নানারূপ বাধা পড়িল; হীরেন্দ্রদা' না থাকিলে হয়ত তখন কঠোরতর শাস্তিই অশোককে পাইতে হইত। বিজয়ের আগামী দিনের আন্দোলনের ডাকেই কি সাড়া দিবে এখানকার জনসাধারণ? বারাহীপুরের হিন্দু মুসলমান কৃষককে কি বিজয় এখনো মহাজন-জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে ডাক দিবে? মুনিম খাঁর দলের সঙ্গে হাত মিলাইবে?

বিজয় স্পষ্ট জানাইল: না। আমরা বিদ্রোহ করতে চাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, দেশের লোকের বিরুদ্ধে নয়।

সেই পুরাতন তর্ক সেই পুরাতন ধারায় চলিতেছে।—জ্ঞান চৌধুরীর মনে বিষাদ মিশ্রিত বিস্ময় জমিতেছে—এখনো তেমনি পলিটিক্‌স্ লইয়া তর্ক করে অশোক? আর শুধু অশোক কেন? এই ত এই ঘর হইতে ঐ ঘরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার এই আধুনিক জীবনের সহায়, জ্ঞানশঙ্করের সঙ্গী, বিজয় ঘোষ পর্যন্ত তেমনি সেই পুরাতন পলিটিক্‌স্ লইয়া পুরাতন ধারায় তর্ক করিতেছে।—আর জ্ঞান চৌধুরীর ক্লান্ত দেহে ব্যাহত রক্তস্রোত কেমন গুলাইয়া উঠিতেছে। বুকের মধ্যে প্রতিটি ক্ষণে হৃদ্‌পিণ্ডের সংকোচ প্রসারণ আর সুনিশ্চিত নাই।—মাথায় চিন্তার পরিবর্তে অস্পষ্ট আবেগ ও চেতনার রাশি সন্ধ্যাকাশের নাম-না-জানা কালো কালো পাখীর মত ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়া পড়িতেছে···ফুরাইয়া যাইতেছে তাঁহার এখানকার জীবন-যাত্রা,—ফুরাইয়া আসিতেছে তাঁহার জীবন-দীপ···অথচ তেমনি তর্ক করিতেছে অশোক, তর্ক করিতেছে বিজয়।···আর অরুণ···অমিতা?—সবই যেন মিথ্যা।

জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী এখনি ত নাই উহাদের পৃথিবীতে!

তবে আর কেন? আর এখানে ফেরা কেন? এইবার বারাণসী! জ্ঞানশঙ্করের মনে মনে সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছিল—হৈমবতীরও

সম্মতি মিলিয়া গেল। কেবল সম্মুখে গ্রীষ্মের কয়টা মাস হয়ত পুরীতে বা দেওঘরে তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন,—ঢাকার বাড়িটা বন্ধক দিতে হইবে। তাহাতেই চলিবে কাশীতে।—সামান্য দুইটা পেট চলিয়া যাইবে যেমন করিয়া হউক।

কাজকর্ম বুঝাইয়া দিতেছেন জ্ঞান চৌধুরী। বহু বহু সামান্য মানুষও তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছে, কামনা করিতেছে—আবার যেন সুস্থ দেহে ফিরিয়া আসেন জ্ঞানবাবু।—মিথ্যা এই আশা, জানেন জ্ঞান চৌধুরী।

মিথ্যা বটে, কিন্তু বড় আশ্চর্য মায়া-মাখানো মিথ্যা এই পৃথিবী,—ইহারাও কেহ ঘরের বাহির হইয়া আর মনে রাখিবে না, কিন্তু কেহই তবু যতক্ষণ তিনি আছেন তাঁহাকে মন হইতে বিদায় দিতেও চাহে না।···এখনো সসম্মানে জ্ঞানশঙ্কর বিদায় লইতে পারেন।

মহেন্দ্র সেনের পত্র আসিল···মহেন্দ্র সেন শুনিয়া স্তব্ধ হইয়াছে—মিলনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান চৌধুরী তাঁহার পুত্রকে প্ররোচিত করিয়া তিন আইন মতে আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু জানেন কি জ্ঞান—বিলাতে মিলন ইতিপূর্বেই বিবাহ করিয়াছিল? সে বিবাহচ্ছেদ এখনো পাকা হয় নাই। জ্ঞানের এই হীনতার বিরুদ্ধে মহেন্দ্র সেন কি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে না?—

জ্ঞান পারেন না আর।—

O, let me not be mad, not mad, sweet heaven!

Keep me in temper; I would not be mad.

চিঠিখানা হৈম'র হস্তে অর্পণ করিয়া জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন।

পড়িতে পড়িতে হৈমবতীর কখন ঠোঁট কালি হইল, হাত কাঁপিতে লাগিল, হৈম সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানশঙ্কর চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন—একি হইল ?…হৈম…ছোট বউ ? অচৈতন্য হইয়া গেল বুঝি…

You heavens give me patience ! patience I need. লোকজন ডাকিলেন। লোকজন আসিল। অশোকও আসিল। ক্রমে হৈমরও চৈতন্য হইল। চোখ মেলিয়া তিনি তাকাইয়া রহিলেন। তারপর সচকিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জ্ঞান চৌধুরী কেমন আছেন ?

…না, আমি বেশ আছি। ভালো আছি।

patience I need…এই বাড়িতে জ্ঞানের সম্মুখে আর যেন অমিতার নাম উচ্চারিত না হয়—সে আর নাই। নাই, নাই, নাই।—

অশোকের হাতে চিঠিটা দিয়া জ্ঞান বলিলেন : আর কালই আমরা যাব…

কিন্তু কোথাও যে বাড়ি ঠিক হয় নি এখনো পুরীতে বা দেওঘরে।

না হোক, আপাতত কলকাতায় যাব। নয় একেবারে অমরের কাছেই যাব—কাশী।

বিজয় বলিল : এত তাড়াতাড়ি কি ? এখানকার জিনিসপত্রের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

তুমি বিক্রী করে দেবে। কিন্তু আর দেরী নয়, বিজয়।

বইগুলি ? এত বই আপনার।

বই ?—একবার থামিলেন জ্ঞান চৌধুরী,—বই !—বলিলেন :

বই আর কই ? পুরনো কাগজ ? কে পড়বে আর তা চৌধুরী গোষ্ঠীতে ?…যদি পড়ো তোমরা, রাখো—কলেজে, লাইব্রেরীতে। নইলে পুরনো কাগজওয়ালাদের ডেকে দিয়ে দিয়ো।…

কি বলো ?···আপদ গেল—এত দিনে, না ?—একবার হৈমর দিকে তাকাইয়া হাসিতে চাহিলেন জ্ঞান চৌধুরী।

হৈমবতী হাসিতে পারিলেন না।

বই, বই, বই···ইঁহাদের জীবনের স্বপ্ন বই, ইহাই জানিতেন হৈম।—জীবনেব সব স্বপ্ন বুঝি তবে ভাঙিয়া গিয়াছে তাঁহার।

অশ্রু-মথিত দুই চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন হৈমবতী।

১০

দেখিতে না দেখিতে সমুদ্র যেন ফুলিয়া উঠিল, তার পর ফাটিয়া পড়িল ফেনায়িত শত শীর্ষ তুলিয়া। সবরমতীর তীর হইতে ডাণ্ডির মহাযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন গান্ধীজী। কোটি মানুষের অন্তরাত্মা তাঁহার পদধ্বনিতে আপনার হৃৎস্পন্দন জানাইতেছে; আর উহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে দেশের হাজার সংবাদ-পত্রের সাংবাদিকরা, বিদেশাগত নানাজাতির সাংবাদিকদের দিগ্‌দেশগামিনী তারের বার্তা। তথাপি চুপ করিয়া বসিয়া আছে কেন গবর্ণমেণ্ট ? পৃথিবীর দরবারে ভারতবর্ষেরই পদধ্বনি এবার শোনা যাইতেছে, তাহা কি আর ইংরেজ ইচ্ছা করিলেও চাপা দিতে পারে ?

বড় দূরে তবু নিজেকে মনে হয় জ্ঞানশঙ্করের কলিকাতা শহরের কোটরে বসিয়া। এই প্রকাণ্ড আলোড়নের সাড়া কোথায় তাঁহার অন্তরে ? অশোক উত্তেজিত হয়। সে উদ্বিগ্ন হয়, চিন্তা করে, তর্ক করে,—আবার বিদ্রূপ করে এই 'লবণ যাত্রীদের' লইয়া। কিন্তু গোপন করিবার উপায় নাই—তাহার অন্তরেও মন্থন চলিয়াছে, তাহার বায়ুমণ্ডলের প্রত্যেকটি জীবনে উহারই আঘাত-সংঘাত। তথাপি জ্ঞানশঙ্করের অন্তরে

আজ আর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রেরণা জাগে না। সংবাদপত্রের পাতায় চক্ষু রাখিয়া তিনি সংবাদ পড়িয়া যান। উদ্দীপ্ত হন না, আশান্বিত হন না, বরং একটা ক্লেশ বোধ করেন অন্তরের কোথায়। জাতির এমন মহান্ আত্মশুদ্ধির ব্রতও একটা রাজনৈতিক হুল্লোড়ে পরিণত হইতেছে। বিশৃঙ্খল সমাজের নর-নারী ইহারই মধ্য দিয়া আপনাদের বিস্রস্ত জীবনের একটা প্রকাশ পথ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে।

স্নানের সময় বহিয়া যায়—ললিতা-রেবা এখনো অশোককে ছাড়িতেছে না। ঘণ্টা দুই যাবৎ তাহারা তর্ক করিতেছে।—জ্ঞানের কেমন আর আগ্রহ নাই তাহা শুনিতে। কেমন যেন বিশৃঙ্খল এই ললিতা।

—আমাদের সমিতির আজ প্রতিষ্ঠা দিবস। মানে, প্রতিষ্ঠা দিবস পরে। কিন্তু এখন সংগ্রাম-পরিষদ গঠন করছি আজ—অশোককে খুঁজিতে আসিয়া জানায় ললিতা।—বন্দবিল্লা সত্যাগ্রহে আমরা যোগ দিচ্ছি।

তাতে আমি কি করব?—পরিহাস স্বচ্ছ কণ্ঠে বলে অশোক। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় এই সম্পর্কে যথেষ্ট রকমের ঔৎসুক্য উৎসাহ তাহারও রহিয়াছে।

আপনি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক—একটা রিপোর্ট ছাপ্‌বেন।

আমি সম্পাদক নই, তা ত জানেনই। তবে সম্পাদককে দিলে আপনাদের রিপোর্ট তিনি বড় করেই ছাপ্‌বেন।

তা আমরা জানি না। কিন্তু রিপোর্ট আপনাকে ছাপতে হবে—আপনি, না, কে সম্পাদক, আমরা বুঝি না তা।

আবার সকৌতুক কথা কাটাকাটি হয় দুই জনাতে। তারপর অশোক বলিল: আচ্ছা, দিন রিপোর্ট।

তাই তো এসেছি;—আপনাকে তা লিখতে হবে।

আপনাদের রিপোর্ট, আমি লিখব কি?

আমরা লিখলে হবে না, সংবাদপত্র ছাপে না। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট্ মিসেস্ ব্যানার্জি ও আমাদের লেখা দেখলে চটে যান।

আমার লেখা দেখলেই কি তিনি খুশী হবেন?

নিশ্চয়।

কি করে জান্লেন?

'রেবার মাষ্টারের' খবর আর বীরুর মা জানেন না?

সে খবরও আপনি বলেছেন বুঝি?

ললিতা উত্তর দিল সকৌতুকে: আমি বল্‌ব কেন? যার বলবার গরজ সেই বলেছে, আর যার জানবার গরজ সে-ই তা জেনে নিয়েছে।

কোথায় ভারতের মুক্তিযজ্ঞ, আর কোথায় এই লঘুচিত্ত পরিহাস রসিকতা। কোথায় ইহাদের মধ্যে সেই প্রশান্ত তপস্যার শপথ বা প্রদীপ্ত বজ্রাগ্নি শিখার উদ্ভাস?—অথচ অশোকের চোখে মুখে কি সেই বজ্রগর্ভ মেঘের ছায়া দেখেন না জ্ঞানশঙ্কর ক্ষণে ক্ষণে—যখন সে পদচারণা করে সংবাদ পত্র পড়িয়া, লেখে তাহার লেখা? কিন্তু শুধুই রসিকতা কি ইহাদের? অস্থির উত্তেজনাও ত কম নয়। এই পার্কে পার্কে ইহারা সভা করে, মিছিল বাহির হয়—শত মানুষের চোখে আগুন জ্বলে, কণ্ঠে ভীম ভয়ংকর গর্জন ওঠে,—মিথ্যা কি তাহা?

সন্ধ্যায় পার্কের বেঞ্চে বসিয়া জ্ঞানশঙ্কর হাওয়া খাইতেছেন। দূরে মেয়েদের সভা হইতেছে—হয়ত ললিতা রেবারাও আছে। বেঞ্চে তাঁহারই সদ্য পরিচিত আর স্বল্প পরিচিত তাঁহারই মত' বৃদ্ধগণ—প্রাচীন পৌরজন তাঁহারা কলিকাতার; পরিবারের কর্তা, বহুদর্শী মানুষ। সেক্রেটারিয়েটের অবসরপ্রাপ্ত রায়সাহেব ঘোষাল বলিতেছিলেন,—পুরুষেরাই স্বরাজ এনেছে। এখন বাকী রয়েছে মাগীরা।

আর একজন বলিলেন : কিছু নয়, সব ওস্তাদি আর বাহাদুরী। নিজেদের জাহির করার একটা ফিকির—

আবার কে বলিল : ওদের বাপ মা স্বামীটামী নেই নাকি ?

কে একজন তখনি পরিচয় দিতে বলিয়া গেল—সবজান্তা লোক তিনি, না চিনেন কাহাকে ?—ললিতা, রেবারও নাম পরিচয় তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য ও রঙে মিশিয়া আসিয়া জ্ঞান চৌধুরীর কানে পৌঁছায়। তিনি উৎকর্ণ হন, ভালো লাগে না তাঁহার উহা শুনিতে। কোথায় একটা লঘু-রসিকতার সুর আছে। যেন এই বিরাট আন্দোলনটাকেই তুচ্ছ করিবার চেষ্টা! অবশ্য রেবা-ললিতাকেও তাঁহার ভালো লাগে না।

কে একজন বলিল : সম্ভ্রান্ত পরিবার এঁদের, সুশিক্ষিত মেয়ে সব যাই বলুন, এ কি ভাবতে পারতাম আমরা দু'দিন আগেও।

কিন্তু এই মাগীগুলো পথে পথে শোভাযাত্রার শোভা না জাহির করলে কি চলত না ? স্বরাজ কি ওঁরা আঁচল না পাতলে সাহেবরা মুঠো ভরে দেবে না ? না, মেছো হাটার জিনিস স্বরাজ ? দরদস্তুর করে কিনতে হবে মাগী-মিন্‌সের হল্লা করে ?—সেক্রেটারিয়েটের উত্তর।

এই বয়সেও জ্ঞান চৌধুরীর কেমন কান লাল হইয়া উঠিতে চাহে। একি অশ্লীল ভাষা। কিন্তু এমন কত লোকের এরূপ মানসিকতা ও এজাতীয় মন্তব্যকে প্ররোচিত করিয়া তুলিতেছে এই প্রকারের মেয়েদের সভা-শোভাযাত্রা। কি প্রয়োজন আছে ইহার ? কি সত্যই বা আছে ইহাতে ? এই ত ললিতা—স্বামী সাংসারবতী ললিতা; রেবারও তাহাই হইবে ;—হওয়া উচিতই ছিল এতদিনে। কিন্তু স্বামী সংসার ফেলিয়া ইহারা এইরূপে মাতিয়া উঠিল, ইহা কি খুব শুভ লক্ষণ—সমাজের পক্ষে, কিংবা ইহাদেরই পরিবারের পক্ষে,—কিংবা দশজন পরিচিত শুভানুধ্যায়ীর পক্ষে ? অশোককে পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে ইহারা।

জ্ঞানশঙ্করের কেমন অস্বস্তি বোধ হয়,—ইহাদের দেখিলে। হৈমবতী ত ভালো করিয়া আলাপই করিতে চাহেন না—সময়ে অসময়ে ইহারা এখন সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। কেমন যেন শ্রী মাধুর্য হারাইয়া ফেলিতেছে। পথে ঘুরিতে ঘুরিতে 'জংলী' মেয়েটা জংলী হইয়া উঠিতেছে আবার। আর, রেবা?—স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ের মত এখন সেও কথাবার্তায় আর শিষ্ট শান্ত ভীতু মেয়েটি নাই। না, হৈমর ভালো লাগে না ইহাদের। আরও ভালো লাগে না—ইহাদের অশোকের নিকট এত কি প্রয়োজন? এমনিতেই অশোক এক মুহূর্ত বাড়ি থাকিতে চাহে না; নানা লোক তাহার জন্য ভিড় করিয়া আসে। সময়ে অসময়ে সে বাহির হইয়া যায়—কোথায় খাইবে না-খাইবে তাহার ঠিক নাই। বাড়িতেও যে পিতার স্নানাহারের কথা জিজ্ঞাসা করে—যেন তাহা একটা নিয়ম রক্ষা। নানা বই আনিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া পালাইয়া যায়—বই যেন বাবাকে ঘুষ।

কিন্তু সমুদ্র এবার ফুলিয়া উঠিতেছে। লাঠি-ব্যাটনের হাতেই রাজত্ব তুলিয়া দিতেছে সরকার। অদ্ভুত উত্তেজনা চতুর্দিকে। অশোক সকালে বাহির হইয়া গিয়াছে আর ফিরে নাই। কেমন শঙ্কিত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন হৈমবতী। 'নেশন' অপিসে একবার খোঁজ করিয়া না আসিলে জ্ঞানশঙ্করও স্থির হইতে পারিতেছেন না।

অশোক কিন্তু সে আপিসে নাই। জ্ঞানশঙ্কর বাসে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ একটা পার্কের মোড়ে বাস থামিয়া গেল, অগ্রসর হয় না। নানা রকমের ছেলেরা চীৎকার করিতেছে, বাসের গায়ে আঘাত করিয়া হল্লা পাকাইতেছে, 'নেমে পড়ুন,' 'নেমে পড়ুন'। কিন্তু কেন? হঠাৎ লোকজন

ছুটিতে লাগিল। কি ব্যাপার? কন্ডাকটার বলিতেছে 'সালারা এসেছে। এই—এই মারলে! এইরে, মাথা ফাটিয়ে ফেললে!'

জ্ঞানের হৃদ্‌পিণ্ড লাফাইতে লাগিল। চোখ চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। রুদ্রমূর্ত্তি জন কয় ফিরিঙ্গি সার্জ্জেন্ট ছুটিয়া আসিতেছে এদিকে। যাহাকে পায় তাহাকেই মারে। একি! কেন এই গুণ্ডামি? কেন এই দস্যুতা? 'হোয়াট্‌স দিস্—ন্যাট্‌স্ নট্ ল'—বাস হইতে চীৎকার করিতে গেলেন জ্ঞানশঙ্কর। চারদিকের চীৎকারে কেহ তাহা শুনিল না। একজন প্রৌঢ় বলিলেন, ঃ 'আর ল'। চুপ করে থাকুন, নইলে মাথা ভেঙে দেবে এখনি।'

কিন্তু কেন বলুন ত?—উত্তেজনা দমন করিয়া জ্ঞান জানিতে চাহেন।

সভা হচ্ছিল এ পার্কে। যে আইনী সভা—তা ভাঙতে হবে। প্রভুরা সেখানকার বীরত্ব শেষ করে এখন এখানে আসছে ভিড় তাড়াতে।

কিন্তু এ যে খুনের চেষ্টা। দেখছেন না মাথা ফেটে গিয়াছে!—এ যে বে-আইনী জুলুম।

'হাঁকাও, সালা।—হাঁকাও'—ইতর একটা হিন্দুস্থানী গালি তারপর। চণ্ডমূর্তি সার্জেন্ট বাস ড্রাইভারকেই বুঝি খুন করিবে। শিহরিয়া উঠেন জ্ঞান। মানুষের এমন জিঘাংসু মুখ জ্ঞান আর দেখেন নাই।

তিনি চোখ বন্ধ করিলেন। বাস গর্জিয়া ছুটিয়াছে। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে। কোনোরূপে টলিতে টলিতে জ্ঞানশঙ্কর বাস হইতে নামিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ি আসিয়া ইজি চেয়ারে এলাইয়া পড়িলেন।

কি খবর?—আতঙ্কিত হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি খবর অশোকের?

ভালো আছে,—জানান জ্ঞানশঙ্কর।

কিন্তু এই কি আইন, এই কি শৃঙ্খলা, এই কি ব্রিটিশ ল'র গরিমা মহিমা? এই শাসনতন্ত্রের অনেক গলদ জ্ঞানশঙ্কর জানেন। দীর্ঘ জীবনের ওকালতিতে আইনের কোনো ছলনাই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই। ইহাদেরই আদর্শের বশে আবাল্য তিনি জানিয়াছেন—কোনো কালেই পরদাসত্ব সহনীয় নয়—'গুড্‌ গবর্ণমেণ্ট ইজ নো সাবষ্টিটিউট্‌ ফর সেলফ্‌ গ বর্ণমেণ্ট!—কিন্তু, বিধাতা, এই কি ইংরেজ 'চরিত্র? এমন মিথ্যা তাহাদের এত গর্বের ইংলিশ ল'?—ইংরেজের সমস্ত ইতিহাস জ্ঞানশঙ্করের চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠে।—যে ইংরেজকে তাঁহারা জানিয়াছেন সেক্‌সপীয়র ও মিলটনের জাতি, ক্রমওয়েল ও হাম্পডনের বংশধর, যাঁহারা শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার সমন্বয়ে পৃথিবীতে মানুষের মনুষ্যত্বকে সত্যকারের গণতান্ত্রিক ভিত্তি দান করিয়াছে,—এই কি তাহার স্বরূপ?—এই পশুলীলা?—ভারতবর্ষে ইংরেজ আর কোনো বৃহৎ আদর্শের বার্তা বহন করে না। ভারতবর্ষই কি কেবল তাহাকে আপনার সিংহাসনে বসাইয়া রাখিবে?... না, না, 'a sin against man and God to submit any longer'...কিন্তু কতদিন চলিবে এই প্রেতের নৃত্য?...কত কাল, কত কাল আর, মহাকাল?

রাত্রিতে অশোক দেরীতে ফিরিল। হৈমবতী তাহাকে কি বলিতেই সে জ্ঞানের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

ডাক্তার ডাকব কি?

চোখ মেলিয়া জ্ঞানশঙ্কর দেখিলেন অশোকের চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে অপরাধীর দৃষ্টি। জ্ঞানশঙ্কর শান্তস্বরে বলিলেন: তার দরকার নেই। পথে পুলিশের কাণ্ড দেখে তখন কেমন খারাপ লাগছিল শরীরটা।

শেষ রাত্রিতে জ্ঞান একবার দেখিলেন—অশোক মেঝের ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে হৈম'র শয্যা পার্শ্বে।—মায়ের পার্শ্বে ঘুমাইত এমনি অমিতা!—এই কলিকাতা শহরেই কোথায় সে এখন? না, তাহার কথা জানিতে চান না জ্ঞানশঙ্কর। সে আর নাই, নাই, নাই।

সকাল না হইতেই আবার নানা লোক অশোকের নিকট আসিতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত, উচ্চ কথাবার্তা—হিন্দুস্তানি বাংলা ইংরেজি। অশোক তাহাদের জানাইল—আজ সে বাহির হইতে পারিবে না। জ্ঞানশঙ্কর ভালো থাকিলে একবার আপিসে যাইবে।

রুষ্টচিত্তে বলিয়া গেল কেহ কেহ: ধাপ্পা'

অশোক উঠিল। জ্ঞানকে বলিল: আমি এখনি একবার বেরুব। ফিরব শীঘ্রই। দেরী হলেও ভাববেন না।

ভাবনা!—জ্ঞানের হাসি পাইল,—ভাবনার আর কি? তিনি কাল কি দেখেন নাই—রক্তের কালিতে ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। না ভাবিয়া পারিবেন কি তবু তাহারা?

হৈম বলিল, আজ না গেলে কোথাও অশোক।

অশোক বলিল: একবার যেতেই হবে।

'যেতেই হবে'—দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন হৈম। কী নিষ্ঠুর তাহার কর্তব্যবোধ।

অপরাহ্ণে মালিনী কি উৎকণ্ঠা বহন করিয়া আসিল,—অশোকবাবু কোথা? বাড়ি নেই?

বাড়ি সে কতক্ষণ থাকে?—হৈম সবিষাদ হাসিল।

মালিনী কি ভাবিতে ভাবিতে হৈম'র পাশে বসিল। হৈমর মুখে শুনিতে লাগিল—কাল জ্ঞান কেমন অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন। অশোককে আজ আপিসে যাইতে মানা করিয়াও লাভ হইল না। কি কাজ তাহার আজ ছিল?

মালিনী উৎকণ্ঠা চাপিয়া রাখিয়া বলে: আমরা তার কি করে জানব, মাসীমা ?

মালিনী রাজনৈতিক কাজকর্ম করে না, সভা সমিতিতে তাহার যাতায়াত নাই। হৈম তাহা জানেন, জ্ঞান এখন জানিলেন। এই ত নম্র শান্ত মালিনী; তাহার কথাও অন্তর স্পর্শ করে। বই বন্ধ করিয়া জ্ঞান তাহাকে নিকটে ডাকিলেন: এদিকে এসো। তুমি এলে কোথা থেকে ? তুমি সভায় শোভাযাত্রায় যাওনা ?

মালিনী অপরাধিনীর মত বলে: আমার অত লোকের ভিড়ে গেলে কেমন ভয়-ভয় করে।—অধোবদন হয় মালিনী।

জ্ঞান বুঝিতে পারেন তাহার মনে খেদ রহিয়াছে। বলেন: তার জন্য এত কুণ্ঠা কিসের ? এই ত তোমার মাসী মা। পারবেন কখনো সভায় যেতে—এতখানি বয়সেও ? সবাই সব কাজ পারে না।

মালিনী হাসিয়া বলিল: ওঁরা যে অন্য কত কাজ করেন। আমরা যে সে সব কাজও করি না, দেশের কাজও করি না।

'দেশের কাজটা' কি কেবল মিটিং প্রোসেশন—মেয়েদের পক্ষেও ?

মালিনী ভীতু ভাবে কহিল: মহৎ একটা প্রেরণা এসেছে দেশে। এখন এর থেকে কেউ কি দূরে সরে থাকা উচিত ? তা হলে কি অন্যায় করব না আমরা দেশের প্রতি ?

বসিয়া বসিয়া বলিল মালিনী জ্ঞান চৌধুরীর নিকটে অনেক কথা। না, কোথাও যাইবেন না আজ জ্ঞানশঙ্কর, মালিনীর কথা শুনিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই অশোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। এক মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল মালিনীর মুখ। অশোক ও সচকিত হইল একবার।

মালিনী বলিয়া উঠিল: যাক্! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?

কেন ? বলো ত ?—অশোক স্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করিল।—

সত্য নাকি—সেই ঘোষের গাড়ীর গাড়োয়ান্‌দের হাঙ্গামা?

সত্য।—অশোক সংক্ষেপে সহজ সুরে কথাটা বলিতে চাহিল।

সত্য?—তা হলে গুলি চলেছে? কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড আপনাদের! আর আমরা ভাবনায় মরি সবে।

অশোক মৃদু হাসিল: যাক্‌, এ উপলক্ষ করে তবু ত ভাবলে—

মালিনী লজ্জিতা হইল। অশোক কথা শেষ করে নাই তখনো। নূতন কথা যোগ করিল: তোমাদের হৃদয়বতী মহিলারা মহিষগুলির কথাই ভাবেন, তোমরা কেউ যে তবু মানুষগুলোর কথাও ভাব্‌লে এইত যথেষ্ট। এই ওদের মৃত্যুর পুরস্কার।

মৃত্যু!—ঘটেছে নাকি কারও?

অশোকের মুখে উত্তেজনা ফুটিল এইবার: আশ্চর্য এই সভ্যতা—ঘোষের দুঃখ কমাবার নামে মানুষকে চালায় গুলি!

সমস্ত ঘটনার অসহ্য নির্মমতা জ্ঞানশঙ্করকেও আহত করিল আবার। কিন্তু উহার তীব্রতা যেন আর তেমন নাই। তিনি কালই বুঝিয়াছেন—রক্ত বহিবে এবার—রক্ত-পিপাসু সেই সার্জেণ্টদের মুখগুলি তাহার মনে পড়িল। কিন্তু গাড়ী দিয়া রাস্তা বন্ধ করিতে গেল কেন মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ানরা? সরকারী হুকুম হইয়াছে—গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে মহিষদের কষ্ট হয়; অতএব পয়লা এপ্রিল হইতে বারোটার পরে মহিষগুলিকে গাড়ীতে জোতা বে-আইনী। তাই বলিয়া ঠিক বারোটায় গাড়ী হইতে মহিষ খুলিয়া দিয়া গাড়ী দিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দিল কেন গাড়োয়ান্‌রা?—যে পুলিশের রাজত্ব। তারপর ত চলিবেই গুলি। অশোক কি সেখানে ছিল?

কিন্তু ঘটনা শুনিতে শুনিতে অন্য একটি সত্য জ্ঞানের চক্ষে এখন যথার্থ রূপ লইয়া দেখা দিল—তাহা হইলে ব্যাকুল হইয়া মালিনী ছুটিয়া

আসিয়াছিল এই ব্যাপারটা শুনিয়া। আর সেই উৎকণ্ঠা মনে মনে বহন করিয়াও এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হয় নাই মালিনী। আন্তরিকতা আছে, শ্রীসংযমও আছে; আছে আত্ম-গোপনশীল গভীর প্রাণ। অশোক ফিরিয়া আসিতেই এখন মালিনী কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে, ইহাও বুঝিতেছে তাহার ব্যাকুলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাই সে এখন বিদায় লইবার জন্যও ব্যস্ত :—সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। এবার যাই, মাসীমা।

মালিনী চলিয়া গেল—দেরী করিল না। অশোক আপনার ঘরে জামা কাপড় ছাড়িয়া স্নানে যাইবে। হৈমবতী জ্ঞানকে বলিলেন : প্রাণ থাকলে মানুষ এমনি ছুটে আসে।

কিছুই হৈমর চক্ষু এড়ায় নাই। জ্ঞান আরও সুনিশ্চিত হইলেন। ধুতি তোয়ালে লইয়া আপনার মনে অশোক চলিয়া যাইতেছে স্নান ঘরে। চক্ষু নাই বুঝি এই অশোকেরই শুধু। সে জন্মান্ধ, আত্মবিদ্রোহী ; আত্মার সম্বন্ধেই বুঝি অচেতন সে।

সন্ধ্যার পরে রেবা ও ললিতাও আসিল। তাহাদের চোখে মুখে উত্তেজনা। সত্যই তাহা হইলে অশোক বাবুরা কংগ্রেসের সহিত যোগদান করিবেন নাকি এইবার? অশোক কথাটা উড়াইয়া দিল : 'কংগ্রেস নিজেই কি করে আগে দেখুন না।' তারপর চলিল তর্ক। ইহাদের কথাবার্তা হৈমর ভালো লাগিল না। গরীব মানুষের প্রাণ গিয়াছে, আর ইহারা যেন তাহাতেও উল্লসিত। কি এত তর্ক মেয়েমানুষের!

কিন্তু রাত্রিতে অশোক আবার বাহির হইল। গাড়োয়ানদের এই কার্যে তাহার সম্মতি ছিল না। কিন্তু সংঘর্ষ যখন বাধিয়াছে, রাত্রিতে

তখন তাহাদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তাহাদিগকে সাহস না দিলে চলিবে কেন? তথাপি রাত্রিতেই সে ফিরিয়া আসিবে।

অতন্দ্র নয়নে হৈম অপেক্ষা করে;—কখন আসিবে অশোক? জ্ঞান চৌধুরীর চোখেও ঘুম নাই—ব্লাড প্রেসারে ত ঘুম কমই হয়।

সম্মুখে সমুদ্র-তরঙ্গ কূল ছাপাইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু একি হইল? হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রভাত না হইতে পুলিশ অশোককে আসিয়া গ্রেপ্তার করিল। কেন? কিছুই জানা নাই কাহারও। পূর্ব্ব দিগন্তে যে ঘূর্ণীবায়ু এতদিন দৃষ্টির অগোচরে পাক খাইয়া উঠিতেছিল—উঠিল সে এখন অকস্মাৎ জলস্তম্ভ রচনা করিয়া। আর, উড়িয়া গেল কোথায় কে—সুমন্ত্র কোথায়? শেখর কোথায়? দেবব্রত কোথায়? কোথায় বিজয়ই বা?

অশোক অবশ্য সন্ধ্যা বেলাই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আরও অনেকে ফিরিল না। চট্টগ্রামে বাঙলার বিদ্রোহ আপনার অগ্নিযুগের নূতন স্বাক্ষর রাখিতেছে।

প্রলয়-পয়োধি-তটে কে রহিবে কূল আঁকড়াইয়া? জ্ঞানশঙ্কর বিমূঢ় হন বিস্ময়ে। পেশোয়ারের গাড়োয়ালী সৈনিকেরা বন্দুক ফেলিয়া দিয়াছে। বালক বুক খুলিয়া দিয়াছে রিভালবারের মুখে, দিতেছে প্রাণ। শোলাপুরে বিপ্লবী শ্রমিক রক্ত-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে আকাশে, আর মাটি লাল করিয়া দিয়াছে আপনাদের রক্তে। কলিকাতা বোম্বাইর পথে জাগ্রত জাতীয় বিদ্রোহের পদক্ষেপ। এক একবারে লাল হইয়া উঠিতেছে আগুনের ছটায় চট্টগ্রামের পাহাড় জঙ্গল, আর মেদিনীপুরের ক্ষেত গ্রাম, ঢাকার কলিকাতার পথ।

হৈমবতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন। কি যেন তাঁহারও পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে—বুঝি তাঁহার সংসারের সুপরিচিত সেই মৃত্তিকা। অশোক কোথায়? প্রতিক্ষণে ভয় হয়—কখন বুঝি সে আর ফিরিবে না। কিন্তু শুধু অশোকই নয় আর, কোথায় কে এখন? অরুণই শুধু স্থির—কিছুই তাহার যায় আসে না—রাজপুতনায় তাহাদের শুটিং চলিতেছে। সে তাহা লইয়া মাতিয়া আছে। কিন্তু অমিতা, কমলা, ইন্দিরা?—কাহারও সম্বন্ধে কিন্তু হৈম নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না; জ্ঞানকেও তিনি বলিতে পারেন না তাহার উদ্বেগের কারণ।

বলিবার প্রয়োজনও সম্ভবত ছিল না। চট্টগ্রামের ব্যাপারও বিজয়ের গ্রেফতারের পরে জ্ঞান চৌধুরী সবই বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। বুঝিয়া ফেলিয়াছেন—তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে যুগের বিদ্রোহ কি ভাবে আপনার আয়োজন করিয়াছে। কোথায়, কে কখন এবার গৃহচ্যুত, সংসারচ্যুত হইয়া পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই। তবু কি ইহারই মধ্যে তিনি পারিবেন না তাঁহার ক্ষুদ্র পৃথিবীকে আগলাইয়া রাখিতে?—অশোক না থাকুক,—অরুণ এখনও তাহার খেয়ালে মাতিয়া থাকুক রাজপুতনায়—কিন্তু অমর আছে, সে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাইয়াছে,—এই ঝড়ের মুখে সে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহে জ্ঞানের পার্শ্বে। কোনো কথা সে শুনিবে না—শান্তারও তাহাই প্রার্থনা,—গ্রীষ্মান্তে এবার জ্ঞান চৌধুরী পরিবারস্থ সকলকে লইয়া কাশীতেই তাহাদের নিকটে চলিয়া আসিবেন। প্রয়োজন বুঝিলে ভিন্ন বাস গৃহের ব্যবস্থাই না হয় করিবেন তাঁহারা কাশীতে। ইন্দিরাকে তাই শান্তা বাড়িও পাঠাইবে না এবার—দিনকাল ও বাংলা দেশ ভালো নয়। সেই ঝড়ের মুখে পড়িয়াই অমর বুঝিয়াছে—ধুলির মত, তৃণের মত, ঝরা পাতার মত উড়িয়া যাইবে তাহারা—যদি আজ চিরদিনের গৃহভিত্তি

আর মাটির আশ্রয়কে আঁকড়াইয়া না ধরে। উন্মাদনাও তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। অশোক যাহা খুশী বলুক অমর জানে—সভ্যতার নিয়মে কি মূল্য থাকে ছিন্নমূল মানুষের—'দেরাসিনে' মানব গোষ্ঠীর ?

কাদম্বিনী শঙ্কিত চিত্তে লিখিয়াছেন,—এবারকার বর্ষায় আর চিত্রিসারের বাড়ী-ঘর টি কিয়া থাকিবে না। বৈশাখের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা এবার প্রলয় মূর্তি ধারণ করিয়াছে,—তীর খসিয়া পড়িতেছে আঘাতে আঘাতে। নতুন বর্ষার জল-রাশিতে যখন নদী ভরিয়া উঠিবে তখন এবার আর চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ি রক্ষা পাইবে না। শেষবারের মত একবার দেখিয়া যাইবে কি জ্ঞানশঙ্কর তাঁহাদের ভদ্রাসন ?

'শেষ বারের মত',—কেমন মোচড় দিয়া উঠিল প্রাণ। কাদম্বিনী বাড়ি হইতে নড়িবেন না। অমর মায়ের সহিত দেখা করিতে যাইতে চায়।—শান্তাকেও লইয়া সেখানে যাইতে চায়। আসলে সে চৌধুরীদের সেই ভদ্রাসন শেষ দেখিয়া আসিবে,—শান্তাকেও একবার পিতৃপুরুষের সেই ভদ্রাসন না দেখাইয়া বুঝি রাজীব চৌধুরীর মত অমর চৌধুরীরও মনে তৃপ্তি নাই। সেও বুঝি আজ জানে—হয়ত চিরদিনই জানিত—সেই গৃহের সঙ্গেই তাহারও জীবনমূল জড়াইয়া আছে।

কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী দেশে আর ফিরিতে চাহেন না। অমি'র বিদ্রোহের পরে তিনি আর আপনার গ্রামে আপনার গৃহে চিরদিনের উন্নত শির লইয়া গিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন কি ? কালচিতার লোকেরা কি বলিবে ? কি বলিবে চিত্রিসারের মানুষেরা ? শেষে জেলেদের ছেলে বিবাহ করিল চৌধুরীদের মেয়ে !

বারাণসীর দিকেই পা বাড়াইয়া তিনি আছেন। কি বলেন হৈমবতী ? না, তিনিও আর ফিরিতে চাহেন না।

কিন্তু তবু ফিরিতে হইল। যে অধ্যায়টা জ্ঞানশঙ্কর না ভুলিয়াও

ভুলিতে বসিয়াছিলেন তাহাই আবার মনে পড়িয়া গেল—ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়া গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাদা প্রহরীরা হিন্দু ভদ্র পাড়ার উপরেই গুণ্ডাদের উসকাইয়া দিল। তাহারা পথে পথে সানন্দে কহিয়া বেড়াইতে লাগিল—'স্বরাজ লাও' 'স্বরাজ লাও'। গুণ্ডার লুঠ ও ছুরি তাহাদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় চূর্ণ করিবে জাতীয় জীবন—স্বাধীনতা আন্দোলন!—আর এই অরাজকতায় জ্বলিয়া গেল জ্ঞানের গৃহ! ইহাই ছিল জ্ঞান চৌধুরীর জীবনের প্রধান সঞ্চয়; আর ইহাই ছিল তাহার চরম ভরসা। তাহাও ফুরাইল।

জ্ঞান চৌধুরী প্রায় বাক্‌শক্তি হারাইয়া বসিয়া রহিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পরিচ্ছেদ ত তিনি ইতিপূর্বেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু কি জানিতেন এই শাসক-চক্রের বক্র কুটিল পথ কত বক্র? আর কত সর্বনাশী তাহা এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে? শুধু সমষ্টিগত নয়, ইহা একটা ব্যক্তিগত অপমান প্রত্যেকের পক্ষে; অন্যায় অপূরণীয় ক্ষতিও।—কত মানুষের, কত নিরীহ নরনারীর জীবনের উপরে সংসারের উপরেও ইংরেজ শাসন এইরূপই একটা অভিশাপ। উহার পতনকালীন আনুষাঙ্গিক এই ক্রূরতা ও বিভীষিকায় কত নিরপরাধ মানুষের প্রাণ ও সঞ্চয় এমনি পুড়িয়া যাইতেছে। তাঁহার আপন বাড়িও পুড়িয়া গেল এই দাঙ্গার ফলে—কোথায় দাঁড়াইবেন আজ পরিশ্রান্ত পরাহত জ্ঞান চৌধুরী জীবনের এই প্রান্তভাগে? কোথায় দাঁড়াইবেন সংসারের একান্ত নির্ভর-পরায়ণা হৈমবতী জীবনের এই শেষভাগে? শূন্য দৃষ্টিতে জ্ঞান চৌধুরী বসিয়া রহিলেন: সংসারে কি আছে তাঁহার ভরসা?

অশোকের নিকট তেমনি লোকজন আসিতেছে। তর্ক হইতেছে। পরামর্শও হইতেছে। একদল ছেলে ও মেয়ে আসিল, কি তর্ক করিল

অশোকের সঙ্গে।—বলিতেছে, 'প্রতিশোধ লইতে হইবে, এখনি লইতে হইবে ; না হইলে এই জ্বালা মিটিবে না, এই ক্রুরতা থামিবে না।' ইহারই মধ্যে রেবাও আসিল—একাই আসিয়াছে। অশোক বলিল : এসো।

রেবার বড় তাড়াতাড়ি। একটা পরামর্শ চাই তাহাদের। আইন অমান্যের একটা নূতন পন্থা উদ্ভাবনা করিতে হইবে। লবণে আর লোকে সাড়া দেয় না।

অশোক হাসিতে লাগিল। মতে মিলিবে না, তবু পরামর্শ চাই।

অশোক নিচে তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিল। একটু পরেই জামা পরিল—বাহির হইবে। আশ্চর্য। জ্ঞান নীরবে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন, অশোক একবার পিতার ও মাতার নিকট বাড়িটার কথা তুলিলও না। অশোক কি বুঝিতেও পারে নাই আজ শুধু তাহার পিতা নয়, মাতা নয়, সে নিজেও কত নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় ?

জ্ঞানের সম্মুখে আসিয়া অশোক একবার তবু দাঁড়াইল। বলিল: যা গিয়েছে গিয়েছে। ভয় কি এমন—যতক্ষণ কর্মক্ষম আছি আমরা! একভাবে দিন চলবেই—কিছু ভাববেন না ও-জন্য।

নামিয়া যাইতে যাইতে সে থামিল, আবার বলিল : আমি বিজয়ের বাড়ি থেকে আসছি ঘুরে। দুঃখ করবেন না—কি গেল, কি রইল, তা নিয়ে। দিন যাবেই !

জ্ঞানশঙ্কর নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলেন। সত্যই, কি হইবে তবে ভাবিয়া ? আর কাহার জন্য তিনি ভাবিতেছেন ? সংসারে তাঁহার কে আছে আর ? তিনি আর হৈম—এই ত! গৃহ নাই, অর্থ নাই, আশ্রয় নাই। নাই বা থাকিল ?—আছেন বিশ্বনাথ। বারাণসীর সত্রেই না হয় দুইজনার বাকী দিন কয়টা চলিয়া যাইবে।

১১

সেই চৌধুরীদের ভদ্রাসন ঃ—পদ্মার গর্জমান স্রোতে এবার বর্ষায় গলিয়া খসিয়া পড়িতেছে। কোথায় যাইবে এই নীলমাধবের বিগ্রহ? সনাতন চৌধুরী যাহা একদিন স্বপ্নাবেশে নদীতটে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন! কোথায় যাইবে এতকালের সঞ্চিত সেই চৌধুরীদের তৈজসপত্র—ইদানীং কাদম্বিনী যাহা আর উল্টাইয়া দেখিতেন না!—শেষবারের মত উহার ব্যবস্থা করিতে আসিতে হইল জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীকেই,—আর শান্তা অমরকে,—কোন আস্থা নাই যে অমরের এই ঐতিহ্যের প্রতি, কোনো শ্রদ্ধা নাই যাহার অতীত সুষমার ও গরিমার প্রতি। আর যে জ্ঞান চৌধুরীর আশৈশব সমস্ত স্বপ্ন ও কল্পনা জড়াইয়া রহিয়াছে এই চৌধুরীদের ভদ্রাসনের সঙ্গে, যাহার দেহের প্রতিটি রক্তকণায়ও তিনি অনুভব করিয়াছেন শঙ্কর চৌধুরীর পৌরুষ, ঐশ্বর্য্য আভিজাত্য, সনাতন চৌধুরীর শান্ত নম্র ভক্তি-সমৃদ্ধ বৈষ্ণব-প্রেরণা, বিজাতীয়া ভিন্ন ধর্মীয়া এই শান্তা তাঁহাকেই ধরিয়া বসে শুনিতে চৌধুরীদের কথা। কিন্তু কি আছে উপকরণ—যাহা দিয়া শান্তা বুঝিবে সেই শঙ্কর চৌধুরীর কথা? কিছুই আর নাই শঙ্কর চৌধুরীর দিনের—ভগ্ন ইট মৃৎপাৎ, তাহাও আর নাই। রঙীন পাথর ও পোড়া মাটির খোদাই মূর্তি আজ এই গৃহাঙ্গণে তাহার স্মৃতি জাগাইয়া তোলে না! শঙ্কর দীঘিও এবার নদীতে মিলাইয়া গেল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবী-মন্দিরের বিগ্রহ ভট্টাচার্যরা নূতন গ্রামে নূতন গৃহে স্থানান্তরিত করিয়াছে। সেই চিত্রিসারই থাকিবে না—ইহার পরে আর কে শুনিবে চিত্রিসারের শঙ্কর চৌধুরীর নাম?

আড়াই শত তিনশত বৎসর পূর্বে যে ভরদ্বাজ গোষ্ঠির সন্তান এই ব্রাহ্মণ যুবক নাকি তরবারির বলে চৌধুরী বংশের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পত্তন করিয়াছিলেন এই চিত্রিসার গ্রাম।—কি রহিল তাঁহার স্মৃতি? তাঁহার বংশধরদের সেই প্রতাপ দৌরাত্ম্য প্রজাশাসন কিংবা শক্তি কবেই গিয়াছে। আপনার নিয়মে ভাঙিয়া পড়িতেছে নীলমাধবের মন্দির। কে জানিবে একদিন এই ছোট অঙ্গনে পঞ্চবটীতলায় বসিয়া সনাতন চৌধুরী ভাগবত পড়িতে পড়িতে ভক্তিরসে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন? জানিয়াছিলেন—পৃথিবী প্রেমময় ঠাকুরের এক পরম আশ্চর্য লীলা। শাক্ত চৌধুরী বংশের দুর্দান্ত আভিজাত্যকে তিনি দান করিয়া গিয়াছিলেন এক বৈষ্ণব সদাচার ও প্রীতি করুণার শান্ত ঐতিহ্য।

তুলট কাগজের পুরাতন পুঁথি লইয়া অমর জ্ঞান চৌধুরীর সম্মুখে বসে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন সনাতন চৌধুরী। সামান্যই উহার টিকিয়া আছে। তাহাও জ্ঞান সহজে পড়িতে পারেন না। তবু দুই জনায় পড়িয়া উঠিলেন:

গোপীগণ পূজে তোমা কালী কাত্যায়নী।
আমি জানি তুমি দেবী নিত্য নারায়ণী॥
তুমি দেবী বিষ্ণুমায়া মহামায়া আর।
প্রকৃতি-রূপিণী তুমি সর্ব সারাৎসার॥

শাক্ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়াছিলেন যে সনাতন চৌধুরী এমনি ছিল তাঁহার উদার ভগবদ্‌বিশ্বাস। আর এমনি উদার তাঁহার উত্তরাধিকার পরবর্তী চৌধুরী বংশধরদের নিকটে।...কাহার নিকটে? অমরের, অশোকের, অরুণের,—সুরেশ্বরের, অতুলের কিংবা ভূত্যর্ত ছেলে মেয়েদের

—কাহার নিকটে আজ এই উত্তরাধিকার গ্রাহ্য? কোন্ উত্তরাধিকার কোন্ ঐতিহ্য গ্রাহ্য—শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব, শঙ্কর চৌধুরীর তেজোবীর্যময় রাজসিকতা, কিংবা সনাতন চৌধুরীর প্রেমভক্তিপূত সাত্বিকতা—চৌধুরীদের কোন ঐতিহ্য শ্রদ্ধার বস্তু ইহাদের নিকট?—প্রায় শত বৎসর ধরিয়া দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহারা জীবিকার দায়ে। তবু এতদিন এই চিত্রিশারের ভদ্রাসন ছিল চৌধুরীদের প্রাণকেন্দ্র, তাহাদের জীবনের মূল-মৃত্তিকা। আর এই চৌধুরী গোষ্ঠীর সাহস ও মর্য্যাদাবোধ, সদাচার ও ধর্মনিষ্ঠা ছিল তাঁহাদের আত্মার আশ্রয়। এইবার সেই মৃত্তিকাও খসিয়া যাইতেছে জীবনের মূল হইতে; সেই চৌধুরী চেতনা ও মিলাইয়া যাইতেছে একালের উদ্ভট্ অদ্ভুত নানা কর্ম ও চিন্তার তাড়নায়। এই ভদ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে,—নিঃশেষে লোপ পাইবে,—সেকালের চৌধুরীদের প্রাচীন ভৌমিক আভিজাত্যের স্মৃতি, আর এদিনের চৌধুরীদের এই কর্ম-জীবনের সমস্ত উদ্যোগশীলতা, সমস্ত দায়িত্ব বোধ, ভদ্রতা কর্তব্য-নিষ্ঠা। তারপর কি হইবে এই চিত্তহারা, গৃহহারা ধর্মহারা সন্তানেরা?…ফ্লোটস্যাম এণ্ড জেট্‌সাম—গাঙভাসি কচুরিপানা আর কচুরি ফুল—অমরের মতে 'দেরাসিনে', অশোকের আদর্শ ত সেই প্রোলেটেরিয়ান্ সর্বহারাই…

শান্তা চমকিয়া উঠে। বলে: না, না; অশোক মূর্খ নয়।

কিন্তু অশোক একবার শেষ দেখা দেখিয়া গেল না তাহার পিতৃ পুরুষের ভিটাকে? জ্ঞান চৌধুরী বেদনা পাইতেছিলেন। শুনিয়া খানিকটা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তা ও হতাশাও তাহাতে বাড়িয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে স্থান না পাইয়া মনোজীবন

হঠাৎ কোন কৃষ্ণপ্রিয়া মাতাজীর সন্ধান পাইয়াছে পুরীতে। বহু তাহার শিষ্য শিষ্যা। মনোজও সব ছাড়িয়া সেই আশ্রমে চলিয়া গিয়াছে। অশোক তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পুরী গিয়াছিল; কিন্তু মনোজ আসে নাই। সে বুঝিয়াছে সভ্যতার মধ্যে সত্য নাই; উহা প্রাণ লীলার শত্রু। অশোক তর্ক করিয়াছে, কিন্তু বুঝিয়াছে মনোজের মত ভাববাদীদের এই যুগে এইরূপই ঘটে।

হিরণ্ময়ের নিকট হইতে অমর আর একটা সংবাদও সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিল। খানিকটা জ্ঞানশঙ্করকে সে তাহা জানাইতেও বাধ্য হইল। বিজনের সঙ্গে অশোকের পূর্বাপর মতানৈক্য ছিল। অশোকের কারাবাসকালে 'অভিযান' যখন উঠিয়া গেল তখনি হিরণ্ময় আপত্তি করে। বিজন নূতন ছাপাখানার সুযোগটা সম্পূর্ণ নিজের কাগজ 'প্রভাতীর' উন্নতিতে গ্রহণ করিতেছে। 'প্রভাতী' দাঁড়াইয়া গেল,—'অভিযান' উঠিয়া গেল। সন্দেহ নাই কৃতিত্বও বিজনের ছিল। তাহার কলমে জোর আছে: আর আছে তাহাতে সময়োচিত কালি ছড়াইবার কৌশল। তাহা ছাড়া সত্যই উদ্যোগী পুরুষও বিজন। সিনেমার বিজ্ঞাপন হাত করিয়া বসিয়াছে; হয়ত এখন সরকারী সাহায্যও গোপনে পায়। ছাপাখানা সে-ই দেখিত, নৃপেন্দ্র ফটকা বাজার লইয়া মাতিয়া থাকিত। তারপর যখন নৃপেন্দ্র বিপদে পড়িল ছাপাখানার অংশও বন্ধক রাখিয়া এক মারোয়াড়ীর নিকট হইতে বিজন তাহাকে টাকা আনিয়া দেয়। অবশ্য ছাপাখানা সেই স্বত্ব আসলে নৃপেনের নয়, জ্ঞানের। আইনের চক্ষেও তিনি ঐ অংশের মালিক স্থির হইবেন। কিন্তু সেই ছাপাখানা এখন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে বিজন—কতকটা নিজের অংশ আছে বলিয়া, কতকটা সেই মারোয়াড়ীর নাম করিয়াও। অমর পরিহাস করিয়া জানায়,—অশোক একে ত সম্পত্তি লইয়া দাবী

করিতে চাহে না,—কারণ, সে সর্বহারা শ্রেণীর লোক ;—তাহার উপর বিজনের সঙ্গে মামলা করিতে সে পারিবে না। আর একটা গোলযোগ জন্মিয়াছে।

গোলযোগটা কি ?—তাহাও অমর জানায়। মালিনীর দিকে নাকি সম্প্রতি বড় বেশি আকৃষ্ট হয় বিজন।

মালিনীর দিকে ?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন জ্ঞান চৌধুরী।

হাঁ, মালিনীর দিকে। সেও ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে ত—

কিন্তু বিজন যে বিবাহিত, তার ছেলে মেয়ে আছে ;—

তাতে আশ্চর্য্য কি ?—অমর সহজ ভাবে বলিল।

আশ্চর্য নয় ?—বিমূঢ় হন জ্ঞানশঙ্কর। তারপর আবার মনে পড়ে—নৃপেনের কি স্ত্রী ছিল না ? ছিল না ছেলে মেয়ে ?—কিন্তু তাই বলিয়া বিজনও এমন তরলচিত্ত ? সে অশোকের বন্ধু, অমন বুদ্ধিমান কর্মপটু, আর ব্রাহ্ম হেডমাষ্টার বিপিন করের পুত্র। হাঁ, বিপিন করের পুত্র যদি ছাপাখানা ও টাকা পয়সা সম্বন্ধে এমন অসাধু, ডিজঅনেষ্ট, হইতে পারে, তাহা হইলে আর কি বাকি আছে তাহার চরিত্রহানির ? বরং স্ত্রীলোকের প্রতি অবৈধ আকর্ষণ অনেক সময়ে আসে ভালো লোকেরও ;—জীবনে তাহা সাময়িক দৌর্বল্য, কত মহাপুরুষেরও তাহা ঘটিয়াছে। তথাপি ব্রাহ্ম বিপিন করের ছেলে টাকাকড়ি আত্মসাৎ করিবে, বন্ধুকে প্রতারণা করিবে এবং স্ত্রী থাকিতেও অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হইবে ? অভাবনীয় অধঃপতন ইহা বিজনের পক্ষে ; জ্ঞান ত ইহা ভাবিতেও পারেন নাই।

জ্ঞানের চিন্তায় বাধা দিয়া অমর বলিল : এখন নৃপেনের স্ত্রী অমলা মালিনীকে অপমান করে এসেছেন। মালিনী লজ্জায় দুঃখে সরে যেতে চায় এ সব কাজে। আবার, এদিকে অশোককে

এসে অমলা শাসিয়েছেন,—'আপনিই বা মালিনীকে বিয়ে করছেন না কেন ?'

চমকিত হন জ্ঞান।

কেন ? অশোকের বিয়ে করবার কথা নাকি মালিনীকে ?

অপ্রত্যাশিত একটা কথা, হয় ত অমরের ইহা ইঙ্গিতও। কিন্তু তাহাতে উৎফুল্ল হইবেন কি জ্ঞান ? কিংবা হৈম ? মালিনী হিন্দু-সমাজের মেয়ে নয়, তাহাও ত জানেন তাঁহারা।

অমর বলিল : কথা কিছু নেই। তবে বিয়ে করলে মালাকেই করতে হয় অশোকের।—নিজের পরিশ্রমে সে নিজের জীবিকা অর্জন করে ; এর চেয়ে বেশি প্রোলিটেরিয়ান্ পাত্রী পাবে কোথায় অশোক এ দেশে ?

কেন ? স্ত্রী চাকরি না করলে কি ওর জাত যাবে ?

অমর হাসিল। বলিল : প্রায় তা'ই। যে মেয়ে পরিশ্রম করে খায়, আমাদের সমাজে তারই প্রায় জাত যায়। যতই মিস্ মেয়োকে আমরা গাল পাড়ি একথা নেহাৎ মিথ্যা নয়। ভাবুন শিক্ষয়িত্রী, লেডি ডাক্তার, নার্সদের সম্বন্ধে আমাদের সমাজের ধারণা। কিন্তু অশোকদের সমাজে যে খেটে খায় সে-ই হল কুলীন। পরশ্রম-ভোগী—men of independent means ত ওদের দুশ্‌মন্—'leisured class'।

জ্ঞানশঙ্কর এই সব রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে চাহেন না,—অমর কিন্তু পারিলে তখনই সে আলোচনায় মাতিয়া উঠে। কিন্তু জ্ঞান জানিতে চাহিলেন : তবে যে সেই ওর ছাত্রী রেবা অশোকের কাছে অত আসা-যাওয়া করছে ?—

আসা-যাওয়া বৃথা। প্রথমত, রেবার বাড়ীর লোকে তার বিয়ে ঠিক করে রেখেছে বীরু বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে। সে এটর্নি হবে, তারা বেশ সম্পন্ন পরিবার। রেবার মতামতে কি যায় আসে ? রেবার চেয়ে বরং সেই

নিতু মেয়েটা তেজী—অরুণকেই শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করতে পারে, অসম্ভব নয়। অরুণটারই মতামত কিছু ঠিক নেই। তবে তা হল অন্য কথা। এদিকে দ্বিতীয় কথা, অশোকের মতিগতি বলে একটা শক্ত বালাই আছে। তা রেবার স্বপক্ষে হবে না। অশোক আপনাদের মতের বিরুদ্ধেও বিয়ে করতে পারে, কিন্তু সে নিজের মত-সম্মত মেয়ে হলে;—যেমন মালা। কিন্তু বিপদ, ওর মতো মানুষ আসলে শেষ পর্যন্ত বিয়েই করে না—কেউ জোর করে ওদের বিয়ে না করলে। ক্রমশই বিয়ের নামে ওদের ভয় বাড়ে।—

একটা আলোচনার বস্তু, অমর কি তাহা ছাড়িতে পারে?—বিবাহকে ভয় করে বলিয়াই অশোকের মত লোকেরা বিবাহের কথা ভাবে না। এমন কি কোথাও বিবাহের সম্ভাবনা ঘনাইয়া আসিলে নানা যুক্তি তুলিয়া পালায়। তাই বলিয়া মিসোজনিষ্ট নয় ইহারা। তাহা হয় বিবাহিত ঘরপোড়া গরুরা। অশোকেরা মেয়েদের ভয় করে না, তাহাদের সঙ্গ বর্জনও করে না, কিন্তু ভয় করে বিবাহকে। আর দিন যত যায় তত সেই ভয় বাড়ে। যত এই ভয় বাড়ে, তত কাজে মাতিয়া উঠে; ততই আবার শান্ত গৃহশ্রীর প্রতি ইহাদের গোপন শ্রদ্ধা জন্মে। তাই রেবা ললিতাদের নয়, নিজেরই অজ্ঞাতে মালিনীদের ইহারা মনে মনে বাছিয়া লয়। অথচ সচেতন জীবনে নানা কাজের ওজুহাতে তাই মালিনীদের নিকট হইতে দূরে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহে।

কিন্তু অমর মনোবিজ্ঞানের এমন একটা চমৎকার সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ পাইল না। জ্ঞান চৌধুরী এই সব বিষয়ে কথা বলিলেন না—কথাটা তাঁহার গভীরতম চিন্তায় ও চেতনায় আশ্রয় লইতেছে। সামান্য বুদ্ধি অমরদের না থাকুক, জ্ঞানের ত আছে?

অশোকদের এই পূর্বরাগ অনুরাগের কথা তিনি আলোচনা করিতে বসিবেন নাকি অমরের সঙ্গে ?

জ্ঞানশঙ্কর তাই বলিলেন : কিন্তু ছাপাখানাটা কি সত্যই তবে বিজন গ্রাস করলে ?—আবার জ্ঞান ভাবিতেছেন, বিপিন করের ছেলে এমন কাজ করিবে ?—তাহা হইলে সমাজে আর কি অধঃপতন বাকী থাকিবে ?

অমর বলিল : চেষ্টা করছে, কিন্তু পারবে না ; আপনি ত আইন জানেন। অশোক না হয় সংকোচ বোধ করবে, কিন্তু হিরণ্ময়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, বিজনও হয়ত সালিশীতে রাজী হবে। নৃপেনই ডুবিয়ে গিয়েছে সব। মারোয়াড়ীর অতটা ধার শোধ করে বিজনের সঙ্গে আবার পার্টনারশিপে ব্যবসা করা আমারও ভালো ঠেকে না। দেখবেই বা কে ? অশোক ওয়ার্কিং জর্ণালিষ্টই হবে, ব্যবসাপত্র দেখতে পারবে না। বলেই দিয়েছে—সে হল ওয়ার্কিং ক্লাশের লোক—হবে ওয়ার্কিং জর্ণালিষ্ট। ব্যবসাপত্র, বাড়িঘর এসব থাকলেই তার অস্বস্তি।...

বাড়ি ঘর, বিত্তবিষয় আর রহিল কি ? মধুখালির বাড়ি আগেই গিয়াছে, চিত্রিসারের ভদ্রাসন যাইতেছে। ঢাকার বাড়ি ও জমি জ্ঞান বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন। ঢাকায় আঁর যাইবেন না। ভদ্র-লোকের জীবন-যাত্রা সেখানে অসম্ভব এই কালে।—ইংরেজ রাজত্ব ক্রুর নীতিতেই এই দেশের ইতর-ভদ্র সকলের জীবনকে ছারখার করিয়া দিবে, ঠিক করিয়াছে। অন্তত একটা 'থার্টি ইয়ারস্ ওয়ারের' আগুন জ্বালিয়া তুলিবেই ইংরেজ। আর অন্য দিকে সেই সর্ব্বনাশেরই নানা পাকে জড়াইয়া এই দেশের ভদ্র-সমাজ আপনাদের ভদ্রতা, মর্য্যাদা, ঐতিহ্য সব ভাসাইয়া দিতেছে। অশোকের মত, অরুণের মত, অমিতার মত—সত্যর

মেয়ে মিলির মত, বিপিন করের ছেলে বিজনের মত, কিংবা নানা ভাবনায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন মনোজের মত ইহারা আত্মভ্রষ্ট,—কোথাও আর কোনো গাম্ভীর্য্য নাই জীবনে। কোথাও আর স্থিরতা নাই, জীবন যেন শ্রীহারা, পথভ্রষ্ট। কি হইত চিত্রিসারের এই ভদ্রাসন টিঁকিয়া থাকিলেই বা আর? ভদ্র-লোকের ভদ্র-জীবন-যাত্রাই ধসিয়া পড়িতেছে সকল দিকে।...

তবু সেই চিত্রিসারের শেষ মৃত্তিকা-খণ্ডও বড় মধুময়। তাহার প্রত্যেকটি গাছের প্রত্যেকটি শাখার সঙ্গে জীবনের কত আনন্দ-বেদনা গ্রথিত। এই গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না জ্ঞান চৌধুরী। যাইতেনই বা কোথায়? এক আছে বারাণসী, সকল মানুষের চিরদিনের আশ্রয়।

অশোকের তার আসিয়া পৌছিল—'অমিতা আইন অমান্য করিয়া জেলে চলিয়া গিয়াছে।' অমনি, যে নাম উচ্চারিত হওয়াও নিষিদ্ধ সেই নামই আবার নূতন একটা মমতা ও করুণার অঞ্জন মাখিয়া মনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কেন অমিতা এমন কাজ করিল? এই সেদিন সে বিবাহ করিয়াছে মিলনকে। আর যাহাই তাহার দোষ থাকুক, মিলন চতুর ছেলে। রেডিও কোম্পানী ছাড়িয়া একটা বিলাতী কোম্পানীতে ভালো কাজ করিতেছে, সে রাজনীতির ধার ধারে না। তাই সকলেই মনে করিয়াছিল অমিতাও রাজনৈতিক ক্ষ্যাপামি কাটাইয়া উঠিয়াছে, হয়ত নৃত্য গান লইয়া সে মাতামাতি করিবে। এত দিন সুমন্ত্রদের দুঃসাহসিক প্রয়াসের এক-একটা সংবাদ যখন আসিয়াছে তখন কাদম্বিনীও অমর মনে মনে কাঁপিয়া উঠিয়াছেন ইন্দিরার জন্য। ইন্দিরা চাপা মেয়ে, বাংলা দেশে থাকিলে এতক্ষণে সে কি কাণ্ড করিয়া বসিত বলা যায় না। কাশীতে থাকিলেও কি অমর তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে

পারে? অমর জানে স্বদেশীর গোপন চক্রান্তে ইন্দিরা সেখান হইতেও যোগ রাখে। তবে কাশী একটু দূর। বাঙলা দেশের ঘূর্ণী সেখানেও পৌঁছায়, কিন্তু পৌঁছায়ে অল্প করিয়া। শাস্তা অমর তথাপি তাড়াতাড়ি কর্মস্থলে ফিরিয়া গিয়াছে। অমিতাব কথাটা কিন্তু এতদিন তাঁহারা ভাবেই নাই—ইন্দিরা ও অশোকের জন্যই ছিল কিছু দুশ্চিন্তা। কি করিয়া অমিতাব মাথায় আবার এই ক্ষ্যাপামি জাগিল?

এমন কি ক্ষ্যাপামি?—তর্ক করিতে আসিল কমলা। মা বাবা দেশ ছাড়িয়া কাশী যাইবেন চিরদিনের মত, তাই কমলা এখানে আসিয়াছে; এই কয়দিন থাকিবে তাঁহাদের নিকটে। সে এখন এমন তর্ক প্রায়ই করে। শরীর তাহার যতই ভাঙিয়া পড়িতেছে ততই যেন কমলা আপনার মনের সেই প্রসন্নতা হারাইয়া ফেলিতেছে। এখন সে তাই প্রায়ই তর্ক করে, সে আর তেমন শান্ত সুস্থির মেয়েটি নাই।

সুচিক্কণ সেই দেহশ্রী তাহার নাই, চোখে মুখে কেমন যেন তীক্ষ্ণতা, অস্থিরতা, টানাটানা চোখে তীব্র ছটা। দেহের অসুস্থতা মানুষকে কেমন পরিবর্তিত করিয়া ফেলে—জ্ঞানশঙ্কর কমলার দিকে তাকাইয়া ব্যথিত মনে তাহা ভাবেন, তাহার তর্ক প্রবৃত্তিতে তিনি খুশী হন না। অসুস্থ দেহে মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষা কি সহজ কথা? জ্ঞান কমলার এই তর্ক তাই একটু মমতা ও বেদনার সহিত মানিয়া লন। তাহার তর্ক-নিপুণতা দেখিয়া আবার নিজেকে উৎফুল্লও করিতে চেষ্টা করেন—কেমন চমৎকার তবু এখনো কমলার বুদ্ধি!

কমলা তর্ক করিতে চাহে—অমি' এখন কি অন্যায় করিয়াছে? কমলার ছেলে-মেয়ে দুইটি না থাকিলে সেই কি আজ বসিয়া থাকিত নাকি—কবিরাজ বাড়ির গো-সেবা, অতিথি- সেবা, আর ঠাকুর-সেবা করিবার জন্য? অনেক করিয়াছে সে তাহা, না হয় এবার করিত

দেশসেবা,—গো-সেবার তুলনায় এমন কিছু সামান্য হইত না তাহা। আর জেল?—তাহার শ্বশুরের সংসারের নিঃশ্বাসহীন ঘানি-টানার অপেক্ষা জেলের ঘানি-টানা কি বেশি কষ্টকর!

এইরূপ কথা প্রায়ই এখন কমলা বলে। তবু বড় বেশি বলিল এবার অমিতার কথা উপলক্ষ করিয়া। বুঝি সমস্ত পরিবারের মধ্যে সে-ই আজ অশোকের মত' অমিতার সেচ্ছাবৃত বিবাহ ও স্বেচ্ছাবৃত কারাবাস, সব কিছুকে সমর্থন জানাইতে চায়। মনে মনে অভিনন্দনও করে। জ্ঞান চমকিত হন। সেই কমলা,—শ্বশুর বাড়ির সেই প্রাচীন সদাচার সদাব্রতের মধ্যে যে প্রথম বধূজীবনে আপনাকে নিঃশেষে মিলাইয়া দিয়া এক কল্যাণী শ্রীময়ী গৃহবধূটি হইয়া উঠিতেছিল—একি হইল তাহার? অসুস্থ দেহের তাড়নায় সে নিজের ও কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্য ইতিপূর্বে দায়ী করিয়াছিল তাহার স্বামী ও শ্বশুরদের প্রাচীন রক্ষণশীলতাকে। সেই সূত্রেই শ্বশুর-গৃহের পঠন-পাঠনের বিরোধিতায় বিরক্ত হইয়া সে নূতন সান্ত্বনা খুঁজিতেছিল পিতামাতার নিকটে; মাতিয়াছিল নানা গ্রন্থ পাঠে, আলোচনায়; আর শেষে আপনার কল্পনা-প্রবণ মনের সৃষ্টি প্রয়াসেও। তাহাও সে ছাড়িয়া দিয়াছে এখন। সত্যই কি সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই শ্বশুর বংশের সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠায়, পূজা-পার্বণ অতিথি-সেবায়, বাঁধাধারা দিনযাত্রায়? শুধু একটা 'ঘানি' তাহার কাছে—সেই জীবন? হৈমও বলিতেন—বড় সেকেলে এখনো সেই পরিবার, আর বড় বেশি নিরীহ 'বাধ্য ছেলে' জামাতা জিতেন্দ্র। একটা ভালো ডাক্তার সে সেই শহরে; দুইটি সন্তানের পিতা। তথাপি মুখ তুলিয়া বাপ মায়ের সঙ্গে কথা বলিবে না। আর কমলাকে শাশুড়ীর মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে, ছেলে-মেয়ের একটি জামার জন্য, কিংবা নিজের একটু সুচিকিৎসার জন্য। বড় বাড়াবাড়ি ইহা,—জ্ঞানও তাহা

বোঝেন। কিন্তু সত্যই কি তবে কমলা সেই আবেষ্টনীতে আর নিঃশ্বাস লইতে পারে না?

ম্লান হাস্যে জ্ঞান কমলাকে বুঝাইতেছিলেন: অমন বাড়িতে পড়েছ, তাই বোঝো না—কেমন শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায় এ সব হৈ-চৈ'তে মেয়েরা···

জ্ঞানের মনে পড়ে ললিতাকে, রেবাকে—সেই অতি উত্তেজিতা মেয়েদিগকে; তাহাদের পার্কের সভা, তাহাদের মিছিল। তাহাদের মুখে চোখে একটা লালিত্যহীন কাঠিন্য কেমন দিনে দিনে চাপিয়া বসিতেছে। সেই অসুস্থতাই 'অমি'কে পাইতেছিল? কিন্তু সেই উত্তেজনাই কি এখন দেখিতেছেন কমলার মুখে-চোখেও?

কমলা বলিল: কোন্ শ্রী আছে আমাদেরই বা গোবর-ন্যাতায়? একখানা বইও পড়া চলে না। লেখার কথা শুনলে আপনাদের জামাইও মূর্চ্ছা যেতেন। পূজা ব্রতের আল্‌পনা আঁকলেই যথেষ্ট হল।

হৈমবতী আর পারিলেন না। কমলা মাত্রা জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছে। কঠোর হইতে হইবে এবার তাঁহাকে। কঠিন স্বরেই তিনি বলিলেন:—তোমার মত লেখাপড়া দিয়ে সংসারের কি হোত?

সংসারের না হোক আমার হোত। আমি অন্তত মানুষ হতাম। আর, মানুষ যে সংসারে কাজে লাগে না তেমন সংসার যেন শেষ হয় শীঘ্রই। অন্তত আমার মেয়েকে আমি তাই বলে যাব।

মাকে উপলক্ষ করিয়াই কমলা বলিল। মুখের মাস পেশী দৃঢ় কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, কিন্তু তীক্ষ্ণ।

হৈমবতীও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন: বেশ তোমাদের মেয়েদের তোমরা যা খুশী তৈরী করো। এ জীবনে আমার মেয়েদের দিয়ে আমি যে সুখ পেলাম, ঈশ্বর না করুন, তা যেন আর তোমাদের পেতে না হয়।

ঘর হইতে চলিয়া গেলেন হৈমবতী।

এ কি হইল! কোথা দিয়া কি ঘটিয়া যাইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারেন না জ্ঞানশঙ্কর। কোন্ তর্ক কি আকার গ্রহণ করিল! কোথায় কি হইয়া যাইতেছে! জ্ঞানশঙ্কর বসিয়া থাকেন বিমূঢ় ভাবে। হঠাৎ কমলার অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠ শুনিতে পান: বাবা!

জ্ঞানশঙ্কর ফিরিয়া বলেন: কি কমলা? কি?

কাঁদিতেছে নাকি কমলা? কই, চোখে জল নাই ত তাহার। ব্যস্ত হইয়া উঠেন জ্ঞান: কি কমলা? কি? বলো, বলো।

বলছি।—একবার থামে কমলা। তারপর বলিয়া ফেলে: মা হয়ত বল্‌বেনও না জীবনে, কিন্তু আমিই বলব।—অন্যায় করিনি, বাবা। পাপ করিনি। অন্তত অমর্য্যাদা করিনি—করতামও না,—আপনাদেরও না, আমারও না। এও বল্‌ব আপনাদের জামাইও আমাকে তুচ্ছ করেন নি—কোনো দিন। ওঁদের সংসারে আমি ব্রত-নিয়মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে গিয়েছিলাম; কিন্তু পারি নি। আমার মন আর সে সব নিয়ে নিজেকে ছলনা করতে পারল না শেষ পর্য্যন্ত। দেখতাম —সবাই লেখাপড়া করে, মেয়েরা কেউ গান শিখছে, কেউ বাজনা শিখছে, দেশের কত কাজ করে তারা। দেখে আমার মন কাঁদত—আমি কি কিছু করতে পারি না? নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়েছে, নিজের মধ্যে গুমরে মরেছি আমি।—ভালো লাগল তাঁকে যাঁর মধ্যে দেখলাম আমার এই গোপন বেদনার জন্য বেদনা-বোধ। জীবনে আর কাউকে গ্রহণ করতে পারতাম না আমি, এ কথা আর তখন মনে করতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে কেঁপেছি তারপর সর্ব্বক্ষণ—পাছে অমর্যাদা করি কারো। কিন্তু আর আমি সে ভয়ও করিনা। নিজে না হয় পারলাম না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের অন্তত মানুষ করব আমার ইচ্ছা মত,—তাতে এখন ওঁদের

বাড়িতে আমার জায়গা হোক বা না হোক। জায়গা না হলে—খাটব খাব! তাতে ভয় নেই, লজ্জাও নেই আমার।

জ্ঞান চোধুরী কি জীবিত না মৃত? অক্ষয় অশ্বত্থ, না, বজ্রাহত বনস্পতি?

নীলমাধবের মন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে নদীগর্ভে। কি করিবেন এই বিগ্রহ লইয়া জ্ঞানশঙ্কর? সে দিনের পরে দ্বিতীয়বারের আঘাতটাও হয়ত ঠেকাইতে পারিয়াছে দেহ; কিন্তু তৃতীয় আঘাত আর কত দূরে? পদ্মার অট্টহাস্যের মধ্যে, কুটিল কলধ্বনির মধ্যে জ্ঞান চৌধুরী কালের সেই সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাই দেখিতে পাইয়াছেন, দেখিতে পাইয়াছেন আপনার নিয়তি, চৌধুরীদের নিয়তি, সমস্ত ইতিহাসেরই একটা বিদ্রূপ হাস্য। মর্মে মরিয়া হৈমবতী স্তব্ধ হইয়া ছিলেন। কমলা আপনার গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। আর 'কছু জানেন নাই জ্ঞান, জানিবার ইচ্ছাও রাখেন নাই, হৈমও বলেন নাই। তেজস্বিনী কমলা কিন্তু অস্বীকার করিয়া যায় নাই আপন সংকল্প। জানাইয়া গিয়াছে—সৎ সে, সত্যকে গ্রহণ করিবে; আর তাই সে সতী। স্বামী-গৃহে তাহার স্থান হউক বা না হউক; আর যাহা খুশী বলুক তাহাকে এই সংসার সমাজ।

পুরাতন কাঠের সিন্ধুকের কাগজপত্রের মধ্য হইতে হাতে লেখা দলিলপত্র কাদম্বিনী বাছাই করিয়া রাখিবার জন্য দিতেছিলেন জ্ঞানকে। উহারই মধ্যে অকস্মাৎ চক্ষে পড়িয়াছে অতীতের এক পরিচিত হস্তাক্ষর। কাহার এই লেখা? ওঃ! জ্ঞানেরই যে। তাঁহার প্রথম জীবনের লেখা প্রথম প্রবন্ধ। তখনো যৌবনের প্রবল আশ্বাস ছিল তাহাদের সম্মুখে। তাই বন্ধু সুবোধের অনুরোধে জ্ঞানও সেদিনকার নিয়মে

লিখিয়াছিলেন প্রবন্ধ—"তীর্থ"। প্রবন্ধের যুগ তখন, গম্ভীর চিন্তার, গম্ভীর অনুভূতির দিন—হালকা হাতের হালকা কাজের দিন তখনো আসে নাই।

জ্ঞান চৌধুরী পড়িলেন—"সত্যকারের তীর্থ এই সংসারের মধ্যেই বটে, তবু সংসারের ধূলি মাটির ঊর্ধ্বলোকেও মানুষ আপনাকে তুলিয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা না পোষণ করিয়া পারে না। এই অস্থির আবর্তময় সংসার স্রোত ছাড়িয়া একটি স্থির কেন্দ্রে আপনাকে সমর্পণ করিতে না পারিলে মানুষের শান্তি কোথায়? সেই তীর্থ ই ভগবানের চরণচ্ছায়ায়—তাঁহার ত্রিশূলাগ্রে।

কিন্তু আঘাতে আঘাতে মনের সমস্ত মোহ চূর্ণ হইয়া না যাইতে মানুষ বুঝি তাহা বুঝিতে পারে না। সংসার বিদায় না দিলে মানুষ বুঝি সংসারকেও চিনিত না—আপনার সৃষ্ট মোহজালকেই চূড়ান্ত বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিত। জানিত না ধ্বংসের মধ্য দিয়াই সংসারকে নিত্য নবীন সৃষ্টিতে টানিয়া আনেন যে বিধাতা, তিনি কাহাকেও নিস্তার দেন না—সব কিছুকে তিনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আবার গড়েন—না হইলে তাঁহার শান্তি নাই।"

এ কি লিখিয়াছিল সেদিনকার যৌবনের সাহসে জ্ঞানশঙ্কর?—"কাল যাহাকে পক্ককেশের অভ্রান্ত লিখন দেখাইয়া সংসার পরিত্যাগের আদেশ দেয় তাহার আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে নাই—তাহার সংসার তখন মহাকালের আসরে।"...

জ্ঞান, সেদিনের যৌবন-সাহসে অফুরন্ত আস্থা লইয়া এই নির্দেশ রচনা করিয়াছিলে তুমি কাহার জন্য? রচনা যদি করিয়াছিলে কেমন করিয়া তাহা বিস্মৃত হইলে? কোথায় খোয়াইলে সেদিনের সাহস, সেদিনের সংকল্প, ভাবিকালের প্রতি সেই আস্থা?

আত্ম-জিজ্ঞাসায় সজাগ হইয়া উঠিলেন জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী।

সংসার ত তাঁহাকে বিদায় দিয়াছে। শুধু তাঁহাকে কেন, তাঁহাদের কালকে, তাঁহাদের চিন্তাকে, তাঁহাদের ধ্যানধারণাকে, তাঁহাদের সমস্ত জীবন-পন্থাকেই আজ বিদায় দিতেছে মহাকাল। তথাপি কেন জ্ঞানশঙ্কর এই সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহেন? কেন? আপনার কর্তব্য শেষ হয় নাই বলিয়া?—অশোক সংসারী হয় নাই, অরুণ দায়িত্বহীন বালকই রহিয়া যাইতেছে; হৈম'র জীবন-যাত্রারও কোনো সুনিশ্চিত সংস্থান নাই;—চিত্রিসারের চৌধুরীদের নাম বা তাহাদের এই ভদ্রাসন, আজ তাঁহারই চোখের সম্মুখে পদ্মার স্রোতে মিলাইয়া যাইতেছে; ঘরে বাহিরে সংসারে সমাজে চারিদিকে তিনি দেখিতেছেন সেই ভদ্র জীবনাদর্শের ও জীবন-শ্রীর শোচনীয় পতন;—তাই কি তাঁহার এই ক্ষোভ, এই হতাশা, এই অভিযোগ?—কিন্তু কেন? মহাকালের এই ভাঙা-গড়ার হিসাব কতটুকু তিনি জানিয়াছেন যে, শুধু জীবন-পরম্পরার এই একটি খণ্ডকেই, তাঁহার কালের সেই সুনিশ্চিত সুস্থির জোয়ার-ভাটার দিন কয়টিকেই তিনি সনাতন বলিতে চাহেন? বিধাতার ধ্বংস ও সৃষ্টির শাশ্বত লীলাকে বাতিল করিয়া দিয়া তাঁহারা কেন বলিতে চাহেন 'আমরাই তাঁহার চরম দান, এইখানেই তাঁহার কলা-নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ! Thus far, and no further. এইখানেই থামুক কালস্রোত, চক্রাকারে আবর্তিত হোক্ জীবনের উজান-গঙ্গা।'

জ্ঞানশঙ্কর বুঝিতেছেন—সংসারকে তিনি মানিতে চাহেন না বলিয়াই সংসার তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিতেছে এত নির্মম হস্তে। কালকে ঠেকাইতে চাহিয়াছেন বলিয়াই মহাকালের বিরাট্ লিখনকেও তিনি আর পড়িয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন না—কত কত যুগের কত কত আসর এমন ভাঙিয়া গিয়াছে।—

ইতিহাস ছাড়াইয়া প্রাণ-বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ভাসিয়া যায় জ্ঞান চৌধুরীর। কোটি কোটি প্রাণীর কোটি কোটি বৎসরের শ্রান্তিহীন যাত্রার ইতিহাস মনে পড়ে। কোন্ প্রাণ বীজে সেই জীবন প্রচেষ্টার সূচনা!—সমুদ্র মথিত করিয়া, পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া, আকাশ মাথায় লইয়া, কত তুষার যুগ আর কত উষ্ণ মন্বন্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে সেই জীবনের জয়যাত্রা। কত জীবজাতি লুপ্ত হইল, আর তাহাদের শ্মশান-ধূমে কত নব নব জীবনের আরতি হইল।...মানুষের ক্ষুদ্র ইতিহাসেও ত কত নূতন পর্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, আবার শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কালে—এই দুইটি দশকের মধ্যেই—পুরাতন পৃথিবী কত জার, কত কাইজার, হাব্‌সবুর্গ ও উসমানী সাম্রাজ্যের সনাতন মহিমাকে ধূলিসাৎ করিয়া নূতন সাহসে নূতন জীবন-কলা রচনায় অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। ...আর তুমি জ্ঞান চৌধুরী, তুমি চাহ—মহাকাল শুধু তোমাদের এই ষাট বৎসরের জীবনের পাতাটিকেই চিরকাল আবৃত্তি করিবে এই ভদ্রাসনে বসিয়া?

গীতা খুলিয়া বসিলেন জ্ঞানশঙ্কর, চণ্ডী টানিয়া লইলেন। দেখিতেছেন না সেই 'অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং বিশ্বেশ্বরং বিশ্বরূপং?' শুনিতেছেন না সেই নিখিলব্যাপী গর্জন—'কালোঽসি লোকক্ষয়কৃৎ'?

"নমো নমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমোস্তে।"

বিগ্রহ শুদ্ধ নীলমাধবের মন্দির নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইল

উজান-গঙ্গা

৯

কাশীর পথে। তথাপি কলিকাতায় অপেক্ষা করিতে হইল জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীকে—সংসারের সমস্ত দেনা চুকাইয়া দিয়া যাইবেন আর পিছুনটান রাখিবেন না।

অশোক অমিতাকে লইয়া আসিল; ইন্দুমতীও সঙ্গে আসিল। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া অমিতা ইন্দুর গৃহেই আসিয়া উঠে, তাহার মতই কর্পোরেশনের একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হয়,—মিলনের গৃহে আর ফিরিয়া যায় নাই। বিলাতী সওদাগরী আপিসে মিলন পিতার সহায়তায় ভালো চাকরি পায়—সম্প্রতি ভারতীয়দের তাহারা কভিনেন্টেড্ চাকরিতে গ্রহণ করিবার স্কিমও গ্রহণ করিতেছে। অবশ্য ইউরোপীয়দের মত নয়; তবু এই ভারতীয়-সাহেবদের জন্য কোম্পানী অনেকটা ফিরিঙ্গিদের মত ভালো মাহিনা আর এবং আপিসে তৃতীয় পত্তনে 'লাঞ্চ' প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিবে। এই সময়ে তাই জেল-যাওয়া স্ত্রী লইয়া মিলন বিপন্ন হইত। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে তখন আর মিলনের এই ক্ষতিও করিতে চাহে না অমিতা। মিলন প্রয়োজন হইলে ডিভোর্স গ্রহণ করুক। বাধা কি?

অমিতা অকপটে সত্য কথাই অশোকের নিকটে স্বীকার করিয়াছে। দুই ভগ্নীতে তাহারা ভালোবাসিয়াছিল সুমন্ত্রকে।—হাঁ, সুমন্ত্রকে।—সে জাতে ছোট, কিন্তু মানুষ ত ছোট নয়—অশোকেরই এক কালের শিষ্য সুমন্ত্র। কিন্তু সুমন্ত্র হয়ত কাহাকেও ভালোবাসে নাই, বাসিলেও বাসিত ইন্দিরাকে। সেই সন্দেহেই অমিতা ইন্দির সহিত কলহও করিয়াছে। ইন্দিরা সত্যই অমিতার অপেক্ষা দৃঢ়-চরিত্রা মেয়ে। বিপ্লবী গুণগ্রামও তাহার আছে। তাই সে এই বিপ্লবী কার্যধারার প্রসার কল্পে কাশীতে পড়িতে

গিয়াছে। কিন্তু সেদিন অমিতা ক্ষেপিয়া গেল যখন শেষবার মধুখালিতে অমিতার আবেদনেও সুমন্ত্র বিচলিত হইল না। সুমন্ত্ররা তখন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছে, মাত্র মাস দুই আর সময় আছে জীবনে। এখন মেয়েদের এই সব সেন্টিমেণ্ট লইয়া মাথা খারাপ করিতে পারে না সুমন্ত্র। তারপর?—অমিতা শোধ লইল। ভাবিয়াছিল শোধ লইল সুমন্ত্রের উপর। অমি' দল ছাড়িল, মিলনের সঙ্গে নাচ গানে মাতিয়া উঠিল, সুমন্ত্রকে তাহার বিবাহের সম্ভাবনার কথাও জানাইল; মিলনকে জোর করিয়াই বিবাহ করিল—রাগ করিয়া অন্য সকলের সঙ্গেও বন্ধন ছেদ করিয়া ফেলিল। আর ঠিক তখন দেখিল দেশ-জোড়া সমুত্থান। দেখিল তাহাদের বিপ্লবী দলের বিদ্রোহ—বিজয় দা' বন্দী, শেখর আহত, সুমন্ত্র পলাতক, পথে পথে তাহার সহকর্মী মেয়েরা অগ্রসর;—আর সে মিলনের সঙ্গে সুখশয্যায়। অমিতার বুঝিতে আর বাকী রহিল না—সে আত্মহত্যা করিয়াছে আপনার অভিমানে ও খেয়ালের বশে। তখন সেই মৃত্যুপুরীও সে ত্যাগ করিল। এবার পুনর্জন্ম লইতেছে অমিতা। জেল পার হইয়া আসিয়াছে। এখন সে নূতন মানুষ। এবার কি গ্রহণ করিবেন না তাহাকে বাবা? সত্যই তখন অমি' বুঝিতে পারে নাই—অমন জীবন বিপন্ন হইয়াছিল জ্ঞানশঙ্করের মধুখালিতে। সে জানিল যখন তখনি অনুতাপে ব্যাকুল হইয়াছিল। কতবার অমি' ভাবিয়াছে—'একবার যাই বাবাকে দেখে আসি।' কিন্তু ভয়ে এই পাড়ায়ও সে আসে নাই।

জ্ঞানশঙ্কর অমিতার দিকে তাকাইয়া চমকিত হইলেন। 'পাগলী' অমি'র এমন রূপ ত তিনি কোনো দিন দেখেন নাই। তাহার চঞ্চলতা আর নাই, ক্ষ্যাপামি আর নাই। বিষণ্ণ, ব্যথিত; কিন্তু তবু কোথায় যেন সে বেশ সুদৃঢ়ও। কাহার কথা মনে পড়িতেছে জ্ঞানের?—কোন এক সুপরিচিত আত্মীয়াকে।...চমকিয়া উঠিলেন জ্ঞান—হ্যাঁ, এই যে

তাঁহার মাতা মহেশ্বরীর শ্রী!—সেই নাক, সেই চিবুক!—আর এখন তেমনি ঈষৎ বিষণ্ণ শান্তরূপও অমিতার।...

জ্ঞান অমি'কে কাছে টানিয়া লইলেন: বড় কষ্টই পেয়েছিস্ অমি'। আমারও বড় অন্যায় হয়ে গেল। তোকে দেখতেও যাইনি একবার—অথচ এ শহরেই ছিলি তা জানতাম।

অমিতা একবার অনুশোচনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, আবার নিজেকে সামলাইল। চোখ মুছিয়া কাছে আসিয়া বসিল জ্ঞানের।

'দাদাকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল কতবার ভাবলাম যাই দেখে আসি। কিন্তু কেমন ভয় হল তখনি—মুখ দেখাব কি করে?'

এই মুখ—মহেশ্বরীর মুখ—কি না দেখিলেও বিস্মৃত হইতেন জ্ঞান? কিন্তু এমন অগ্নিশুদ্ধ না হইলে অমিতারও মধ্যে বুঝি এই রূপ ফুটিয়া উঠিত না। সংসারের অনেক বেদনায় দাহে বিধবা মহেশ্বরীর এই মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এদিনে জীবনের নানা দাহে অমিতা ফুটিয়া উঠিতেছে সেই মূর্তিতে। সাধ্য কি অমিতাকে কেহ আর তুচ্ছ করিবে, অবজ্ঞা করিবে?

হৈমবতী বলিলেন: আমাদের সঙ্গে না যাস, যে ক'দিন আমরা এখানে আছি তুই আমাদের কাছে এসে থাক।

অমিতা একবার মায়ের দিকে কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টিতে তাকাইল, বলিল: স্কুল আছে যে, সকাল-সকাল যেতে হবে।

বেশ, এখান থেকেই যাবি। তাতে কি?

ইন্দুমতী সহজেই এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলে। রাত্রিতে মায়ের পার্শ্বে আপন স্থানটি অনেক বৎসর পরে আবার অধিকার করিয়া শুইল অমিতা। হৈমবতী আপনারই অগোচরে অশ্রুমুখী হইয়া উঠেন, অমিতার অগোচরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। চুলগুলি মুঠি করিয়া

ধরিয়া দেখেন—মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে অমিতার। নানা দুঃখে কষ্টে অমি'র সেই ঘন গোছা গোছা চুল পাৎলা হইয়া যাইতেছে।

মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে অমিতা। হৈমও জানেন না—অমির চোখ ছাপাইয়া জল পড়িতেছে।

তর্ক করিতে করিতে অশোক থামিয়া পড়ে—জ্ঞানশঙ্কর প্রভাত-ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন—আর না। বাবা বাড়ি থাকিলে অশোক তর্ক করিবে না কাহারও সঙ্গে—অমিতাকেও কিছু বলিবে না। দিন দুই পূর্বে কাশী হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইন্দিরাকে অকস্মাৎ পাওয়া যাইতেছে না। নিঃসন্দেহ সে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজে আত্মগোপন করিয়াছে। অমিতার মন তাহাতে আরও বিচলিত। শুধু অমিতা কেন, সকলেরই মন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন।

অমি'কে অশোক বুঝাইতেছিল—সাহস যতই থাকুক ইন্দিরাদের পথটা আসলে শেষ পর্যন্ত ভুল পথ, হয়ত বা ফ্যাশিজিমেরই পথ। অমিতা তাহা মানিবে না:—ভালো হইতে পারে অশোকের মত। কিন্তু এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন হইতে এই সময় এমন দূরে সরিয়া থাকা কখনো এ দেশের মানুষের পথ নয়।

শহরে শহরে আগুন জ্বলিতেছে—অদ্ভুত সাহসে প্রাণ দিতেছে মানুষ—ইন্দিরা, সুমন্ত্র, শেখর।—অমিতা তাহাদের ভুলিবে কি করিয়া?

অশোক বুঝায়, কিন্তু দূরে সরিয়া নাই তাহারাও। স্বাধীনতার আসল অর্থ তো তাহারাই বুঝে:—জনতার মুক্তি। জনগণ ছাড়া জনগণের মুক্তি আরম্ভ হয় না। আর জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস না করিলে হয় অমিতারা হইবে ফ্যাশিস্তদের মত বিকৃত কর্মী, আর না হইলে হইবে অমরদা'দের মত নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিজীবী। অথবা মনোজদা'র মতআত্মরক্ষই কিলজকার।

কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী আসিয়া পড়িয়াছেন, অশোক আর এই তর্ক করিবে না! না, জ্ঞান গৃহে থাকিলে অশোক কথাই প্রায় বলিবে না। তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য মনে আঘাত লাগিবে।

কেন অশোক এমন তাহাকে এড়াইয়া চলে?—জ্ঞান বেদনা পান। কিন্তু কেনই বা তিনি অশোকের সহিত এই ক্রমবর্ধিত দূরত্ব স্বীকার করিয়া লইবেন? এই প্রাচীর তিনি ভাঙিবেন, যেমন করিয়াই হউক ভাঙিবেন। আর দেখিয়া যাইবেন অশোক অন্তত সংসারী। তারপর অরুণ? সে ভার অমরের-অশোকের উপর। হয় ত সে অবিবেচকও একদিন নিতু মেয়েটির মূল্য বুঝিবে।

অমর চিঠিখানা জ্ঞানশঙ্করকে দিয়াছিল, তিনি আবার পড়িলেন:

"অমর, অশোকের সঙ্গে ফিরে গেলাম না, কারণ ফিরব কোথায়? তোমার 'কালচার' আছে, তুমি বল্‌বে 'কালচারে'। অশোকের কাজ আছে, সে বল্‌ত 'কাজে।' তোমার কাকার ধর্মবোধ আছে, তিনি বল্‌তেন 'স্বধর্মে।' কিন্তু আমি বলব—'সব ঝুটা হ্যায়। তফাৎ যাও, তফাৎ রহো।'—সব ঝুটা হ্যায় তোমাদের। সারা সংসারে এই কান্না শুনছিলাম—'আমাকে নাও, আমাকে তুমি গ্রহণ করো,—আমাকে তুমি মুক্ত করো।' কী তা বুঝিনি।

কৃষ্ণপ্রিয়া বল্‌লেন—'আমাকে ছুঁয়ে দ্যাখ।' কেমন ঝন্ ঝন্ করে উঠ্‌ল হাত। এ ত ঝুটা নয়!—'বিজলি কি ঝুটা?' খিল খিল করে হেসে উঠলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। বিশ্বের হ্লাদিনী শক্তি যেন মূর্তি ধরে উঠ্‌ছে সামনে।

তারপর?

স্রোতবিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি

সমাজ, সংসার, সভ্যতা, সাম্যবাদ (ও কিন্তু একই কথা, সভ্যতা

ছাড়া সাম্যবাদ হয় না, সভ্যতাও হয় না সাম্যবাদ ছাড়া)?—সব words. words. words.

There is more truth in the Body than all your physiology knows.

তোমাদের মনোজ"

শেষে এই পরিণাম স্পিনোজা-উপনিষদের ছাত্র মনোজের!—সংসারে কোনখানে দানা বাঁধিবার মত কিছু সে পাইল না,—দানা না বাঁধিলে এমনি মানুষ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু দানা বাঁধিবে কিসে মানুষ?—আর অশোক? কাজে? কালচারে? স্বধর্মে? হয়ত এই সবেই;—কিন্তু চাই মিছরির সুতা—রক্তমাংসের দেহময়ী মানবীকেও।

অশোক বাহির হইতেছিল, জ্ঞান বলিলেন: অশোক, বিজনের সঙ্গে মিটে গেল। সে-ই যখন ছাপাখানা দেখত, নিক সে তা। আমাদের প্রাপ্য সালিশী মত আমরা পেয়ে যাব। কিন্তু কি করবে এবার তুমি? না, জর্নালিজম্‌এর কথা বলছি না। কিন্তু এবার তুমি সংসারী না হলে আমরা বারাণসী যাই কি করে?

বারাণসী যাইবার সঙ্গে কথাটার সম্পর্ক কি, অশোক তাহা বুঝিতে পারে না।

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন: না, আমাকে ভুল করো না। আমার এখন আর কোন গোঁড়া মতামত নেই যার জন্য তোমার আশঙ্কা থাকতে পারে।...

অশোক বলিল: না, তা নয়। আমিই ত কিছু ভাবিনি এ বিষয়ে। ভাববার সময়ও পাইনি।

তবে কি ভুল অনুমান করিয়াছে হৈম ও শান্তা? ভুল সংবাদ পাইয়াছিল অমর? অশোকের মাথায় কি এক ভাবনাই শুধু আছে—কাজ, সাম্যবাদ, 'জনগণের স্বাধীনতা'। সে দানা বাঁধিবে কিসে?

জ্ঞান বলিলেন ; আর ভাববে কবে অশোক ? সময় যে চলে যায়। ত্রিশ পেরিয়ে যাবে তুমিও।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জ্ঞানই হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা, অশোক, স্বাধীনতাই কি জীবনে সব ?

অশোক এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিস্মিত হইল। তারপর বলিল : স্বাধীনতার কে কি মানে করেন, তার উপরে নির্ভর করে এর উত্তর। আমরা জানি—কত জাতিই ত তথাকথিত স্বাধীনতা ভোগ করে। তিব্বতীরা করে, জঙ্গলের মানুষও করে—কিন্তু আসল কথাটা ত তা নয়। কথাটা হল কিসের স্বাধীনতা ?—জীবনের বিকাশের। আরও পরিষ্কার কথায়—প্রকৃতির উপর মানুষের আপন শক্তিকে প্রসারিত করার মত সুযোগ, সুবিধা,—আর আপনাকে আপনি নিয়ন্ত্রণের শক্তি ;—এইস্বাধীনতা চাই। চাই সমাজের উৎপাদন শক্তিকে বিকশিত করবার স্বাধীনতা।—

অমরের মতই কথায় মাতিয়া উঠিতেছে আবার অশোক। পিতার নিকটে বসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর তাহার কথা শুনিতেছেন না। শুধু তাহাকে দেখিতেছেন। একহারা, দুর্বল,—শ্যামবর্ণ এই অশোক কেমন মানুষ ? অমরেরই অনুজ ?

অমনি হঠাৎ বলিলেন জ্ঞানশঙ্কর : আচ্ছা, অশোক ব্যক্তি-জীবন বলে কি কিছু নেই ? স্ত্রী চাই না, পুত্র চাই না, স্নেহ মায়া মমতা চাই না ?—এসবের কোনো মূল্য নেই ? সমস্ত মূল্যই কি একমাত্র সামাজিক জীবনের ?

অশোক থামিয়া গেল, আবার তাকাইল জ্ঞানের দিকে। তারপর বলিল, এ কথা কেন বলেন ? স্নেহ মমতা এ সব না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্বই যে পঙ্গু হবে—কোন্ দেশে কোন্ বিপ্লবী এ সব মানে না ? মানে না বরং এ দেশের সন্ন্যাস আর ব্রহ্মচর্যের ভূতে পাওয়া বিপ্লবীরা।...

আবার অশোক মাতিয়া উঠিতেছে তাহার তত্ত্বকথায়।—এদেশে ব্রহ্মচর্য

একটা বড় রকমের মুখোস হইয়া পড়িয়াছে—বড় রকমের উপদ্রবও—ব্যক্তি জীবনের উপরেও, সুস্থ সমাজ জীবনের উপরেও। পণ্ডিতেরা ফ্রয়েডের নামে যাহা কিছু বলেন, তাহা সব একেবারে মিথ্যা নয়।

জ্ঞান চৌধুরী শুনিতেছিলেন না—ইহা অমরেরই মত কথা। জ্ঞান দেখিতেছিলেন, বুঝিতে চাহিতেছিলেন, কি প্রকৃতির মানুষ এই অশোক। আবার বলিলেন:

তোমার নিজের জীবনের প্ল্যান তবে তুমি কি করেছ, অশোক?

অশোক এই প্রশ্নে কুণ্ঠিত হইল একবার। তারপর বলিল: কতটুকু প্ল্যান করতে পারি আমরা? বাস্তব পারিপার্শ্বিক বুঝে নিয়ে তারপরে করতে হয় যা কিছু পরিকল্পনা ও প্রয়াস। এ যুগে এ দেশে যখন জন্মেছি—তখন জেনেছি পৃথিবীর একটা মহৎ সৃষ্টিতে আমারও আছে দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন করতে হবে—আমার ভাষাতে, কিন্তু সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে। কিন্তু এ দায়িত্ব অস্বীকার করলে আমার নিজের কাছেই নিজের মর্যাদা থাকে না। আপনাদের ভাষায় বললে বলব—আমার ধর্মবোধ ক্ষুণ্ণ হয়, আমি কর্মভ্রষ্ট হই, আত্মভ্রষ্ট হই।

আগ্রহ ঔৎসুক্য ভরা দৃষ্টি অশোকের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া তাহাকে দেখিতেছেন জ্ঞান চৌধুরী। এইত অশোক, এই ত অশোক, —যে অশোককে পান নাই বলিয়া তাহার পিতামাতা সহস্ররূপে অভিমান করিয়াছেন।—আপনার জটিল চিন্তা ও দুর্জয় কল্পনার মধ্য হইতে যে অশোকও আপনাকে সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই। আর পারে নাই বলিয়াই কি সে নিজেও পাইয়াছে কম বেদনা, কম অস্বস্তি? এই ত সেই দ্বন্দ্বাকুলিত হ্যামলেট্—যে একালে আপনার নিজ সত্তাকে অখণ্ড করিয়া তুলিতে চায় বিশ্বের অখণ্ড মানব-যাত্রার সঙ্গে মিলাইয়া;—একাকী যে,—আপন সত্তাকে স্বতন্ত্র ও একান্ত করিয়া চাহে বলিয়া নয়।—

এই ত সেই 'সমাজদ্রোহী', যে সংকীর্ণ স্বল্প স্বার্থ ছাড়িয়া বৃহত্তর সমাজ স্বার্থকে অঙ্গীকার করে।

জ্ঞানশঙ্করের মন কেমন দ্রব হইয়া যাইতে থাকে—বড় একাকী, বড় একাকী অশোক! তাহার পিতা তাহাকে জানেন নাই। মাতা তাহাকে পান নাই!

ফৌজদার শঙ্কর চৌধুরীর মত দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা তাহার প্রাণে, কিন্তু চিত্তে নাই সেই ব্যক্তিগত সৌভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা। সকলের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে দিতেই আপনাকে সে পাইতে চায়। সকলে তাহাকে চোখে দেখে,—কিন্তু কেহ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। কে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে? কে গ্রহণ করিবে এই অশোককে? কে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল সনাতন চৌধুরীকে? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার,—কে? পৃথিবীতে তিনিও ছিলেন একা। একা, একা, একা;—কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই। কেহ হয়ত বুঝিতে পারিত না অমরের পিতা বিভূতিশঙ্করকেও।

অশোকের আনত মস্তক জ্ঞানের চোখে পড়িল। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যেখানে ঘাড় নামিয়া গিয়াছে সেখানে তাহার দৃষ্টি পড়িল—এমনি, এমনি ছিলেন না কি বিভূতিশঙ্করও দেখিতে? এমনি উদার, এমনি সংসারে থাকিয়াও সংসারের অতীত মানুষ! কাদম্বিনী ছিলেন বিভূতি-শঙ্করের পার্শ্বে,—তাঁহার পুত্র ছিল, কন্যা ছিল, তাই তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলেন না জীবনে। অথচ সংসারের অসংখ্য সঙ্গীর মধ্যেও তিনি হারাইয়া গেলেন না। কিন্তু অশোকের কে আছে? অশোকের কেহ নাই, একা, নিতান্ত একা, ভয়াবহ রূপে একা সে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে। সে গোপনে গোপনে রহিবে এমনি নিঃসঙ্গ, নিঃসম্পর্কিত,—আর তাই অসম্পূর্ণও। কে অশোককে এই পূর্ণতায়

পৌঁছাইয়া দিবে? কে তাহার যাত্রাপথে যোগাইবে তাহার জীবনসূত্র? কে?—মালিনী?

জ্ঞানের চিন্তায় বাধা দিয়া অশোকই হঠাৎ আবার হাল্‌কা স্বরে বলিল: অথচ কি ই বা এই মাতামাতির মূল্য?—আপনারা বলবেন! সত্তার পরিণতি এই সব বাইরের জিনিসের উপর কতটুকু নির্ভর করে? তারপর বাস্তব রূপটাই দেখুন এই আন্দোলনের।—মদন দাস আর মুনিম খাঁকে দেখে আপনাদের গা রী রী করে। হীরেন্দ্রদা' 'তিন বৎসরে বিপ্লবের' স্বপ্ন দেখতে দেখতে গিয়ে ঠেকেছেন মীরাটে। আর দেখছেন কংগ্রেসের এই আইন অমান্য আন্দোলন;—কিন্তু তা দেখেও কি হাসি চাপা যায়? পৃথিবীর ক্রূরতম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—পতাকা উড়িয়ে, চেঁচিয়ে, হল্লা করে, বক্তৃতার চেষ্টা করে, মার খেয়ে ও মারের ভয়ে পালিয়ে, জেলে গিয়ে আর জেল যাতনায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে, মার ডেকে এনে আর মারের বিরুদ্ধে ফিরে নালিশ করে,—বড় জোর ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে, প্রোটেষ্ট করে—আর সাপ্রু-জয়াকরকে দৌত্যভার দিয়ে, প্রকাশ্যে বোমাওয়ালাদের নিন্দা করে আর গোপনে তাদের ভরসায় পথ চেয়ে থেকে,—এ সবে হাসি পায় না? আমারই তো এক এক সময় কংগ্রেসের মিছিল দেখলে অমরদা'র বন্ধুদের মত মনে পড়ে ফলষ্টাফের বাহিনীর কথা।

জ্ঞানশঙ্কর দেখিতেছিলেন, বুঝিলেন—অশোক আর একবার আপনাকে ধূম্রাচ্ছাদনে গোপন করিয়া ফেলিতেছে। এও তাহার জটিল চরিত্রের আর এক দিক। সে অমরের মত, সে জ্ঞানের মতও।—সে শুধু শঙ্কর চৌধুরীর মত কর্মী পুরুষ নয়, সনাতন চৌধুরীর মত ভাবুকও নয়। সে শুধু বিভূতিশঙ্করের মত উদার সামাজিক মানুষও নয়। সে অপূর্ব—সে বহু চরিত্রের সমন্বয়, সে অশোক।

বৃথা কিন্তু, অশোক, বৃথা। তুমি শুধু অমর নও,—জ্ঞানও। অনেক অনেক অতীতের জটিল বিকাশ, আরও অনেক-অনেক জটিলতর সম্ভাবনার পূর্বাভাসও। কে তোমাকে সেই সংবাদ দিবে? মালিনী?

২

অশোক গিয়াছে জ্ঞানের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিতে। সুবোধ ও মন্মথ বার দুই আসিয়া দেখা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সরকারী চাকুরি করিতেন, অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্ররাও সরকারী কার্য্যে জীবিকার সুযোগ পাইয়াছে। এখানেই তাঁহারা বসবাস করিবেন, ব্যবসা মন্দায় এখন জায়গা, জমি জিনিষপত্রের দর কম, চাকরিজীবীদের সুবিধা হইয়াছে। সুবোধ ও মন্মথ দক্ষিণ কলিকাতায় জমি কিনিয়াছেন। বাড়ী তৈয়ারী করিবেন।

মোটামুটি স্বচ্ছল দশটি সদরওয়ালার মতই সুবোধ ও মন্মথ। তবু সুবোধ সুবোধই থাকিয়া গিয়াছে। কলেজ জীবনে সে ছিল জ্ঞান চৌধুরীর বন্ধু, শুধু বন্ধু নয়, জ্ঞানের অনেকাংশে গুরুও। তাহার সহায়তা না পাইলে সেদিনে সহজ হইত না জ্ঞানের পক্ষে কাব্য বা দর্শনের অন্তরস্থ রস গ্রহণ করা। আর প্রায় অসম্ভব হইত 'মানসী' ও 'সোনার তরীর' রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে আবিষ্কার করা। সুবোধ ছিল সেদিনের বন্ধু সমাজে উদীয়মান সাহিত্যিক। শুধু বন্ধু সমাজে নয়, তাহার প্রতিভা সেদিন সাহিত্যিক সমাজেও স্বীকৃত হইয়াছিল। সে কবিতা লিখিত, প্রবন্ধ লিখিত, আপনার চারিদিকে একটা সাহিত্যের আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া লইত। আর তাহারই টানে জ্ঞানশঙ্করও লিখিয়াছে প্রবন্ধ, গোপনে গোপনে অভিলাষ পোষণ করিত—সেও করিবে বঙ্গ সরস্বতীর কিছু না কিছু অর্চনা। কোথায় গেল

সেই দিন ?—সুবোধই বা গেল কোথায় ? অকস্মাৎ নহে, সুবোধের প্রতিভার অনিবার্য্য আকর্ষণেই তাহার জীবনে আসিয়া উদিত হয় মালতী চাটার্জী, আর সুশী সেন।—চতুরা বিদুষী, ইংরেজী-ফরাসী দুই সাহিত্যে পারদর্শিণী সুশী। তাহার তুলনায় একালের এই ফাজিল মেয়ের তো অমার্জিত রুচি। আর মালতী ? একটা নেশার মধ্য দিয়া সুবোধের দিন গিয়াছিল। মাতার বিরোধিতায় সুবোধ বিলাত যাইতে পারিল না। নেশাও তাই ভাঙ্গিল। তখন সুবোধের কবি মনও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—সরকারের চাকরি লইয়া সুবোধ পলায়ন করিল প্রথম গয়াতে। তারপরও এখানে ওখানে কিছুদিন সুবোধের দুই একটি লেখা চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্তু সুবোধ ক্রমেই মিশিয়া গেল সরকারী চাকরির যাঁতা কলের মধ্যে—এক হইয়া গেল মন্মথ ও সুবোধেরা মুনসেফি-সাবজজির হাকিম-জীবনে।

তবু এক হন নাই তাঁহারা। জ্ঞানের অসুস্থতার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিজেই সুবোধ আসিয়া যে দিন হাজির হইলেন—প্রতিবেশী মন্মথ সেদিনও ছিলেন তাঁহার সঙ্গে—তখন জ্ঞানের বুঝিতে বাকী রহিল না—দুইটি স্বতন্ত্র জাতের মানুষ এক হয় না, সরকারী চাকরিও তাঁহাদের একাকার করিতে পারে না। অন্তত সুবোধকে তাহা বৈশিষ্ট্যহীন স্বার্থ সর্ব্বস্ব করিয়া দিতে পারে নাই। তাঁহার মন প্রসন্ন—জীবনে কোনো ব্যর্থতার অবসাদ নাই তাহাতে —সুশী সেন বা মালতী চ্যাটার্জ্জির ক্ষীণতম ছায়াও আর নাই সেখানে। নাই কোনো প্রতিকূলতা আধুনিক কালের তরুণ তরুণীর প্রতিও।

মন্মথ বলেন উচ্ছন্ন যাইতেছে দেশ—মেয়েগুলি পর্য্যন্ত। জ্ঞানেরও সন্দেহ তাহাই,—বুঝি একটা সত্যহীন, সৌন্দর্যহীন বিদ্রোহের যুগ আসিয়াছে—এ দেশের সেই শান্ত জীবন-শিল্প তাই আর টিকিবে না। আসিল সুরেশ্বর বিজনের ব্যবসায়ী যুগ।

সুবোধের কিন্তু কোনো সংশয় নাই।—জীবন আপনারই নিয়মে

টানিয়া আনে যুগান্তর। সেই যুগবিপ্লবের মুহূর্ত আজ দেশে দেশে।—'আমরাই কি কম দেখেছি তার আয়োজন।—কেশব সেন আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপুল আলোড়নের কথা স্মরণ করো। স্মরণ করো সুরেন্দ্রনাথ আনন্দ মোহনের কথা। তারপর বৃথা যায় নি অরবিন্দ তিলকের সেই স্বদেশীর দীক্ষা। সাহেব দেখলে আগে আমাদের মেরুদণ্ড আপনা থেকে বেঁকিয়ে যেত। তারপর এল স্বদেশীর দিন। সাহস করে আমরা বললাম—আর মাথা নোয়াব না। আজ তাই ছাখো তোমার আমার মেয়ে পর্য্যন্ত সার্জেন্টের ঘোড়ার সাম্‌নে এগিয়ে যায় নির্ভয়ে। মানুষের জীবনে এই যে নির্ভয়তার প্রতিষ্ঠা, এই দুঃসাহসের উদ্বোধন অশোকের মত ছেলেদের জীবনে—এ ত কম মর্য্যাদাসূচক নয় মানবাত্মার পক্ষে। আমাদের জীবনের প্রশান্তি serenity আর এখন আশা করো না এদের থেকে—এঁদের জীবনের গতিবেগ intensity, জীবন-পিপাসাও পেতে কি তখন আমাদের জীবনে?'

কোনো খানে সুবোধের ব্যর্থতা বোধ নাই, নৈরাশ্য নাই। ইহা কি—স্বচ্ছল সরকারী চাক্‌রের আত্মতৃপ্তি? জ্ঞান বুঝেন—না,তাহা নয়। ইহা একটা ক্ষমাশীল কৌতুক-স্বচ্ছ জীবন-চেতনা—তাই তিনি পড়েন, পড়িতে ভালোবাসেন এ কালের সাহিত্যও। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয় 'অতি-আধুনিকদেরও' সকলের সহিত সুবোধ পরিচয় করিতে চায়। পরিচয় করিতে চান অশোকের সহিত, অমরের সহিত অমিতার সহিত—কোথায় তাহারা? তাহারা পরে আসিয়াছে, আরও দূরে যাইবে যে!

জ্ঞানশঙ্করকে অনেকখানি আনন্দ ও স্নিগ্ধ প্রীতিরসে সুবোধ সঞ্জীবিত করিয়া গেলেন। খেদ কিসের? কিসের ক্ষোভ?

অমর আসিয়াছে,—ইন্দিরার খোঁজ যদি পাওয়া যায়। তাহা ছাড়াও জ্ঞান, হৈমবতী ও কাদম্বিনীকে লইয়া সে বারাণসী যাইবে। যাইবার পূর্বে তাহার সহিত সুবোধের পরিচয় সাধন করিলেন জ্ঞান। তিনি

নিমন্ত্রণ করিয়াছেন অপরাপর বন্ধুদিগকে,—অমরের বন্ধুদের, অশোকের বন্ধুদেরও। আর নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ইন্দুমতী মালিনীকেও। বিশেষ একটা উদ্দেশ্যও মনে আছে। কাদম্বিনী ও অমরের সহিত পরামর্শও করিয়াছেন জ্ঞান। হাঁ, অশোকের মত ভাবুক মানুষেরা আসলে জীবনকে এড়াইয়া যায়। তাহাদের একটু চেষ্টা করিয়াই জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়ে দিতে হয়। তাহাই দিবেন এবার জ্ঞানশঙ্কর, দিবেন হৈমবতী —অমরও আছে। না হইলে কি করিয়া কাশীবাসী হইবেন তাঁহারা? সংসার যে কেবলই তাঁহাদের পিছনে টানিবে। হৈম সংবাদ পাঠান,— মালিনী যেন দ্বিপ্রহরেই তাঁহার নিকট আসে, তাহার এক আধটু কুকাজ কর্ম করিতে হইবে, কিছু কথাও আছে।

অশোক জানিত না—সে পিতৃবন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল। আর অমর গিয়াছিল নিজের বন্ধুদের উদ্দেশে—ফিরিতে তাহারও দেরী হইবে। অমিতা স্কুল হইতে ফিরিবে অপরাহ্ণে। আহার্যের আয়োজনে ব্যস্ত হৈমবতী ও কাদম্বিনী। কলিকাতায় কোথায় তেমন বাসন কোসন, তেমন ডেক্‌চি, বারকোস? জ্ঞানশঙ্কর একটা দর্শনের বই পড়িতেছিলেন। সকাল বেলার ব্যথাটা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিল নাকি জ্ঞানের? দুঃসহ ব্যথা। অসহ্য অসহ্য—মাথা যেন একটা ধুম্রাচ্ছন্ন শিখায় ঘিরিয়া ধরিতেছে। ধোঁয়া, ধোঁয়া, কেবলি ধোঁয়া। নীলমাধবের মন্দির বুঝি গুঁড়াইয়া যাইতেছে।

হৈমবতী সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, কাদম্বিনী বরফের ব্যাগ মাথায় চাপা দিতেছেন—দৃঢ়,গভীর শঙ্কিত হস্ত।—জ্ঞান চৌধুরীর গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তস্রোতে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; ওষ্ঠে পাণ্ডুরতা। সমস্ত দেহ নিশ্চল।

অশোক বাড়ি ফিরিয়া পদ উত্তোলন করিতে পারে না। ঠোঁট

নাড়িতেছে নাকি জ্ঞান চৌধুরীর ? কিছু বলিতে চান ? কি ? 'অশোক, অশোক, অপরাজেয় ভারতবর্ষ, মৃত্যুহীন তাহার বাণী ?' কে শুনিল তাহা ?

ডাক্তার আবার ঔষধ ফুঁড়িতেছেন।

রাত্রির প্রহর দ্রুত তালে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্ফীত ধমনীতে ফুলিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে রক্তের স্রোত। জ্ঞান চৌধুরীর লুপ্ত চেতন দেহের উপর দিয়া রাত্রির প্রত্যেকটি পদপাত কৃষ্ণ ছায়া আঁকিয়া যাইতেছে।

প্রভাত হইতেছে। পথে লোক চলিতেছে। বাস চলার শব্দও শোনা যায়। ঘণ্টা বাজাইয়া দূর সড়কের ট্রাম ঘোষণা করিতেছে নূতন দিনের সংবাদ। বাজারে কোলাহল সুরু হইবে, দোকানী দোকান খুলিবে। চায়ের দোকানে জল গরম চাপিয়াছে ;—এখনি ভিড় জুটিবে, তর্ক শুরু হইবে।—সব তেমনি। কিন্তু কিছুই আর কালিকার মত রহিবে না— হৈম'র জীবনে, কাদম্বিনার জীবনে। সব তেমনি—জানে অমর, জানে অশোক, জানে অমিতা,—সব তেমনি আছে, তেমনি চলিবে। কিন্তু কিছু কি আর তেমনি থাকিবে হৈম'র জীবনে, কাদম্বিনীর নয়নে ?

কাদম্বিনী একবার চাহিয়া দেখেন ঘরের চারদিকে—জানালার বাহিরের উষার আলোকও যেন অস্বাভাবিক। চাহিয়া দেখেন হৈম'র দিকে,—হাতে তেমনি পাখা চলিতেছে,—বিজলীর পাখা থাকা সত্ত্বেও,— আর নিশ্চল প্রতিমা হৈম তেমনি নিবদ্ধ-দৃষ্টি জ্ঞানের মুখে।···হৈম, হৈম,—তোমার পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটিতেছে!···কত পরিচয় কাদম্বিনীরও এই···হৈম'রও পূর্বেকার সেই পরিচয়,—এক কিশোর বালকের সঙ্গে সহজ অকৃত্রিম আন্তরিকতার সম্পর্ক এক কিশোরী ভ্রাতৃবধূর। স্নেহে আর পরিহাসে তাহা সরস হইয়াছে বৎসরে বৎসরে। সংসার তাহাকে ম্লান করে নাই ; জীবন তাহাকে অপ্রমত্ত মাধুর্য দিয়াছে ; আর উহারই

সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়া হৈমবতী পর্যন্ত কাদম্বিনীর অন্তরের মধ্যে একটি স্নেহ বেষ্টিত আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হৈম'র জীবন-সত্তার সঙ্গেও তাই একাত্মতা ঘটিয়াছে কখন কাদম্বিনীর—জ্ঞানের জীবনকে আশ্রয় করিয়া।...ভাঙিয়া পড়িতেছে সেই জীবনাশ্রয় হৈম'র,—ভাঙিয়া পড়িতেছে মনের আশ্রয় কাদম্বিনীর,...তাঁহাদেরই আপন-আপন জীবনের উজ্জ্বলতম ভাতি নিবিয়া যাইতেছে।...

ডাক্তার ঔষধ ফুঁড়িবেন আবার।

অশোক বলিল: আর কেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, আমাদের চেষ্টা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

ডাক্তার ঔষধ ফুঁড়িলেন। অমর তাকাইয়া আছে। দেখিতেছে—মৃত্যু ও জীবনের কি কঠিন এই কাড়াকাড়ি। তবু কি অশেষ অকুলতা ক্ষীণস্রোত জীবনের এখনো! কি শাশ্বত জীবন-পিপাসা!

দ্বিপ্রহর হইল। জীবন পরাজয় মানিতেছে,—ডাক্তার স্বীকার করিলেন এইবার। ব্যাগ গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। ছিন্নমূল তরুর মত শায়িত দেহের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন হৈমবতী। কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল অমি'।—শান্ত স্থির হস্তে তাহাদের সাম্‌লাইতে আগাইয়া গেলেন কাদম্বিনী।

জীবন পরাজয় মানিয়াছে। অমর তাকাইয়া দেখিতেছে—এই কি পরাজয় জীবনের? শান্ত মুখমণ্ডলের উপর অপরাজেয় স্মিতহাস্য। কাল-গঙ্গায় চলিল সোনার তরী—পিছনে রহিল পাড়ের ফসল!

একে একে নিমন্ত্রিতরা আসিতেছিলেন।—

মালিনীকে দেখিয়া আকুল ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিলেন হৈমবতী—শেষ সাধ পূর্ণ হইল না।

অশোকের বাগ্‌দান আর সম্ভব হইল না আজ।

প্রতিবেশী ভূপেন ও বন্ধু হিরণ্ময় দাঁড়াইয়া আছে গৃহের বারান্দায়। দুই একজন করিয়া বন্ধুরা আসিতেছেন। অমরের বন্ধুরা কে কে আসিল। সানন্দ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল :—অমর কোথায় ?

উত্তর আসিল। তারপর নিম্ন শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে কথা, বিস্ময়ের বিমূঢ়তা। মন্মথকে লইয়া সুবোধ ধীরে ধীরে সানন্দ মনে আসিতেছিলেন। ভূপেন তাহাদের নিজ গৃহে বসাইল। সুবোধ বুঝিতে পারেন না—ভূপেনের গৃহে বসিতে হইল কেন। জ্ঞান কোথায় ? কোথায় অশোক ? আর অমর বাবু ? নিরুত্তর কেন সকলে ?

নিস্পন্দ অভিভূত মূর্তি বসিয়া রহিলেন সকলে—অপরাহ্নের ম্লানালোকে সেই গৃহে। সকলে নিস্তব্ধ—অমরের বন্ধুরা, অশোকের বন্ধুরা,—জ্ঞানশঙ্করের বন্ধুরা।

মুখোমুখি বসিয়া আছেন বিগত যুগের অবসন্ন যাত্রীরা—আর বর্তমানের নিঃশঙ্ক পথিকেরা। পরিচয় তাহাদের সংসাধিত হইয়া গেল—সর্বকালাতীত মৃত্যুমৌন এই গম্ভীর পরিবেশে।

শুধু মৃত্যু ত নয়, পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস যেন শেষ হইতেছে—চোখের সম্মুখে ইতিহাসের এক অধ্যায়,—যেখানে পুঞ্জিত রহিয়াছে ইঁহাদের জীবনের সত্য ; আর যেখান হইতে আগামী অধ্যায়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছে তাহার মুক্তির প্রতিজ্ঞা !

আর কেন ? একে একে প্রস্থান করিবে সকলে। বন্ধুদের একজন হিরণ্ময়কে বলিল : আপনারা আজ আর বেরুবেন না, তা হলে ? আমরা যাই এবার—'নেশন' আপিসেই বসিগে।

তাই যাও।

তাহারা চলিতেছিল। কে বলিল, কিন্তু হিরণ্ময়ও তো আসিলে পারে? এখানে একা বসিয়া কি করিবে আর?

সত্যই ত, কি করিবে সে? হিরণ্ময়ও চলিল।

মোড়ের বাসটা ছাড়িয়া যায় বুঝি। একটু ছুটিয়া যাইলেই ধরা যায়। হিরণ্ময়ও তাহার বন্ধুরা ছুটিয়া তাহা ধরিল। একটা সিগারেট এতক্ষণে ধরাইল কে। বলিল: এবার কিন্তু অশোক বিপদে পড়বে।

সে উত্তর দিল: কি করবে? বাপ-মা কারো চিরদিন থাকেন না।

সত্যই। হিরণ্ময়ও জানে—His time is spent;
Our pilgrimage must be
So much for that.

অমরের বন্ধুরাও এবার উঠিল। মৃদুস্বরে তাহারা আলোচনা করিতেছিল,—কি দুর্দৈব বলো ত ওই নন্দদের। কেমন আয়রণি অব্ ফেট—গ্রীক ট্র্যাজিডির কথা মনে পড়ে না?

অমনি আর-একজন বলিল: হাঁ। কিন্তু সেই কন্‌ফ্লিক্‌ট নেই, সংঘাত নেই'। শুধুই একটা আকস্মিক ঘটনা।

কনফ্লিক্‌ট আছে বৈকি? অদৃষ্টের সঙ্গে—সেখানেই ত গ্রীক ট্র্যাজিডিরও মূল।

কিন্তু সেক্‌সপীয়রের হ্যামলেটে সেই ট্র্যাজিডির উৎকর্ষ। সংঘাত শুধু আর বাইরের নয়, ভিতরেরও। এবং মানুষের।

তাহাদের তর্ক চলিল।

অবসন্ন দেহভার কোনোরূপ বহন করিয়া অবনত মস্তকে সুবোধ অচল শ্রান্ত পদে চলিলেন। মৌন, ক্লান্ত মুহ্যমান; চোখ তুলিতে সাহস

নাই। বুঝি তুলিলেই দেখিবেন—সম্মুখেই সমাগত—বিভীষিকাময় নিয়তি। ঐখানে—ঐ পথের মোড়েই বুঝি!

শ্রাবণ সন্ধ্যার আরক্ত মেঘাচ্ছায়ায় চিতালোকে অশোকের পার্শ্বে বসিয়া অমর তভক্ষণে বলিতেছে—অশোকের চোখের সম্মুখে শ্রাবণের বর্ষণস্ফীত গঙ্গা উজান বহিতেছে—বহিঃ-সমুদ্র হইতে দেশেব বুকে।

বুঝলে না, অশোক। এমনিতরই এ দেশের ভদ্রলোকের জীবন। বিরাট্ কিছু এঁরা করেন না, ফাউষ্টিয়ান্ স্পর্ধা এঁদের নয়। বড় কীর্তি কাহিনীও থাকে না এঁদের। দশজনকে খাওয়ান, পরান, মানুষ করেন; দশ জনেব বোঝা ঘাড়ে বহন করে, সহজভাবে জীবনের কর্তব্য শেষ কোরে এমনি সহজভাবে এঁরা বিদায় নেন যে,—কেউ টেরও পায় না কে গেল।...দেখলে, মুখে কিন্তু ফুটে থাকে কেমনতব স্তব্ধ হাসি—জীবন-শিল্পের জয়চিহ্ন যেন!

অশোকের চোখের সম্মুখে সন্ধ্যার আরক্ত আকাশ—আর দুকূল-ভরা উজান-গঙ্গা।

শেষ